প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে

ভবানীশ্বরের মন্দির—বড়নগর
(পৃঃ-১১৯)

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের
সৌজন্যে

জল্পেশ মন্দির-
জলপাইগুড়ি
(পৃঃ-১৮৬)

পথ যে আমায় ডাকে

(উত্তর খণ্ড)

বেদুইন

ইষ্টলাইট বুক হাউস
২০, স্ট্র্যাণ্ড রোড - কলি : ১

প্রকাশকের নিবেদন

মেঘলা দিনে ছবি তুলতে অনেক ছবিই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য প্রথম সংস্করণে চিত্রসংযোজন সম্ভব হয়নি। বর্তমান সংস্করণে চিত্রগুলি সংযোজিত করে আখ্যানভাগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। 'ভবানীশ্বর মন্দির', 'মহারাজা নন্দকুমারের দুর্গাবাড়ি' ও 'জল্পেশের মন্দির'— এই তিনটি চিত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ। বাকি চিত্রগুলো লেখক স্বয়ং, তার জেষ্ঠ্যপুত্র অলক ও ভ্রাতুষ্পুত্র গোপালেন্দ্র তুলেছেন

মুদ্রামূল্য হ্রাসের দরুন আর্টপেপার দুর্মূল্য হয়েছে। সেজন্য বাধ্য হয়ে বইয়ের মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করতে হোল। বর্তমান বাজারে এ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ও নেই। আশা করি সহৃদয় পাঠকবৃন্দ এই ত্রুটি মার্জনা করবেন।

আমাদের বিশ্বাস বইটি জনসমাজে আদৃত হয়েছে নইলে দ্বিতীয় সংস্করণ বের করা সম্ভব হোত না। এতে পাঠক সমাজের অবদান যথেষ্ট, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

চিত্রসূচি

॥ দুটি কথা ॥

ভারতবর্ষ এক বিচিত্র দেশ, বিচিত্র তার পরিবেশ, বিচিত্র তার মানুষ, আমরা যারা টুরিষ্ট ছুটে বেড়াই সেই ভারতবর্ষকে দেখতে বা জানতে অনেক সময়ই ভুলে যাই ভারতবর্ষকে দেখবার আগে বাংলাদেশকে দেখা দরকার, বাংলাদেশকে জানা দরকার।

বাংলা দেশ, যার খানিকটা ঢুকে পড়েছে আসামে আর খানিকটা গ্রাস করেছে বিহার ও উড়িষ্যা, তার ইতিহাস, তার ঐতিহ্য, তার স্বকীয়তা যা কিছু রয়েছে এই বাংলায়, তা জানবার আমাদের অবসর থাকে না, অনেক সময় বাংলা সম্বন্ধে উদাসীন হয়েই থাকি আমরা।

এই উদাসীনতা এবং না জানবার কারণ অনেক। উত্তর অথবা দক্ষিণ ভারত নিয়ে কাব্য রচনা হয়েছে, লড়াইয়ের ময়দানে চারণ গীত সৃষ্টি হয়েছে যা মনোজগতে বিশেষ ছাপ রেখে গেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। যা উত্তর বা দক্ষিণ ভারতে রয়েছে তার চেয়েও মহান সম্পদ রয়েছে বাংলাতে। সে সম্পদ আমরা খুঁজে নিতে পারিনি এবং খোঁজবার মত কোন রকম সুযোগ আমরা পাইনি। কারণ বাংলার অনেক অঞ্চল দুর্গম, চলাচলের পথে বিঘ্ন অনেক সেইজন্য যাদের ভ্রমণের ইচ্ছা আছে তারাও সর্বত্র যেতে পারেন না। এ ছাড়াও এ সব জায়গায় ইতিহাস বলে দেবার আর চলার পথ দেখিয়ে দেবার মত 'গাইড'-ও নেই।

এই অভাব আমাদের অনুভূত হচ্ছে অনেকদিন থেকে অথচ সমস্যা [স]মাধান করবার মতন উপাদান সংগ্রহ এবং তাকে সুচারু ভাবে লিপিবদ্ধ [ক]রা সম্ভব হয়নি, অথবা বিশেষ চেষ্টাও হয়নি।

[এ]ই গ্রন্থের লেখকের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করে আমার সমগ্র পরি-[কল্প]না উপস্থাপিত করেছি। তিনিও প্রায় তিরিশ বছর ধরে বাংলাদেশের [না]না স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন, ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। লোক-[শি]ল্পের ও লোক-সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

তাই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল, পরিভ্রমনের উপযোগী 'গাইড গ্রন্থের' মত করে তিনটি খণ্ডে এই গ্রন্থ প্রনয়ণ করা হল। তারই প্রথম অংশ এই 'উদ্ভব খণ্ড' প্রকাশিত হল। দ্বিতীয় অংশে থাকবে 'পশ্চিম বঙ্গের' অবশিষ্ট অংশ যা এই গ্রন্থে নেই. তৃতীয় অংশে থাকবে ভবিষ্যত বংশধরদের নিষিদ্ধ দেশ অর্থাৎ 'পূর্ববঙ্গ'।

মূলত ভ্রমণ কাহিনী হলেও উপন্যাসের অনুকরণে একটি করুণ কাহিনী নিয়ে গ্রন্থটি রচনা করেছেন গ্রন্থকার। জনপ্রবাদ, উপকথা, ইতিহাস, লোক-গাথা থেকে উপাদান সংগ্রহ করা হলেও বর্ণিত স্থানগুলি লেখক স্বচক্ষে দেখে এসেছেন বহুবার।

গ্রন্থটিকে তথ্যবহুল ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করবার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে।

আশা করছি, এই গ্রন্থ বাংলাদেশ দেখতে যারা চান, বাংলায় প্রতি পদক্ষেপ দিয়ে জানতে চান তাদের কাছে গাইডের কাজও করবে, এই উদ্দেশ্য সফল হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করন। এই হল এ বইয়ের জন্মকথা। ইতি—

বাসুদেব লাহিড়ী

১

মাথার ওপর বর্ষণরত আকাশ, পায়ের তলায় এক ফুট কাদার আস্তরণ। ভরা বাদর মাহ ভাদর। ঝর্ ঝর্ ঝরে আকাশের অশ্রু। রসিক কবি রসিকতা করেছিলেন, যেহেতু মাহ ভাদরে খোলা মাঠে তিনি আসেন নি। ভাদরের সৌন্দর্য দেখেছেন গৃহকোণে বসে, জানালার পাশে বসে, তাই সৌন্দর্য মোহ সৃষ্টি করেছিল। আমার মতো যারা বিশ্বের জমিদারী পেয়েছে রাজনীতির অপজাত বংশধরদের ঐতিহ্য মাথায় বহন করে, তারা সৌন্দর্য দেখবার দৃষ্টি হারায়, অন্তত দৃষ্টি তাদের ঝাপসা হয়। তবুও মাটিতে পা রয়েছে, মাটির তলায় শেষ নিকেতন গড়তে হয়নি। এক ঘণ্টা আগেও মনে হচ্ছিল চোরা বালিতে হেঁটে চলেছি। এখন চোরাবালির ভয় নেই, এঁটেলো কাদা মাটিতে পা আটকাবার সম্ভাবনা রয়েছে, তবুও নিশ্চিন্ত, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

একা আসিনি আরও অনেকে এসেছে। জোয়ারে খড়কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে সবাই এসেছে।

নগাকাকার ছোট মেয়েটা সকালে ঘুম থেকে উঠে পোষা বেঁড়ালটার গলা জড়িয়ে ধরেছে। নগাকাকা ডাকল, মিনু এবার চলো। দশবছরের মিনু পুষিকে কোলে নিয়েই ধাপ ফেলল।

ওটাকে নিয়েছিস কেন ?

পুষি বেড়াতে যাবে।

নগাকাকা ধমকে উঠল। রোদ তেতে উঠবার আগেই হিন্দুস্থানের জমিতে পা দিতে হবে, তাই মেজাজটা তিরিক্কে।

পুষিকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে মিনু দাঁড়িয়ে গেল।

চল, আর দাঁড়াস না। কই গো, তোমার হল ?

চলল মানুষের মিছিল।

পুষি ডাকল, মিউ।

মিনুর গাল বেয়ে ততক্ষণ জল নেমেছে।

চলল নগাকাকার ব্যাটেলিয়ান।

পেছনে তাকিয়ে দেখছে মিনু আর মিনুর মা।

পুষির গলার শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না।

ফিস্ ফিসিয়ে নগাকাকার স্ত্রী বলল, শেষ অবধি যেতেই হল!

দীর্ঘশ্বাস নেমে এল।

কেবল মাত্র দীর্ঘশ্বাস নয়, শতাব্দীর অভিশাপ।

এ অভিশাপ নেমে এসেছে স্রষ্টার নামে, দাবীদারদের বিকৃত ভাবধারার কুৎসিত আস্ফালনে। অভিশপ্ত মানব সন্তান ছুটছে আশ্রয়ের আশায়। নদীর এক কুল ভাঙ্গছে, মানুষ ছুটছে অপর কুলে শুধু মাত্র দ্বিপদ ভূমির আশায়, আশার কেন্দ্র নিরাপত্তা। পেছনে রেখে আসছে স্বজন, সন্তান, সম্পদ, সুখের আলয়, রেখে আসছে ভগ্নপদ, ছিন্নদেহ, বিবস্ত্র কুলনারী, ছুটছে তারা দুরন্ত বেগে। কখনও দূরে, কখনও নিকটে শোনা যাচ্ছে বিতাড়নকারীর অট্টহাস্য, রুক্ষহাসির ঝাপটায় দেহের ক্ষীণ তন্তুগুলোও সামান্য স্পন্দনের পর অসাড় হতে থাকে। যারা যুগদেবতা বলে পূজিত হন, তাদেরই পূত চিন্তা ধারা ও শিক্ষার বিকৃত ব্যাখ্যা উন্মাদ করেছে মানুষের দলকে। চলন্ত মানুষ থমকে দাঁড়ায়, আবার ছোটে, পেছনে ছুটে আসে আর্তনাদ আর বিকট উল্লাসের মিশ্রিত ধ্বনি।

সমীর সেনের দেহটার চার পাশে ভীড় করেছে শকুনের দল। হাঁ-করে রয়েছে বক্ষ গহ্বর, ফুলে উঠেছে সমস্ত দেহটা, বঙ্কিম দেহভঙ্গী, আকাশের দিকে অপলক দৃষ্টি। শেষ জিজ্ঞাসা, ভগবান, তুমি কার? মানবের অথবা দানবের!

এগিয়ে গেছে সমীর সেনের বৃদ্ধ জনক, সন্তানের জন্য অশ্রুপাত করবার অবসর পায় নি। পিতামাতার নিরাপত্তার জন্যই সমীর সেন একটি মাত্র বংশখণ্ডকে আশ্রয় করে ফিরে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়ানো নিষ্ফল হয় নি, পিতামাতা নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে গেছে সমীর সেনের দেহ ভূলুণ্ঠিত হবার আগেই। যাদের সাথে চালে চাল বেঁধে বাস করে এসেছে বংশ পরম্পরায়,

যাদের সাথে একই পাঠশালায় একই গুরুমশায়ের কাছে বিদ্যালাভ করেছে, তারাই এসেছে ঈশ্বরের নামে নরহত্যা-লুণ্ঠন-ধর্ষণ করতে। সমীর সেন বিশ্বাস করেনি, বিশ্বাস যখন জন্মেছে তখন দিল্লীর পথ বহুদূর। বৃদ্ধ পিতা-মাতার হাত ধরে সবার অলক্ষ্যে পথে বের হয়েছিল সমীর সেন বিধির বিধান সম্পূর্ণ করতে; ব্যর্থ হয় নি সে।

জেলাবোর্ডের শড়কের ধারেই নমোপাড়া। কালকেও দেখা গেছে কলকাকলি মুখরিত। রাত পোহাবার আগেই কারা বহ্নুৎসব করে গেছে শান্তির এই আশ্রয়টিতে। একখানা কুটীরও দাঁড়িয়ে নেই সেখানে। কাল সকালেও কজন বাবু এসে সান্ত্বনা দিয়ে গেছে, হোক না পূবিয়া দেশ, তবুও পিতামাতার ভিটা! সে বাবুদের দেখা নেই আজ।

ফনাই সরকার ছুটছিল, পরিবার পরিজন ছুটছে। পথে কালকের বাবু-দের একজন। ফনাই দৌড়ে এসে সাথ ধরল। জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছ বাবু?

বাবু থমকে দাঁড়িয়ে উত্তর দিল, কেন?

তাই বলছিলাম, কালকে বকৃতিঙ্গা দিয়ে এলে, আজ তো তোমাদের টিকিও দেখলাম না। ছশো লোকের গাঁ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল, তোমরা চোখ বুঁজেছিলে, এখন তো দিব্যি পা চালিয়েছ আমাদের মতো।

বাবুর মুখখানা কালো হয়ে গেল।

গতরাতে আগুনের লেলিহান জিহ্বা আকাশ স্পর্শ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে দুরন্ত পবনের ঝাপটায় গা এলিয়ে দিচ্ছিল। ফনাই সরকার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। গাঁ ছেড়ে তারা ছুটে পালিয়েছিল বাদারে, বাদারের উঁচু গাছটার মাথায় বসে ফনাই সরকার ভাল ভাবেই সব দেখেছে। তারপর ঐ বাবুর মতো মুখ কালো করে সবাই পথ ধরেছে। যারা ছুটছে তারা ভাববার অবসর পাচ্ছে না।

থমকে দাঁড়াল শিবকুমার।

কে যেন কাতরে উঠল ঝোপটার ওপাশে।

পেছন ফিরে তাকাল শিবকুমার। না, কেউ নেই। গুটি গুটি এগিয়ে গেল ঝোপটার ধারে। হাঁ, মানুষই বটে। পা দুখানা দেখা যাচ্ছে, নড়ছে, এখনও নড়ছে।

চুপিসারে এগিয়ে গেল শিবকুমার। ক্ষীণ অর্তনাদ স্পষ্ট শুনতে পেল সে। ঝোপের কাছে যেতেই কেঁপে উঠল শিবকুমার। পা দুটো আপনা থেকেই যেন বিদ্রোহ করে উঠল। অসারে বসে পড়ল ঝোপের ধারে। হাঁ, মানুষই বটে, মেয়ে মানুষ। কতই বা বয়স ষোল—আঠার না হয় বিশ। কৈশোর পেরিয়ে সবে যৌবনের ডাক এসেছিল তার দেহে। বস্ত্র নেই, আছে রক্তাপ্লুত দেহ, দুমড়ে-মুচড়ে সুখ পায়নি লুণ্ঠকের দল। পরিত্যক্ত মাটির হাঁড়িটা কে যেন টুকরো টুকরো করে গেছে পাথর ছুড়ে। ধর্ষণের চিহ্ন আঁকা রয়েছে তার বক্ষে, নিটোল স্তন যুগল পিশাচের শাণিত ছুরিকায় স্থানচ্যুত হয়ে ভুমিতে আশ্রয় নিয়েছে। যেখানে ছিল আগামী দিনের সন্তানের ভবিষ্যত সেখানে রয়েছে রক্তের স্রোত, যেখানে শুভ্র ক্ষীর সঞ্চয় হত, সেখানে সঞ্চিত হয়েছে জমাট বাঁধা শোণিতের বরফি। উষ্ণতা নেই, হিমানীর পরশ নেমে আসছে সেখানে। লুণ্ঠক তার সর্বস্ব নিয়েও ক্ষান্ত হয নি, পরিধেয়টিও নিয়ে গেছে, হয়ত রক্ত রাঙ্গা, তবুও বিধর্মীকে অনুকম্পা জানায়নি কেউ।

শোনা যাচ্ছে অট্টহাস্য, শোনা যাচ্ছে কুৎসিত উল্লাসের ধ্বনি। আত্মরক্ষার তাগিদে ঝিমুনি কাটিয়ে শিবকুমার উঠে দাঁড়াল। আর কয় মাইল, সামনে, বেশি দূর নয়। শিবকুমার স্খলিত চরণে ছুটতে থাকে।

ওখানে কে কাঁদে!

এখন কাঁদবার অবসর নেই, অফুরন্ত অবসর রয়েছে সামনে। কাঁদবার মানুষের চোখ শুকিয়ে গেছে, কান্নার শেষ চিহ্নটুকুও নেই। চোখে মুখে রয়েছে উৎকণ্ঠার চিহ্ন, মাঝে দিগন্তে তাকিয়ে দেখছে, আর কত দূর!

কান্নার শব্দ! ক্রন্দসী নারী! সন্তান হারিয়েছে। তার পতিদেবতা হারিয়েছে দক্ষিণ হস্ত। লুণ্ঠকদের বিলম্ব সহ্য হয় নি, তর্জ্জনীর সোনার আংটি পাবার আশায় হাতখানাই কেটে নিয়েছে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতখানা চিকিৎসার অভাবে ফুলে উঠেছে, জ্বরের বেগে বেহুঁস হয়ে সে শুয়ে আছে ধান ক্ষেতের আইলের পাশে। সন্তানের ছিন্ন মুণ্ড যখন মাইল পোষ্টের মাথায় রেখে ছুটতে ছুটতে আসতে হয়েছিল তখনও সে কাঁদেনি। পতির হস্তের দিকে চেয়ে দেখবার সুযোগ সে পায় নি। নিরাপত্তা এখনও অনেক দূর। কাঁদবার অধিকার নেই, তবুও কাঁদছে, যদি কারও অনুকম্পা সে পায়।

অনুকম্পা সে পেয়েছিল অথবা পায়নি, পাবার আগেই তাকে ছুটতে হয়েছিল। পিতৃ সম্বোধনে যার চরণ আশ্রয় করতে চেয়েছিল, তার লোলুপ দৃষ্টিকে সে বিশ্বাস করেনি। মরনোম্মুখ পতিকে রেখে বেহেস্তের হুরী হবার স্বপ্ন সে দেখতে চায়নি। পলায়নের অবসর পেয়েছিল, সুযোগ সে ছাড়েনি. আত্মদানের চেয়ে আত্মরক্ষাকে সে বড মনে করেছিল। কিন্তু রুগ্ন পতিকে সে আনতে পারেনি। ধান ক্ষেতের আইলে এতদিন হয়ত শকুনের দল নেমে এসেছে।

সবাই ছুটছে। যান বাহনের অপেক্ষায় কেউ বসে থাকেনি, সম্বল শুধু পদ যুগল. ওদের ভবিষ্যত অনাহার আর রোগের অন্তরালে আত্মগোপন করেছে।

এপারের জমিতে পা দিয়ে একবার হেসেছিলাম। দু সপ্তাহ পরে একবার মাত্র হেসেছি, সেই হাসি দীর্ঘশ্বাসের নামান্তর, অভিশাপের নবরূপ। যারা ভিখারী করেছে এই লাখো মানুষকে তাদের দিকে তাকিয়ে হেসেছি। ইতিহাস এদের মার্জনা করবে না কোন কালেই। ইতিহাসকে ব্যঙ্গ করছে ওরা, ওরা ভাবছে না সবার অলক্ষ্যে এই দুর্ভাগ্যের যারা স্রষ্টা, উপাসক, হোতা ও সমর্থক তাদের জন্য তৈরী হচ্ছে কঠিন দণ্ডবিধান। বিধাতার দানের মতো অজ্ঞাতে দিনক্ষণ বিচার না করে নেমে আসবে ঐ দণ্ডবিধান ওদের মাথার ওপর। সেদিন এই পুঞ্জীভূত ক্রন্দনের সঞ্চিত অশ্রুতে ওরা ভেসে যাবে মহাকালের বজ্র আদেশ পালন করতে। সেদিন-ই সেই ছিন্নস্তনা বসন্তস্বপ্নভরা নারীর হৃদয়ে প্রলেপ লাগবে. সে দিনই ফনাই সরকারের দল খুঁজে পাবে তাদের খড-ছাওয়া শান্তির নীড। যারা যাবে তারা যাক, যারা থাকবে তাদের পরিশোধ করতে হবে মানুষের প্রতি নির্দয়তার ঋণ। মুক্তি নেই, ইতিহাস মিথ্যা নয়।

হেসেছিলাম।

যা ছিল তা না পেয়ে হেসেছিলাম।

ঋণ রেখে গেলাম। সুদ-আসলে পুষিয়ে নেবার আশঙ্কা সেদিন ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে, আজ যেন বাস্তবে তা ফুটে উঠেছে। যার নাই, তার ঋণ, পরিশোধ করবে আগামী দিনের মানুষ।

আমার তো কিছু নেই। ছিল বাস্তু তাও নেই।

পেছনে পড়ে রইল বাস্তু।

তাই বাস্তুহারা।

চরণ বোরেগী গাই আর বাছুর নিয়ে আসছিল।

আটক করল ওপারের মানুষ।

চরণ তাদের চরণ ধরল। আমার সব নাও, ধেনু-বৎস দাও।

ওটা হবেনা, গাঁ পরে ফলার হবে। চলে যাও ওপারে সোজা রাস্তা ধরে।

চরণ চোখের জল ফেলছিল, মুঙ্গলীগাই চরণের হৃদয় বেদনাও বুঝেছিল। তার চোখেও জল। এপারে এসে চরণ থমকে দাঁড়াল। 'হাম্বা' ডাক শুনে পেছন ফিরে তাকাল। মুঙ্গলী ডাকছে, কতশত মুঙ্গলী ডাকছে, কে কার ডাকে ফিরে তাকায়। চরণ অতোশতো বোঝে না।

নিবারণ থমকে দাঁড়িয়ে গিন্নীর দিকে তাকাল।

কিছু বলছ ?

বলছি! হাঁ। ভাদইগুলো কাটা শেষ হল না। মাঠেই ধান মারা যাবে। নৈমুদ্দি তার দলবল নিয়ে বসেই আছে। সময় যদি পাই, দেখব শালাকে।

গিন্নী বলল, মাঠেই মারা যাক আর ঘরেই মারা যাক, নিজেরা মারা যাইনি এই তো কপাল।

নিবারণ অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

কদিন আগে ভরদুপুরে তার খিড়কি পুকুরে জাল দিয়ে সব মাছ ধরে নিয়ে গেছে নিয়ামতপুরের আছিরুদ্দি বেপারীর বেটা।

নিবারণ বাধা দিয়েছিল।

কপাল ভাল, ঠ্যাঙ্গানির হাত থেকে বেঁচেছে। কেরুমোল্লা সহজ ভাবেই বলেছিল, তোর পুকুর মাথায় করে হেঁদুস্তানে চলে যা। এটা তোদের মুলুক নয়।

নিবারণ ভাবছিল একটা কলমের খোঁচায় নিজের দেশে সে পরদেশী হয়ে গেছে। কলমের এমন জোর যার গুঁতোয় 'আহা' বলবার লোকও আর নেই।

নিবারণের বউ কথা বলছিল সঙ্গী বিধবা মহিলার সাথে।

লাউগাছে নতুন জালা এসেছিল।

তারপর দীর্ঘশ্বাস।

এ দীর্ঘশ্বাসের তলায় রয়েছে নিজস্ব গৃহের গর্ব। কবে লাউগাছের অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল তাও মনে রয়েছে নিবারণের বউয়ের। গত বছর রোজ বিকেলে এমনিধারা লাউগাছ লাগিযে সে সেবা করেছে গাছের। নিবারণ ঠাট্টা করত, বউ বলত, বোঝা যাবে আগে জালা আসুক। সত্যিই লাউয়ের জালা আসতেই নিবারণের আর তর সইছিল না। তাগাদা দিত, কবে লাউ আর বড়ি দিযে ঘণ্ট করবে গো! সেই গাছেই বার চোদ্দটা লাউ পেয়েছে নিবারণের বউ। এ বছরও আশা নিয়ে গাছ লাগিয়েছে, সেই গাছকে ছেড়ে আসতে বুক ফেটে যাচ্ছিল তার। তবুও আসতে হযেছে।

কাণে কাণে খবর এসেছে। জুম্মার দিন সব হেঁদুকে গোস্ত খাওয়াবে জোর করে। নিবারণ প্রথম বিশ্বাস করেনি, যেদিন দেখল দিনের বেলায় ভূষণ মাঝির গোলার ধান লুঠ হযে গেল আর তাব যুবতী পুত্রবধুকে টানতে টানতে নিযে গেল নজরপুরের মিঞারা তখন বিশ্বাস না করবার আর কোন সুযোগ রইল না। নিবারণ পাততাড়ি গোটাতে লাগল।

বউ লাউগাছের দিকে তাকিযে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল।

আজও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে।

কি বলছ দিদি! আমাব নেতাই বলে, যাব কেন। বয়স কম, বুঝল না। বলল, আমার বাড়িতে আমি থাকব, তোরা কেন যাবি! বোকা ছেলে, বাড়ি আর তার নয়। মিঞা মুছল্লীরা ডব্‌ডবা হযেছে, ওখানে থাকবি কি করে!

আপনার নেতাই এল!

আসতেই হল। বউ নিয়ে থাকতে পারল না। পরশু রাতে বউ ফিস ফিসিয়ে বলছিল। নেতাইযের সাঙ্গাত বছির মিঞা নাকি তাকে বলেছে, চল পালিয়ে যাই। রহিম পীরের দরগায় নিকে বসতেও চেয়েছ।

বলছেন কি দিদি!

এ পাপ মুখে ওকথা শুনোনা দিদি। মা হয়ে ছেলের বউকে নষ্ট হতে দিতে পারি না। তাই না নেতাই পালিয়ে এল। বউ কাঁদছিল। বলল, আমার শ্বশুরের ভিটা। বিয়ে হয়ে এখানে এসেছিলাম, একদিনের তরেও বাড়ির বাইরে যাইনি। বললাম, সব সইতে হয় মা। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আনতে হয়েছে। আরে, ও নেতাই।

নিতাই অনেক দূরে। সঙ্গে তার বউ। মায়ের ডাক শুনে দাঁড়িয়ে গেল।

সব এনেছিস তো ?

সব পারিনি। নগদ কড়ি দিতে দিতে ফতুর হয়ে গেছি। এপার-ওপার ছুপারই সমান। শালারা মানুষ না চামার। পা ফেলতেই দাও ঘুঁষ, না দিলেই ঘুঁসি।

নিবারণের বউ ঘোমটা টেনে পিছিয়ে গেল।

নিবারণ খেঁকিয়ে উঠল. তোমার জন্যই সব নষ্ট হল। কিছুই আনতে পারলাম না।

ঘোমটার আড়াল থেকে খিঁচুনি শোনা গেল, নির্মর্দ্দার কথা। বউ বাঁচাতে পারে না. সংসার বাঁচাবে। মরলে তখন সাথে যাবে।

রাগছ কেন ? ভিটেটা পাকা কবর ভেবে ইঁট কিনেছিলাম।

ইঁটের মুখে আগুন। মিঞারা কবর দিতো ঐ ইঁট দিয়ে। আমার পেতলের কলসী তিনটে থেকে গেল, চারটে কাঁসার বগি থালা থেকে গেল, তাই আনতে পারলাম না। আবার ইঁট। মুখে আগুন ইঁটের।

মানুষের স্রোত চলেছে। সবাই ভাসছে, আমিও ভাসছি। কিনারা কবে পাব কে জানে।

কাঁদছে কে ?

নিতাইয়ের মা মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, দেখছ মাগীর আক্কেল। এপারে এসেই মরা কান্না সুরু করেছে। যত অলুক্ষণে।

কি হয়েছে ?

কোলের মেয়েটা সিঁটকে গেছে।

অমন ধারা যেয়েই থাকে। চোখে মুখে জল দাও। চেঁচিয়ে কি হবে।

নীতিবাক্য শুনতে হল। দাঁড়িয়ে গেলাম। ব্লাউজ পেটিকোট নেই। দশহাতি মোটা কাপড় রয়েছে গায়ে জড়ানো। বেদনায় আথালি পাথালি করছে। গায়ের কাপড় গায়ে নেই। যা আছে তাও বৃষ্টির জলে সাপটে গেছে গায়ের সাথে।

নগাকাকার মেয়ে মিনু এগিয়ে যাচ্ছিল। হাত চেপে ধরল তার মা। কোথায় যাচ্ছিস ! কি জাত তার নেই ঠিক, ছোঁয়াছুয়ি করে মারবি নাকি। দেখছিস না, মাগীর মেয়েটা মরে গেছে।

মিনু কিছুই না বুঝে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

নিবারণ খিঁচুনি দিল। এ বৃষ্টির মধ্যে সবাই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি। মাথা গুঁজবার জায়গা চাই। এগিয়ে চল।

আশ্রয় সবারই চাই। ছুটল ব্যাটেলিয়ান।

বাকি কি রয়েছে?

বাকি কিছু নেই।

প্রশ্ন রয়েছে।

বর্তমানের প্রশ্ন, বিলম্ব। বিলম্ব রয়েছে ঘর গড়বার। সত্বর যেটা ভেঙ্গেছে তা হল গৃহ, বিলম্বে যা পাব তাও হল গৃহ।

নদীর চরে হাজার বছরের আস্তানা, তার চেয়েও বেশি, বোধহয় প্রাগ্‌ ঐতিহাসিক যুগের গুহামানব এসে ছাউনি তুলেছিল। তারাই সভ্য মানুষের আদি পিতা। সভ্যতার জৌলুস বাডতে লাগল, আর ঝড উঠতে লাগলো মাঝে মাঝেই। ঝড়ো হাওয়া এবার টাইফুনের মতো গোঙ্গাতে গোঙ্গাতে উপস্থিত। বললাম, বন্ধু, তিষ্ঠ ক্ষণকাল। শুনল না, বুভুক্ষু ধর্মোন্মাদের টাইফুন ক্ষিধে মেটালো হাজার হাজার বছরের ছাউনি ভেঙ্গে। নতুন ছাউনি পেতে যা বিলম্ব। আকাশকে ঢাকতে হবে চোখের সামনে থেকে।

সবাই বলল, সবুর, সবুর, সব হবে। বিলম্বের মিটার নেই, মিটার নেই ধৈর্যের; বাঁধ ভাঙ্গালো ধৈর্যের। কারও প্ররোচনায় নয়, আপনা আপনি। পাণ্ডোরার বাক্স বন্ধ হয়ে যায়, মনের কোনে উঁকি দেয় আশা। এ হল স্রষ্টার দান, ভ্রষ্টার আশ্রয়। আশাকে মুঠি চেপে ধরলাম।

আসতে হল, তাই এলাম। এতে কোন রুটিন নেই, আসতেই হবে, বে-টাইমে, বে-মিছিলে, বিলম্ব সহ্য করে। ভাবছি, ঘডির কাঁটা বন্ধ হোক. সময় চলুক। চলতি সময় সিগন্যাল না দিলেই বাঁচি। ঘড়ি-ঘণ্টা হোল সময়ের সিগন্যাল। সিগন্যাল হল ব্লেডের কাটা, কাটে অজান্তে, রক্ত ঝরে নিঃশব্দে, বেদনা হয় টনটনে। এর চেয়ে বুলেট ভালো। সিগন্যাল পাবার আগেই টনটনানির ভ্যাকুম পিস্টন বন্ধ হয়ে যায়। তাও যদি অপ্রাপ্য হয় তা হলে যা আছে তাই ভালো, তাই শ্রেয়ঃ। বিলম্বের মিটার চাই না, এতে মনোরাজ্যে জগাখিঁচুড়ির লড়াই শুরু হয়।

সবাই বলল, সবুর সবুর।

কেউ বলল না, যা যায় তা আর আসে না। যা গিয়েও আসে সে রূপ বদল করে আসে।

এপারের জমিতে পা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম উত্তরে বসে আছে নগাধিরাজ। সে তো অনেক দূর। পাঁচশো কিলোমিটার পেরিয়ে। নাগালের কাছেই চরণ বিধৌতকারী লবনাম্বুরাশি। তৃষ্ণা মেটায় না, জ্বালা বাড়ায়। মাটির অতি কাছের মানুষ, তাই কাদার আস্তরণে পা দিয়ে পা টেনে তোলবার ইচ্ছা ছিল না। আরও একটু কাছে যেতে পারলে গোববার গোরস্থানের স্বপ্ন দেখতে পাব। মাটি-মায়ের বুকের পরশ বিলম্বের দুঃখ মুছে নেবে। আমাতেই আমি ফুরিয়ে যাব।

এতো জেনেও আসতে হল। একা নয়, স-ভার্যা। গৃহ ছিল তাই গিন্নীর পদ ও মর্যাদা ছিল, এখন শুধু ভার্যা অর্থাৎ ভার বহন করো। তখন কর্ত্তাও ছিল, কর্ত্তা এখন ভর্ত্তা, তাই ভরণ পোষণের দায়িত্ব রয়েছে, শাসন সংরক্ষনের দায়িত্ব আর নেই।

গৃহহীন গৃহিণী আর প্রোষিতভর্ত্তৃকা সধবা দাঁড়িপাল্লার ভারসাম্য রক্ষা করে। গৃহহীন গৃহিণীর ভার গ্রহণ ও ফাউ স্বরূপ দশন দর্শন, অবশ্য, দ্বিতীয় রিপুর তাড়নায়, এই হল ভর্ত্তার প্রাপ্য।

শাস্ত্রকাররা এসব লিখে যান নি। ওরা "তদীয়ম্ হৃদয়ম্" বলে আত্ম-প্রসাদ লাভ করেছেন। যদি আসতে হোত বাগদার মাঠে, ভার্যার ক্রোড়স্থ শিশু যদি দুধের পিপাসায় কামড়ে ধরতো জননীর শুষ্ক স্তন, আকাশ ভাঙ্গা জলের ধারা যদি পড়ত খোলা মাথায়, আর কদম ফেলতেই যদি চরণ যুগল মাটির তলার আকর্ষণ অনুভব করত, তা হলে কাম্যক বনের ঋষি শাস্ত্রকাররা হৃদয়কে দেহের মতই আলাদা ভেবে উর্দ্ধশিখা হয়ে রেসের ঘোড়ার মতো ছুটতে বাধ্য হত, নইলে খেঁকি সারমেয় তুল্য দন্ত বিকাশ করে লাঙ্গুল নিতম্বদেশের নিম্নাংশে দ্বিপদের সন্ধিস্থলে স্থাপন করে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে হত।

ওরা বেঁচে গেছেন। নারায়ে তগ্‌দীর ধ্বনি শুনতে হয়নি, আর "কানমে বিড়ি মুখমে পান" নিয়ে ধর্মযুদ্ধে বের হতে হয় নি।

এও আনন্দ। পেনফুল প্লেজার। ভেজা মাঠের সোঁদা গন্ধ, কষ্ট কাতর ভার্যার বিকৃত মুখভঙ্গী, ক্ষুধার্ত সন্তানের কাতরানি, তখনও আনন্দের রসদ

জোগাচ্ছিল। এ আনন্দ অনুভবের অতীত, আর্থিকও বলা যায়, পরমার্থিকও বলা যায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনের কথা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে নিক্ষেপ করলাম, বাঁচা গেল!

তিনটি শব্দের সমষ্টি যার কানে পোঁছালো, সে শুধু বিকৃত মুখখানাকে অমাবস্যার রাতের বিকট অন্ধকারের মতো করে বলল, মরতে আর মারতে।

বললাম, পূবটাই বুঝি ভালো!

ভার্যা উত্তর দিলেন না। হাসলেন কি কাঁদলেন আজও ঠিক করতে পারিনি। বৃষ্টির আওয়াজ তার কণ্ঠের ক্ষীণ আওয়াজকে লুকিয়ে ফেলেছিল। ভেজা চোখ, বৃষ্টির জলে অথবা চোখের জলে তাও বুঝতে পারিনি।

পূবটা স্ফীতোদর, পশ্চিমটা কুব্জ দরজির কুঁজ। সোজা দাঁড়াতে পারছে না, ধাক্কা দিলেই কূপোকাত। পশ্চিম টুলটুল করে চেয়ে থাকে, পূব হাসে। হাসিতে রক্ত দশন, উল্লাসে রক্তের নেশা, এই হল পূবের সঞ্চয়। পথ তাদের সোজা, আঘাত পাবার কাল্পনিক আশঙ্কায় আঘাত হানে অপরের বুকে, ঠিক কলিজা লক্ষ্য করে। দু একবার হাত-পা নেড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যায়, জল চাইবার অবসর থাকে না। পশ্চিম ভিক্ষার ঝুলি তৈরী করেই রেখেছে, মাটিতে পা দেবার অপেক্ষা, আসামাত্র ছেঁড়া ঝুলি তুলে দেয় হাতে।

নতুন জীবনের পা-দানিতে পা দিতে হল। স্প্রিংয়ের মতো ঝাঁকুনি দিতে দিতে নতুন জীবন ফেলে-আসা দিনগুলোকে ভুলিয়ে দেয়। ঝাঁকুনির বেগ বৃদ্ধি পেলে ছিটকে পড়তে হয় মাঝে মাঝে। বয়সটা হিসাব করে দেখলাম। ষাট পেরোয়নি। ষাট পেরোলে নতুন জীবনের স্প্রিংয়ের ঝাঁকুনিতে হাঁটুতে হাঁটুতে ধাক্কা লাগত, চলার পথটা মসৃণ হলেও হোঁচট খেতে হত অবিরাম সে হাঙ্গামা থেকে বেঁচেছি। হাত জোড় করে কপালে ছোঁয়ালাম। বয়সটাই যা ভরসা, বিদ্যাবুদ্ধি তো ছেঁদো কথা। আগে যারা এসেছে তারাই বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। আমাদের ওসব রয়েছে সর্ষে পরিমাণ, যারা আরও পেছনে আসছে তারা সব খুইয়ে আসবে। আসবে তাদের দেহটা আর কলিজার লাপ্‌ডাপ্‌ আওয়াজ। বুকের সাথে কান ছোঁয়ালে আওয়াজ শোনা যাবে, বাইরে তার প্রকম্পন থাকবে না।

মুখ ফিরিয়ে পেছনটা দেখে নিলাম। ওটা মানুষের স্বভাব, সামনে

তাকাবার আগেই পেছনটা দেখে নেয় ভালো করে। ওপারের সবুজ ঘাসের মাথায় বৃষ্টির জল আছড়ে পড়ছে, এ পারেও তাই। মানুষের পায়ের চাপে সবুজ ক্রমশ ঢাকা পড়ছে কালো মাটির তলায়। প্রথম আঘাত লেগেছে ঐ মাটির বুকে, সে মাটির পূর্বেরই হোক আর পশ্চিমেরই হোক। মানুষের বুকে যে আঘাতের ক্ষত তার চিহ্ন বাইরের মানুষ দেখে না, মাটির বুকে সেই মানুষই আঘাতের আঁচড় কেটে রেখেছে, তাই দেখে আঁতকে উঠেছে অনেকেই।

জিজ্ঞাসা করল সমব্যথী সঙ্গীটি। বায়াত্তর দুগুনো একশত চুয়াল্লিশ কিলোমিটার পথ হেঁটে তার পায়ের গুলিদুটো কোল বালিশের মতো ফুলে উঠেছে। জিজ্ঞাসা করল সেই লোকটিই, আমাকে নয়, পাশের মেয়েটিকে।

হাঁরে, কাঁদছিস কেন ?

উত্তর এল না, এল টাইফুনের গোঙানি। সমব্যথী ব্যথায় বেঁকে গেল, কাঁদার অধিকার যেন তার একার। মেয়েটাকে দেখলাম। নেহাৎ রোগা, বয়সটা বেশি হলেও ঢোল্লা ফ্রকের তলায় বয়সটা ঢেকে গেছে। পাকা চোখ ফাঁকি দেবার মতো পরিচ্ছদ। বয়সটা ওজন করবার যন্ত্র নেই।

মেয়েটির কান্না থেমে গেছে। সে বুঝেছে কাঁদাটা তার অনধিকার চর্চা। কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, বাধা দিল সঙ্গী। বলল, ওর বাবা-মাকে খুন করেছে।

অনেকগুলো প্রশ্নকর্তা একসাথে প্রশ্ন করল, কে ?

বক্তা খিঁচিয়ে উঠল, বলল, নাম লিখে রেখে যায়নি।

কান্না ভরা মুখটায় কালো খামচানির দাগ। সেই মুখে হাসি দেখা গেল। যারা খুন করে তারা কাগজ কলম নিয়ে আসে না। তাদের শাণিত কলম বুকের রক্ত দিয়ে লিখে দেয় মৃত্যুর পরোয়ানা। এতো সহজ কথা যারা বোঝে না তারা পূব থেকে পশ্চিমে না এলেই পারত।

এসেছ যখন তখন স্বীকার করে নাও।

পশ্চিমে, সকাল হয় দেরীতে, পূবের আকাশ ফর্সা হয় আগেই। সেইতো ছিল ভালো। এখানে কেন মরতে এসেছ তোমরা।

কেমন একটা ফিকে হাসি ঠোঁটের কোণায় দেখা গেল। পূবের লোক বাস্তবতায় বিশ্বাসী, দল বেঁধে কাজ করে ; পশ্চিমের মানুষ মননশীল, কাগজ কলমের কারবারী, প্রতিবেশীর সাথে বাক সংঘর্ষ ঘটায়, কথায় কথায়

আদালতে যায়। পূবের আদালত মানুষের মুঠোয়, রোদের আলোতে আদালত চিক চিক করে।

ফিকে হাসিতে রঙ্ ধরল। চোখ মেলে তাকিয়েই অবাক। কান্নাভরা মুখখানা যাদের মনে বেদনার ঢেউ তুলেছিল, তাদের দৃষ্টি তখন ভেজা ফ্রকে। লেপটে গেছে মোটা ফ্রকটা রোগা সুন্দরী মেয়েটার দেহে। বয়সটা ধরা পড়েছে ওদের চোখে। হাসিতে দাঁত দেখা গেছে, গরুর দালাল দাঁত দেখে বয়স ঠিক করেছে। মেয়েটা বোধহয় বুঝেছে। এই একটি মাত্র বিষয়ে পূব পশ্চিম হাত ধরাধরি করে চলে, এখানে কোন বিবাদ নেই। মেয়েদের বয়স দেখতে হাজার জোড়া চোখ একসাথে বিস্ফারিত হয়।

কান্নার বন্যা থেমেছে, গামছা বাঁধা পোটলাটা আলগা করে গামছা জড়িয়ে নিল দেহে।

ভার্যা গর্জে উঠলেন।

বললেন, দুধ নইলে বাচ্চা-খোকা বাঁচে না।

ফিকে হাসিতে রঙ্ ধরবার আগেই চৈতালি ঘূর্ণী, বোশেখী কালো মেঘ। চোখ ফিরিয়ে নিতে হল। ছুটতে হল বনবাদার ভেঙ্গে গাঁয়ের সন্ধানে। দুধ চাই, নইলে বাচ্চা বাঁচে না।

হাড় জির-জিরে একজোড়া মানুষ বেরিয়ে এল হাঁকডাক করতেই। কথা শুনেই তারা চোখ টেপাটেপি করল, তারপর হেসে উঠল হো-হো করে। জাঁতায় পাথর কুচি দিয়ে কে যেন পাক দিল। হাসির ধাক্কায় হাল্কা দেহ দুটো দুলে উঠল। ঘরঘরে আওয়াজের সাথে নাকি সুরের খোনা আওয়াজ রথের মেলার কঞ্চির বাঁশীর মত বেজে উঠল।

দুঁদ্! তারা যেন নতুন নাম শুনছে। পদার্থটা ওরা যেন এ জীবনে দেখেনি। মায়ের বুকের দুধ খেয়েছে, তারপর শুনেছে, দুধ একটি শ্বেত জলীয় পদার্থ। সোজা আঙ্গুল বাড়িয়ে বলল, চঁলে যাঁও ঝাঁউডাং-আঁ।

পথটা সোজাই মনে হল। পা মেলবার আগেই চোখ মেলতে হল। তিনটে বাচ্চা নিয়ে দূরের বটগাছতলায় মোটাসোটা বুড়ী ছাগল।

আশার আলো, ছাগল কালো।

জিজ্ঞাসা করলাম, একটা মাটির ভাঁড় দিতে পারো?

আবার সেই পাথর ভাঙ্গা আওয়াজ।

পেঁছনের ছাই গাঁদায় দেঁখো।

রেলস্টেশনের চায়ের ভাঁড়ের ভগ্নাংশ। এও ভাগ্য। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চললাম। ছাগল কালো, আশার আলো। বৃষ্টিটা ধরে এসেছে। পালিয়ে না যায়। আলের পাশে খানা, জল জমেছে। ধুয়ে ফেললাম ভাঙ্গা ভাঁড়টা। চোখ রাখলাম আশার আলোতে। তিন সন্তানের জননী, বাঁট চেঁছে মুছে দুধ খেয়েছে সন্তানের দল। অনিচ্ছুক জননী বার আষ্টেক পা নাড়া দিয়ে আপত্তি জানালো, আকাশের দিকে মুখ তুলে করুণ কণ্ঠে আবেদন জানালো, হয় আমাকে না হয় বিধাতাকে। শুকনো বাঁটে শক্ত আঙ্গুলের নির্মম পেষণে যা বেরিয়ে এল তাকেই দুধ বলতে হল, রঙটা সাদা না হয়ে লাল হতেও পারত। পরিমাণ যতই কম হোক পরিণামে আমার বাচ্চা বাঁচবে।

আকাশের কালো মেঘ এখনও ছুটোছুটি করছে, বৃষ্টি থেমেছে, গাছের পাতা থেকে টপ্‌টপ্‌ করে মোটা জলের ফোঁটা তখনও পড়ছে। ভাঙ্গা ভাঁড়টা আঁচলের তলায়, দেড় তোলা দুধের মায়া দেড়লক্ষ টাকার চেয়েও বেশি। তখন কে জানতো দুধের রঙ্ আর চোখের রঙ্ একাকার ঘটাবে।

ফিরে এসেই আক্কেল গুরুম্। ভার্যার স্থানে বসে রয়েছে রোগা সেই মেয়েটা, ডানে বাঁয়ে পোটলা-পুটলি, বাচ্চাটাকে বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। ভেজা শালিকের মত চিঁচিঁ একটা আওয়াজ বেরুচ্ছে তার গলা থেকে।

মুখ নীচু করেই মেয়েটা জিজ্ঞাসা করল, দুধ পেয়েছেন ?

আঁচলের তলা থেকে সযত্নে রক্ষিত ভাঙ্গা ভাঁড়টা বের করে দিলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, বাচ্চার মা কোথায় ?

উত্তর না দিয়ে হাত বাড়িয়ে অনির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থান দেখিয়ে দিল। ভাঁড়টা ছিনিয়ে নিয়ে কাচা দুধটুকুই নিপুণতার সাথে বাচ্চার গলায় ঢেলে দিতে লাগল। শুকনো গলায় দুধ পৌঁছেই যত গোলমাল। বাচ্চার হেঁচকি উঠতে থাকে। মেয়েটা 'ষাট ষাট' বলে ধীরে ধীরে ঝাঁকুনি দিল বাচ্চাটাকে।

হঠাৎ বলে উঠল, কি দেখছেন ?

তুমি তো পাকা গিন্নি।

মেয়েরা ওমনি ধারাই হয় গিন্নীপণা তাদের জন্মগত। বারো আর বিরাশিতে ফারাক নেই।

তা বটে। আগে জানতাম না, আজ জানলাম।

কান্নাভরা মুখখানায় হাসির ঝলক। জয়ের গৌরব, পরাজিতের ওপর অনুকম্পা। বুঝলাম, বললাম না।

কিন্তু বাচ্চার মায়ের কাছে পৌঁছাতে হবে যে।

সে অনেক দূর। সেই হাসি জয়ের নয়, তামাসার।

মানে ?

আসলেও আসতে দেরী হবে।

কেন ?

আমার বাপ-মা আসেনি।

তাদের তো কোতল করেছে, জবাই করেছে।

এখানে উল্টোটা। আদব জানিয়ে কোতল হয়, জবাই হবার জন্য এখানকার মানুষ গলাটা এগিয়ে দেয়।

তার কথা শেষ না হতেই পা বাড়ালাম। দুশ্চিন্তা আর অপচিন্তা লড়াই শুরু করেছে মস্তিষ্ক দেশে। বাধা দিল মেয়েটা, বলল, কোথায় যাচ্ছেন ?

খুঁজতে।

বাচ্চা ?

বাচ্চা। তাই তো। সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। বাচ্চা আমার নিজস্ব সম্পদ তার দায় দায়িত্ব আমার। হাত বাড়িয়ে বললাম, দাও।

জবাব পেলাম, না।

কেন ?

বাচ্চাকে আমি মানুষ করব।

হাসলাম।

হাসছেন যে ?

নিজেকেই আমরা মানুষ করতে পারি না, অপরকে মানুষ করা কি হয়।

ভেজা গালে রঙের আভাস দেখা দিল।

নিজের দায় বইতে যদি পার সেটাই হবে যথেষ্ট। বাচ্চা আমার, আমাকেই দাও।

ওরে বাপ্‌রে! এই নিন।

ক্রোধভরা কণ্ঠস্বরে হাত আটকে গেল, বললাম, তোমার সঙ্গী কোথায়?

পালিয়েছে।

পথে নারী বিবর্জিতা।

তা নয়। ওদের কাজ ফুরিয়েছে। আশা ছিল তাই পেছন পেছন আসছিল। বুঝল, পাখীর বাসা ভাঙ্গলে উড়ে বেড়ায় না, নতুন বাসার সন্ধান করে।

তুমি এতো জানো।

মেয়েদের জানাটা একটু আগেভাগে হয়। নইলে ওদের আশায় ছাই দিতে পারতাম কি!

এখন কোথায় যাবে?

আপনার সাথে। বাচ্চাটা আমার কোলে থাকবে। মানুষ হব, মানুষ করব। স্কুল কলেজে যা পারেনি তাই করব।

আমারই চালচুলো নেই।

পুরুষ মানুষ কর্মী হলে চালচুলো গজায়। আমার মতো মেয়ে যখন ভয় পায়নি, আপনিই বা কেন ভয় পাবেন।

বেশ তুমি বাচ্চা পাহারা দাও, আমি বাচ্চার মায়ের সন্ধান করি।

বসতে ভয় বেশি, চলতে ভয় কম। দুজনেই চলি।

চলতে হল।

কখনও পাশাপাশি, কখনও আগুপিছু। মুখে কথা নেই দুজনেরই। বেলাটা ঝিমিয়ে এসেছে, মেঘ ঢাকা সূর্যিমামা তখন চুপি চুপি পশ্চিমে গা এলিয়ে দিয়েছে।

মাঠ পেরিয়ে ইঁটের রাস্তা। দলে দলে লোক চলেছে। উৎকণ্ঠার ছাপ নেই, বুভুক্ষার কালো আঁচড় চোখের কোলে, মুখের পেশীতে, স্তিমিত তাদের দৃষ্টি। আশ্রয় পাবার আশায় ছুটে চলেছে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে।

রাস্তায় উঠতেই জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম?

যাকে ফোঁপাতে দেখেছি তাকে হাসতে দেখলাম। বলল, কার দেওয়া নাম?

তার মুখের দিকে অবাক দৃষ্টিমেলে চেয়ে রইলাম।

মৃদুহেসে বলল, বাবা বলতেন লতিকা, মা বলতেন খুকি, কলেজের বন্ধুরা বলত লতা, আর যারা আমার বাবা-মাকে খুন করেছিল, আমাকে কয়েদ করেছিল, তারা বলত হাসনু। কোনটা আপনার পছন্দ।

সমন্বয় ঘটিয়ে বললাম, কোনটাই নয়। লতিকার লতা আর হাসনুর অনু দুটো মিলিয়ে তোমার নতুন নাম লতানু। তোমার পছন্দ হয়েছে?

মাথা নাড়ল। সেটাই সম্মতি।

আবার চুপচাপ।

বাচ্চাটা মুখ ঘসছে লতানুর বুকে। বেড়ালের জাত হলে গায়ের গন্ধে বুঝতে পারত, কে তার মা আর কে তার বাহিকা। নেহাত মানুষের বাচ্চা চোখ ফুটলেও জ্ঞান ফুটতে দেরী হয়। নিষ্ফল আবেদন বাচ্চার, তার নিষ্ফলতার করুণ চাহনি লতানুর চোখে মুখে। আবেগের সাথে মাঝে মাঝে বাচ্চাকে চেপে ধরছে বুকের সাথে। নিশ্বাসের সাথে সাথে বুকটা ওটানামা করছে, বাচ্চার মুখখানা একবার ঢাকা পড়ছে, একবার দেখা যাচ্ছে। অবুঝ শিশু মাতার স্পর্শ খুঁজে ব্যর্থতায় ফুঁপিয়ে উঠছে। দুধের বাচ্চা দুধ পাবে না এও সইতে হবে।

বুড়ো অশ্বত্থতলায় চায়ের দোকান। লতানু জিজ্ঞাসা করল, আছে কিছু পকেটে?

চলবার মতো আছে।

চলুন একটু চা খাই, বাচ্চাটার দুধও জুটতে পারে।

দোকানে জিজ্ঞাসা করলাম, দুধ আছে?

আছে, পড়ার দুধ।

লতানু বলল, তাই দাও। আর দু বাটি চা।

দোকানের ছোঁড়াটা বলল, লেঠো দেব?

সে আবার কোন পদার্থ?

বিস্কুট, দিশি। বিটেনের চেয়ে ভালো।

বক্তব্য বুঝতে কষ্ট হল না। ইংরেজ যেতে না যেতেই দিশি মালের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির হয়েছে। সংবাদটি খবরের কাগজে দেবার মতো।

বাচ্চার দুধটা ঠাণ্ডা হোক, আমরা ততক্ষণ চা খেয়ে নেই, কেমন ?

যা ভাল বোঝ।

ছোঁড়াটা লণ্ঠন জেলে টাঙ্গিয়ে দিল ঝাঁপের সাথে।

চায়ে চুমুক দিয়েই লতাম্বু চিৎকার করে উঠল, ঐ-যে বউদি, ও বউদি, এদিকে আসুন, এদিকে।

লতাম্বুর চোখে জোর আছে। ভার্যা আসছিলেন। যাক্, ধড়ে প্রাণ ফিরে এল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় গিয়েছিলে ?

দুধ আনতে।

বাচ্চার কাঁসার বাটি বের করল শাড়ির তলা থেকে। এক বাটি দুধ।

জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি দুধ পেয়েছ ?

বললাম, হাঁ।

লতাম্বু বলল, খাইয়ে দিয়েছি বউদি।

বউদি ক্লান্তিতে বসে পড়ল। চায়ের বাটি এগিয়ে দিল দোকানের ছোকরা, একগণ্ডা লেঠো তার সাথে। বাচ্চার মুখ ঘসানি বন্ধ হয়েছে, ভার্যার ব্লাউজের তলায় তার মুখ। লণ্ঠনের মৃদু আলোতেও ভার্যার পরিতৃপ্তিটুকু নজরে পড়ল। চুপ করে মিটি-মিটি তা দেখছিলাম। লতাম্বু ফিরিয়ে দিয়েছে পড়ার গোলা। অশ্বত্থমা দুধ পেয়েছে, চালবাটা গুলে খাওয়াতে আর হবে না।

রাস্তা ছেড়ে গাঁয়ের পথ ধরলাম। রাতের আশ্রয় কোথাও চাই। শহর অনেক দূর। সামনেই হাটতলা। দোচালা খড়ের কটা ছাউনি। অন্ধকারে হাঁতড়ে হাঁতড়ে পরিষ্কার করলাম মেঝেটা, বিছিয়ে দিলাম পরণের ধুতি, লতাম্বুর গামছাখানা হল লজ্জা নিবারণের একমাত্র আচ্ছাদন।

ভার্যা বললেন, পোঁটলাটা খোল, বাচ্চাকে শোয়াবো।

বৃষ্টির জলে ভিজে ভেপসে উঠেছে পোঁটলা। বললাম, লাভ নেই সব ভেজা।

তা হলে, ভার্যার কণ্ঠস্বর থমথমে, আঁধারে আঁধার মুখখানা আড়াল রয়েছে ভাগ্যি, নইলে দশনের নিষ্ফল দংশন প্রচেষ্টা সুখকর হত না।

লতাহুর গেরস্তবুদ্ধি বেশি। চুপি চুপি কানের কাছে মুখ এনে বলল, চাল থেকে কিছু খড় খসিয়ে আগুন জ্বালালে কেমন হয়।

মন্দ কি! দেশলাই নেই। আগের দিনে বামুনের মুখে আগুন ছিল এখন আগুন দিয়ে বামুনের মুখ পোড়ানো হয়।

লতাহুর চেহারা দেখতে পেলাম না। উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল। সোজা রওনা দিল ইঁটের রাস্তার দিকে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাচ্ছ?

আগুন আনতে।

একেই তো সবই পুড়েছে আবার রাস্তা বেয়ে আগুন আনবে। সহ্য হবে কি?

লতাহু হয়ত বুঝল না আমার কথা। হাল্কা বাতাসে বাঁশের পাতা যেমন মর্‌মরিয়ে উড়তে থাকে তেমনি উড়ে চলল লতাহু।

ভার্যা কথা বলবার অবসর পেলেন। বলল, তোমার দেরী দেখে দুধের চেষ্টায় আমিই বের হলাম। তের আনা দিয়ে একবাটি দুধ পেলাম। গরম করতে যা দেরী হয়ে গেল।

অপত্য স্নেহ যে বিচার বুদ্ধি লোপ করে দেবে তা বোধহয় ভাবনি। ফিরে এসে গোলক ধাঁধায় ঘুরে বেড়াতে হত। লতাহুর চোখের জ্যোতি না থাকলে সারারাত নিশিতে পাবার মতো তুমিও ঘুরতে আমিও ঘুরতাম। আমি দুধ আনতে গিয়েছিলাম তা জেনেও কেন গেলে?

দেরী হচ্ছিল। আমি যে মা!

গম্ভীরভাবে বললাম, মায়ের আনা দুধ গলার ফুটোয় প্রবেশ করবার আগেই অপত্য নিরাপদ স্থানে সবার অজান্তে পাড়ি জমাতো।

ভার্যা উত্তর দিলেন না। যুক্তিটা মনে মনে স্বীকার করেই বোধহয় চুপ করে গেলেন।

লতাহু ফিরে এসেছে। হাতে দেশলাই। বলল, এগার পয়সা নিলো। সুযোগ বুঝে দাম বাড়িয়েছে। বেহদ্দ চামার। চোখের পর্দা নাই।

লতাহু হাটতলার ঝুপরির চালে হাত গুঁজে শুকনো ভেজা পরখ করছিল। নিরাশ হয়ে বলল, শুকনো খড় নেই। সব একাকার।

তাই নামাও।

ধুঁয়ো হবে।

মন্দ কি। ফুঁ দিয়ে গুলকে নেব। সাঁজাল দেওয়াও হবে, গা তাতানোও হবে।

খড়ের বোঁদায় হাত গরম করে ভার্যা ব্যস্ত হলেন বাচ্চাকে গরম করতে।

লতাহ্নু আগুনে ফুঁ দিয়ে চোখ মুছছিল। বিরাম নেই, যতি নেই। হঠাৎ মুখ উঁচিয়ে বলল, একটা হাঁড়ি আর চাট্টি চাল ডাল থাকলে মন্দ হত না। এই আগুনেই ফুটিয়ে নিতে পারতাম।

ভার্যা বললেন, খুব খিদে। পোঁটলায় রয়েছে চাল ডাল। ছোট্ট এলুমিনিয়মের হাঁড়িও রয়েছে। পারবি ভাই? পারিস তো খিঁচুড়ি ফুটিয়ে নে।

লতাহ্নু জোর দিয়ে বলল, নিশ্চয় পারব।

কিন্তু নুন যে নেই।

নুন। আজকের রাতে নুন হল বিলাস।

কিন্তু জল আর কাঠ?

সামনে পুকুর আছে নইলে হাটতলায় কুয়ো আছে নিশ্চয়। ওপাশেরই ছাউনি থেকে বাঁকারি খুলে আনুন।

পশ্চিমের বড় কাজ হাত সাফাই। আগে জানতাম না যে এসেই সে বিদ্যা মস্ক করতে হবে। মনটা খুঁত খুঁত করছিল। লতাহ্নুর তাগাদায় আনতে হল বাঁকারি। আনলাম হাঁড়ি ভর্তি জল।

অনেক রাতে রান্না শেষ হল। ছোট্ট হাঁড়িতে তিনজনের উদর ভর্তি করবার মতো স্থান নেই। ভাগাভাগি করে চেটেপুঁছে খেলাম। নুন নাইবা থাকল, পরিমাণটা যদি বেশি হত তা হলে আপশোষ করবার ছিল না। সবারই একই দশা। কেউ বলতে পারছে না কার উদরের কতটুকু অংশ ভর্তি হয়েছে।

লতাহ্নু ডাকল, বউদি।

ভার্যার পেটে দানা পড়েছে, মনটা খট্‌খটে শুকনো মনে হল না, বর্ষার মাটির মতোই ভেজা। লতাহ্নুর ডাক শুনে উত্তর দিল, কেন ভাই?

আজকের কথা মনে থাকবে অনেকদিন। কাল সকালে ছাড়াছাড়ি হব। তারপর!

ভার্যা চিন্তিত ভাবে বলল, তারপর? কপাল।

লতাম্নু বোধহয় কথা শুনে হেসেছিল।

দেখতে পাইনি হাসি।

তাই বটে! বলেই লতাম্নু খুঁটিতে হেলান দিয়ে আঁটসাঁট হয়ে বসল। উনুনের আগুন নিবু নিবু, হাতের পাশে কয়েক মুঠো খড়। আগুনের গায়ে খড ছড়িয়ে দিতে দিতে বলল, আজকের রাত তা হলে কাটল।

বললাম, হিসাবের খাতায় পরমায়ুর একটি দিনের অঙ্ক কমলো।

লতাম্নু কি বলল শোনা গেল না।

তারপর চুপচাপ।

রাত বাডতে থাকে। ঝিমুনি এসেছে সবার চোখেই। তবুও সজাগ হয়ে বসতে হয়েছিল।

ক্রমেই রাত বাড়তে থাকে। শেষ রাতের ফুরফুরে বাতাস বইতে সুরু করেছে। বৃষ্টিও থেমেছে, আকাশের মেঘও ভেঙ্গে গেছে স্থানে স্থানে। স্বল্পালোকে কালো মেঘগুলো পাহাডের মতো মাথা উঁচু করে রয়েছে। ভার্যা খুঁটি হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে গেছে। বাচ্চাটা মায়ের কোলে গরম পেয়ে নেতিয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে ব্যাঙ্‌ ডেকে উঠছে। পেঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে।

ভাবছিলাম। আকাশের ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘের দিকে চেয়ে দেখছিলাম। কি ভাবছিলাম আজ আর সে কথা মনে নেই। আগামী দিনের দুর্ভাগ্যের কথা মাঝে মাঝে মনের কোণে উঁকি দিচ্ছিলো। আতঙ্ক না জাগছিল এমন নয়। আমার পথের যাত্রীদল কোথায় মিলিযে গেছে তা জানি না। তাদের কথাগুলো মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল।

কি মায়া! নগাকাকার মেয়েটা তার আদরের পুষিটাকে ফেলে আসতে চায় নি অথচ আসতে হয়েছে। নতুন লাউ গাছের লতায় জালা ছেড়ে আসতে নিবারণের স্ত্রীর কত দুঃখ। ছেড়ে আসার দুঃখকে মিইয়ে দিয়ে ছিল প্রাণের মায়া আর মনের আশঙ্কা। মানুষ সব ছেড়ে ছুটে আসতে বাধ্য হয়েছিল। ওদের মতই আমি নিজেও এসেছি নিরুপায়ের মত।

লতাম্নুর আহ্বানে চিন্তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

শুনছেন?

বললাম, হুঁ।

ঘুমোননি ?

তুমিও।

তা বটে। বউদিকে শোযাবার মত স্থান করা যাবে কি ?

বর্তমানে নয়। সবই তো ভেজা। গায়ের গরমে যা শুকিযেছে তা দিয়ে শোবার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।

লতাম্বু চুপ করে বসে রইল।

খুঁটি হেলান দিযে ভাবতে হচ্ছে। এক বছর আগেও যা ভাবিনি সেই ভাবনা। আহার্য আর আশ্রয়, কর্ম আর ধর্ম।

খুঁটিতে হেলান দিযে ঘুমিযে পড়েছিলাম।

সকাল হযে গেছে। রোদ এসে পড়েছে মুখে। ধবমরিযে উঠলাম। চেয়ে দেখি ভার্যা তখনও ঘুমোচ্ছে। বাচ্চাটাও ঘুমোচ্ছে, সারারাত কাঁদেনি। কদিন আগে শুকনো বিছানায় শুযে চিৎকার করে কেঁদেছে। আজ ভেজা কোলেই তার ঘুমের আধিক্য। বাচ্চাও যেন মেনে নিযেছে দুর্ভাগ্যকে। প্রতিবাদ জানাবার মতো গলার জোর তার নেই। আগামী দিনের ভয়ঙ্কর পরিণতি বোধহয় বাচ্চাটাও বুঝেছিল।

কিন্তু লতাম্বু ?

আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম, লতাম্বু কোথাও নেই। পুকুরে নাইতে যায়নি তো ? অন্য কোথাও। ভার্যাকে ডেকে তুললাম।

কাপড় জামা সামলে নিয়ে ভার্যা পদব্রজনের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল।

বললাম, লতাম্বু নেই।

তাইতো !

একটু অপেক্ষা করতে হবে, হযত কোথাও গেছে।

অপেক্ষা করতেই হল। ভার্যা বের হল দুধের খোঁজে।

বেলা পড়তে লাগল।

আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। আবার জনস্রোত চলতে আরম্ভ করেছে অবিরাম গতিতে।

ভার্যা এল কিন্তু লতাম্বু এলনা।

চব্বিশ ঘণ্টার পরিচয়ও নয়। অথচ মনের কোণে কেমন যেন স্থায়ী আঁচড় কেটে বসেছে। স্বজন হারাবার বেদনা বোধ করতে লাগলাম।

তবুও চলতে হল।

পিতা পিতামহের গৃহ ছেড়ে আসতে হয়েছে, বেদনায় নয়ন পল্লব অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়েছে। পেছনে ফেলে এসেছি জীবনের স্মৃতি, যাতে দুঃখের আলপনা রয়েছে, রয়েছে সুখের ব্যাপ্তি। তবুও আসতে হয়েছে। মাটির মায়া মর্যাদার মায়াকে পরাস্ত করতে পারেনি। সবই ছেড়ে আসতে হয়েছে, লতাহ্নকে ছাড়া এমন কিছু নয়। সূক্ষ্ম অনুভূতির তন্তুগুলো পুষ্টির অভাবে শুকিয়ে গেছে। হৃদপিণ্ডের চাঞ্চল্য হৃদয়ধর্মের পরিচয় নয়, এ সত্য বুঝতে শিখেছি। লতাহ্নর আকস্মিক তিরোভাব সাময়িক একটা আলোড়ন মাত্র, হৃদয়ের কাছে তার স্থান ও স্থায়ীত্ব নগণ্য।

এগিয়ে চললাম।

ভাবতে ভাবতে চলছি। ভার্যার মুখখানা মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছিলাম। সেখানেও কালো মেঘ।

কাল রাতে লতাহ্নকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোথায় সে যাবে!

সে বলেছিল, খোলা আকাশের তলায় আশ্রয় কি পাব না?

তা পাবে কিন্তু নিরাপদ নয়।

লতাহ্ন হেসেছিল, বলেছিল, আপদকে মাথায় নিয়ে যারা আসে তারা নিরাপদ কখনও হয় না। তাই আসবার সময় এনেছি সোনা আর নরহত্যার আদর্শ।

চমকে উঠেছিলাম।

লতাহ্নর ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি, বলল, চমকে উঠছেন? স্বাভাবিক। আসবার সময় শোধ নিয়ে এসেছি। ঘুমিয়ে ছিল নিশ্চিন্তে। হাসনুর কব্জায় কতটা জোর তা জানতো না। মাঝ রাতে বাক্স-প্যাটরা খুলে বেঁধে নিলাম তার সর্বস্ব যা সে লুঠ করে সংগ্রহ করেছিল। তারপর বসিয়ে দিলাম এক কোপ। মাথাটা দেহ থেকে খসে পড়ল। শব্দ করবার মতো ফুরসত পেল না।

অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়েছিলাম।

লতাহ্ন নির্বিকার ভাবে হেসে বলেছিল, কি ভাবছেন? যারা অপরের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে না, তারা কোন অনুকম্পা পাবার অধিকারী নয়। শাড়ি ছেড়ে ফ্রক পরলাম। ফ্রকে বয়স কমায়, শীর্ণ দেহে ফ্রকের আবরণ

মুক্তি ঘটালো। পেরিয়ে এলাম পূবের মাঠ। এবার পশ্চিমের সাথে লড়াই সুরু। এখানে আপদ আর নিরাপদ একই অর্থ বহন করে।

লতাহুর নির্মমতা মনের কোনায় কোন ক্ষুদ্ধ তরঙ্গ উঠতে দেয়নি, বরং তার বলিষ্ঠতা এবং সহজ সরল স্বীকৃতি কেমন যেন মোহ সৃষ্টি করেছিল।

ভাবতে ভাবতে চলছি।

ভার্যা ফিবে তাকাল।

জিজ্ঞাসুভাবে আমিও তাকিয়ে দেখলাম।

বাচ্চার গা গরম।

বললাম, কাল ঠাণ্ডা লেগেছে।

যাই লাগুক জব ছাড়াবার ব্যবস্থা না করলে জ্বর ছাড়ে না। কাছেই শহর। ডাক্তার দেখাও।

বক্তব্যে অস্পষ্টতা নেই, কর্তব্যে স্পষ্টতার অভাব। পাথর বাঁধানো রাস্তাটা খালের মাঝে নেমে গেছে, দুধারে দোকান, বড় বড় পাইনগাছের সারি। সোজা রাস্তাটা বাঁ-হাতি গিয়েই স্টেশন। রয়েছে কতকগুলো ঝুপরি, ভাড়া দিতে নয়, ভাড়া পেতেও নয়। গুটিগুটি এগোচ্ছি ঘর ভাড়া করে, আশ্রয় পাবার আশায়। ঘর ভাড়া পাবার আশ্বাস কেউ দিল না।

ভার্যা ক্লান্তি আর বিরক্তি নিযে বলল, এ কেমন শহর বাপু, মানুষ যদি মাথা গুঁজবার স্থান না পায তাহলে শহর থাকার প্রয়োজন কি? গাছতলাও অনেক ভাল।

ভাবলাম নীতিবাক্য শুনিয়ে দেই। মাথা গুঁজবার স্থান যেখানে সহজলভ্য নয সেইটেই হল শহর। এ সত্য আবিষ্কার করতে বিশেষ গৃহিনীকে বেগ পেতে হযনি। ধাপে ধাপে পা ফেলে অভিজ্ঞতার মনুমেণ্ট হয়ে উঠেছিল সে।

আশ্রয় পাবার আশা কম। মানুষ অনুপাতে আশ্রয় সংখ্যা নাম মাত্র, তাই পা বাড়াতে হল। দলে দলে মানুষ ছুটছে। তাকিয়ে দেখবার অবসর কারও নেই। সবারই এক সমস্যা : আহার্য ও আশ্রয়।

চলতি মানুষের দলকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাচ্ছ?

তারা বলল, তাঁবুতে।

কতদূর?

জানো না বুঝি। এস আমাদের সাথে। এতকাল বাস করেছি খড়ের-টিনের-ইঁটের বাড়িতে, এবার বাস করতে যাচ্ছি মোটা কাপড়ে ঘোমটাটানা ঘরে। লড়াইয়ের ময়দান নয়। লড়াইয়ের ময়দান থেকে আত্মরক্ষা করতে যারা এসেছে তাদের আশ্রয়। সরকারী ব্যবস্থা। লোকে বলে, তাঁবু। প্রবেশ করলে, 'তা' থাকে, 'বু-বু' করে কানের পর্দা। যাবে সেখানে?

হাঁ-না কিছু বলতে পারলাম না। তবুও চললাম তাদের পিছু-পিছু।

প্রয়োজন আশ্রয়ের, মাথা গুঁজবার স্থানের। তাঁবুও যা অট্টালিকাও তা। আয়ুর আকর্ষণে তাঁবু আর রাজপ্রাসাদ এক হয়ে গেছে। সবাই এক পঙ্‌ক্তিতে, বিশ্বসাম্যের গড়াগড়ি আর ছড়াছড়ি।

তাঁবু পেতে পেতে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল। তাঁবু পেলাম, পেলাম কয়েক মুঠো চাল। ভিক্ষান্ন, তবে না চাইলেও পাওয়া যায়।

ভার্যা আখা তৈরী করতে ব্যস্ত। উদর থাকলে উদরপূর্তির ব্যবস্থাও করতে হয়। উদরপূর্তির ব্যবস্থা করলে আনুসঙ্গিক উপকরণও থাকে। শুকনো চাল যখন চিবিয়ে খাওয়া সম্ভব নয়, তখন চাল সেদ্ধ করবার প্রয়োজন রয়েছে, তাই আগুন জ্বালাবার আখাও দরকার। মেয়েরা সংসার ধর্মের স্তম্ভ। সংসার পাতবার প্রথম ধাপেই তারা আখা পাতে, তারপর খোঁজে দানা ফুটিয়ে নেবার হাঁড়ি। এগুলো সমাপ্ত করে ভর্তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় ভরণপোষণের দায়িত্ব। আমার মতো যারা সংসারের সব রস নিংড়ে নিতে চায় অথচ দেবার বেলায় অষ্টরম্ভা তাদের শুনতে হয়, চাট্টি মুখে দিতে হবে তো!

ধমকে উঠল ভার্যা। ডাক্তারের কাছে যাও। আমি এদিককার সব দেখে শুনে নিচ্ছি।

বের হতে হল। কিছুটা এগোবার পর আবার ভার্যার গলা শোনা গেল। বলল, আসবার সময় শাকপাতা যা হয় এনো, দুখানা মাদুরও এনো।

ফরমাইশ মাথা পেতে নিয়ে চললাম বাজারের দিকে। চলতে চলতে মনে হল সকালবেলার কথা। আজই সকালবেলায় ভার্যাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, লতাদুকে কেমন লেগেছিল?

মন্দ কি!

সহ্য হল না কপালে।

তা নয়, বরং উল্টোটা। বাহির আর ভেতর এক বস্তু নাও হতে পারে, তাই সে সহ্য করতে পারেনি। নিজের পথ নিজেই খুঁজে নিয়েছে। তবুও ছিল ভালই।

ভার্যা অনেকগুলো কথা বলে দম নিল। বলেছিলাম, যদি বলি সে খুনী। আমার কথা শুনে তার কপালের শিরাগুলো কুঁচকে গেল, ভার্যার চেহারা হয়ে উঠেছিল শক্ত পাথরের মতো।

কঠিন ভাবে বলল, আমাকে তো বলনি।

বলতাম, দু ঘণ্টা আগেও লতাফু ছিল আমাদের একজন, তাকে বর্জন ও পর-জন করতে চাইনি বলেই বলিনি আর দরকারও হয়নি। ঠিক খুন নয়, আত্মরক্ষার তাগিদে যা তুমি করতে পারতে না, লতাফু তাই করেছিল। খুন করে প্রশংসা পায় সৈনিক আর পাবে লতাফু।

ভার্যা বিষন্নভাবে বলল, মেয়েদের কথা পুরুষকে না বলাই উচিত।

উচিত না হলেও মেয়েরা চিরকালই পুরুষকে সব কথা বলে। শুধু পরনিন্দার জন্য খুঁজে নেয় মেয়েদের। ওটা অন্দরমহলের একচেটিয়া।

সকাল পেরিয়ে সন্ধ্যা হয়েছে। লতাফুও আর নেই, তার সম্বন্ধে ভাববার যেমন কিছু নেই, বলবারও তেমন কিছু নেই।

ডাক্তার খুঁজে বের করে, বাজার শেষ করতে করতে রাত হয়ে গেল।

তাঁবুর শহরে তখনও হট্টগোল একেবারে থামেনি।

ভার্যা আহার্যের ব্যবস্থা শেষ করেছে ইতিমধ্যে।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে ভার্যা বিছানা করে নিল নতুন কেনা মাদুরটায়।

আজ আকাশে মেঘ নেই, বসেছিলাম বাইরে, তাঁবুর খুঁটিতে পিঠ দিযে। ভার্যা এলিয়ে পড়েছেন ততক্ষণ, বুকের কাছে বাচ্চাটাও বেঘোরে ঘুমুচ্ছে।

তাঁবুর শহরে নিশুতি নেমে এল। রেল স্টেশনের লাল বাতিগুলো আকাশের দিকে মুখ উঁচু করে জল্ জল্ করছে। ফিকে জ্যোৎস্না তাঁবুর গায়ে এলিয়ে পড়েছে। তাঁবু আর তাঁবু। এক ঝাঁক সাদা পায়রা, মাঝে মাঝে ওরা যেন গা ঝাড়া দিচ্ছে। তাঁবুর পল্লী, তাঁবুর শহর। একশ, দুশ, না অনেক বেশি। কত হিসাব নেই, ঘরভাঙ্গা মানুষের দল আকাশকে

চোখের সম্মুখ থেকে সরিয়ে রেখে মাথা গুঁজবার স্থান পেয়েছে, এই-তো যথেষ্ট।

পাশের তাঁবুতে কচি শিশুর কান্না। ওপাশে হঠাৎ নারীকণ্ঠের গোঙ্গানি। ঘুমের ঘোরের আতঙ্ক। 'মারিস না, মারিস না।' —থেমে গেল কণ্ঠস্বর। আবার শোনা গেল নাক ডাকার শব্দ।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

সকাল বেলায় ভার্যার ধাক্কায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। জড়িত কণ্ঠ, বিজড়িত চোখের পাতা। ভাল করে চেয়ে দেখলাম ভার্যা স্বয়ং।

ভার্যা এবার গৃহ পেয়েছেন, গৃহিনী হয়েছেন। নিপুণ হস্তচালনা চলছে নতুন ঘর বাঁধার। বাচ্চাটার জ্বর বোধহয় নেই। বেঘোরে এখনও ঘুমুচ্ছে।

গৃহিনী হাসল। এমন হাসি তার ঠোঁটে কখনও দেখিনি। ঠোঁটের হাসির চেয়ে কুতকুতে চোখ দুটোতে হাসির লহর বেশি। বললেন, বাপ্‌রে কি ঘুম। তাও যদি বিছানা থাকত। বসে বসে ঘুমোলে কি করে! কোন দিন দেখব ঘুমোতে ঘুমোতে হেঁটে চলেছ।

শোবার জায়গা কোথায়?

সেটাও দেখিয়ে দিতে হবে?

হেসে বললাম, তোমার গায়ে গা লাগলে তোমার ঘুম হয় না কিনা, তাই আর মাদুর অবধি এগোতে চাইনি। তোমার আবার ঘুম ভাল না হলে মেজাজ বিগরায় সেই ভয়েই বসে ঘুমোতে হয়েছে। তোমার মেজাজ বিগরে গেলে, মেজাজের সাথে যা পাওয়া যায় তাকে অভিধানে লেখা হয়নি। ওটা তোমার নিজস্ব সম্পদ, নিজস্ব অভিধানের বিশেষ শব্দ, শ্রোতার জন্য পলায়ন বিধি রয়েছে শাস্ত্রে।

গৃহিনী উত্তর দিলেন না। বাচ্চাটা কেঁদে উঠতেই আমাকে নিষ্কৃতি দিয়ে সন্তানের দিকে নজর দিলেন। আমিও বাঁচলাম। সেও সাময়িক। গৃহিনী ফিরে এসে বললেন, বাজার যাও।

বাজার! বল কি! এটা পুকুর নয়, কলসী। জল গড়ালে তলানি পড়বে। সামলে নাও। বাজার যাওয়া পায়ের মেহনত, বাজারে দ্রব্য ক্রয় বিলাস। আবার সওদা না কিনলে দুঃখ। কোনটা চাও।

গৃহিনী বোঝেন না।

বিবাহের সাথে বাজারের সম্পর্কটা বিশেষ ঘনিষ্ঠ এটা পিতৃগৃহ থেকে শিখে এসেছেন। আরও শিখে এসেছেন, প্রয়োজনকে অস্বীকার করার অর্থ বিলাসকে পরাজিত করা নয়। এ হল কাপুরুষতা। দুঃখকে যারা ডেকে আনে তারা দুঃখকে জয় করবার পথ খুঁজে পায় না, তাদের অপরিসর মন প্রসারতার পবিত্র দাবী থেকে বঞ্চিত হয়।

দার্শনিক তথ্য অনেকদিন শুনেছি। বদহজম হবার উপক্রম আর কি।

কথা না বাড়িয়ে বাজারের দিকে এগিয়ে গেলাম।

দিন যায়, রাত আসে।

আবার সকাল, আবার রাত। ক্যালেণ্ডারের তারিখ এগিয়ে চলল।

তাঁবুর জীবন।

পাশেই পরিজন। এপাশে, ওপাশে—সর্বত্র পরিজন। নতুন সবাই। সরকারী খাতায় নাম লেখা মহাজন সবাই।

সামনে রতন সূত্রধর। এলোকেশী তার স্ত্রী। দুজনের চেহারায় বয়সের হিসাব পাওয়া যায় না। সকাল বেলায় ঘুম ভাঙ্গায় একপাল ছেলেমেয়ে। রতনের ভবিষ্যত গড়বে ওরা। গুণে শেষ করতে পারিনি, রোজই ভুল হয়।

নন্তা।

মন্তা।

অন্তা।

পল্টু।

ঘণ্টু।

মণ্টু।

বড়খোকা।

কোলের খুকি।

ঝড়ু।

আষাঢে।

বুধু।

তারপর আর নাম মনে নেই। ষষ্ঠী ঠাকরুণ এখনও ঘাট ঘাট করে জল ছেটাচ্ছেন।

কেরাসিন তেলের আধমনী খালি টিন কিনেছে রতন সূত্রধর। সকাল

বেলায় টিন ওঠায় আখায়। চাল জোগায় সরকার। শাকপাতা জোগায় পল্টু আর মণ্টু। ডাল আর নুনের পয়সা জোগাড় করে ঝড়ু আর আষাঢ়ে। রাস্তায় ধোপ দুরস্ত মানুষ দেখলেই হাত পাতে। নগদ তামার টুকরো জমা হয়।

চাল ডাল শাক পাতা এক সাথে সেদ্ধ হয় কেরাসিনের টিনে। মাটির সান্‌কি নিয়ে বসে বার চোদ্দটা ছেলে মেয়ে। স্বয়ং মা ষষ্ঠী এলোকেশীর জঠরে। উদর পূর্তি করতে এক টিন লাবসি খালি হয় দু বেলায়। একটু বেশি জল দিয়ে পাতলা করে নেয় লাবসিকে, নইলে কারও মুখে মাপ মতো দানা পড়বে না।

নস্তা ফ্রক ছেড়েছে। আরও আগেই ছাড়া উচিত ছিল। লাবসি বয়স কমাতে পারেনি। রোগা দেহের বয়স ছেঁড়া ফ্রকের ফুটো দিয়ে বুকের ভাঁজ দেখিয়ে দিচ্ছিলো। নস্তা বোঝে, ছেঁডা ফ্রকের চেয়ে ছেঁডা শাড়ি অনেক ভাল। ফ্রকে বযস কমায়, বয়স কমাবার ফ্রক পসার জমায় না।

মস্তারও ফ্রক ছাডবার সময় হযেছে। মাঝে মাঝেই মাযের ছেঁডা ডুরে গাযে জডিয়ে বেরিয়ে পডে, তাঁবুতে ফিরে এসে শাডি খুলে রাখে। অস্তাও বসে আছে শাডি পাবার আশায়। ঝুনঝুনি কোম্পানী শাড়ি দিয়েছে নস্তাকে বিনি পয়সায়। ওরা দাতা লোক, লজ্জা নিবারণ করবার কেষ্ঠঠাকুর। নস্তাকে শাডি আনতে যেতে হয়েছিল। আসতে দেরীও হয়েছিল। ফিরে এসে শাডির আঁচল থেকে নগদ কাগুজে দুটাকার নোট তুলে দিয়েছিল এলোকেশীর হাতে। শাড়ি ও টাকা দিয়ে মহরৎ, দেহপণ্যের প্রথম দক্ষিণা।

নস্তা পাতা কেটে চুল বাঁধে। এসব নতুন শিখেছে। সন্ধ্যা হলেই কোথায় যেন যায়। অনেক রাতে ফেরে, আঁচলে বাঁধা থাকে কড়কড়ে নোট।

মস্তাও ছোটে বাইরে। তার হাতও খালি থাকে না।

রতন অস্তার দিকে তাকায়। ওকেও শাড়ি পরাতে হবে। তাহলে কড়কড়ে নোটের গাদা হবে তাঁবুর এ কোণায় সে কোণায়। দিন গুণছিল রতন সূত্রধর। অস্তা না বোঝে এমন নয়, শাড়ি না পরেও সে শাড়িকে টেক্কা দিতে গিয়ে জখম হয়ে ফিরে আসে।

চুপে চুপে অস্তাকে নিয়ে যায় হাসপাতালে। এলোকেশীর খন্‌খনে গলার আওয়াজ কদিন শোনা যায়নি। রতন খুঁজে বেড়াচ্ছিল কোন পকেট-

কাটিয়াকে, একদিন না একদিন অন্তা আরাম হবে, তার আগেই মোটাহাতে যদি কিছু বাগিয়ে নিতে পারে পকেটকাটিয়ার কাছ থেকে তা হলে তাঁবুর কোনায় টাকার পাহাড় জমে উঠবে অচিরেই।

সপ্তাহ না পেরোতেই অন্তাকে আবার দেখা যায় পথ ঘাটে, এলোকেশীর খন্‌খনে গলার আওয়াজ আবার ভেসে আসে, রতনকে আর বড় বেশী দেখা যায় না। পকেটকাটিয়াকে খুঁজে না পেয়ে রতন বোধহয় আশাহীনতায় আপশোষ করছে।

মাস পেরোয়।

বছর পেরোয়।

গিন্নী বললেন, নিজের ঘর করবার মতো জমি খোঁজ। এভাবে তো জীবন কাটবে না।

গিন্নীর বৈষয়িক বুদ্ধির তারিফ করলাম মনে মনে। রোজই ভাবি, আজ যাব কাল যাব। যাওয়া আর হয় না। গিন্নীর তাগাদাও ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

গেলাম চাঁদপাড়া।

ফিরতে বেলা পুইয়ে গেল।

তাঁবুতে পা দেওয়া মাত্র গিন্নী বললেন, খোকন কেমন করছে।

উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে?

বোধহয় পেট সরেছে। বমিও হচ্ছে।

ছুটলাম ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার এল, ওষুধ এল। নির্বিকার ভাবে ডাক্তার রায় দিল কলেরা।

চললো টানাটানি যমে আর মানুষে।

সকালের আলো ফুটতে না ফুটতেই নেতিয়ে গেল বাচ্চাটা। গিন্নী নীরব নিথর। নিজেও দৌড়াচ্ছি ঘর-বাহিরে।

বিকেলের সূর্য ডুবল।

গিন্নী ডুকরে উঠলেন। বুঝলাম, বাচ্চা ফিরে গেছে।

থেমে গেল গিন্নীর শোক। নিষ্পলক তার দৃষ্টি। বরফের মতো জমে গেছে তার হৃদয়। চেয়ে রয়েছে বাচ্চার দিকে। চোখে জল নেই।

গিন্নীকে ডাকলাম। সাড়া পেলাম না। গিন্নী আকাশের দিকে চেয়ে নিজের মনেই বকে চলেছেন বিড়-বিড় করে।

ভিড় করছে নন্তা-মন্তা-অন্তার দল।

ডাকলাম, শেফালি। কোন উত্তর পেলাম না। গিন্নী বোধহয় এরাজ্যের লোক নয়। খুব আঘাত পেয়েছে প্রার্থিত বস্তু কোলছাড়া হয়েছে। আঘাত এসেছে, সহ্য করবার মতো মনোবল ওর নেই।

গিন্নী নিজের মনেই বলল, মরতে আর মারতে।

তের মাস আগে বাগদার মাঠে অতি সংক্ষেপে এই কথাটি শুনিয়েছিল।

নন্তা-মন্তা-অন্তাকে তাঁবু পাহারা দিতে বলে বাচ্চাকে কোলে তুলে নিলাম। কোদাল নিলাম বাঁ হাতে, বেরিয়ে পড়লাম ইছামতীর দিকে।

আঁধার রাত। আকাশের নক্ষত্র মিটি মিটি করে হাসছে। পাইন গাছের মাথায় পাখিরা ঝাপ্‌টা ঝাপ্‌টি করছে, নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হচ্ছে মাঝে মাঝে। দূরে রেল ষ্টেশনে ভিখারীর ভীড়। সেখানকার হট্টগোল শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। এগিয়ে চলেছি। আমার এই দেহের ক্ষুদ্র সংস্করণ আমার সন্তান। সেও নিস্তব্ধ হয়েছে, আমি শুধু চলছি।

গর্ত করে পুতে দিতে হবে নিজের প্রতীককে। মাটিতে শুইয়ে দিলাম বাচ্চাকে। ধৈর্য আর বাধা মানল না। চোখ ঝাপসা হয়ে এল। আকাশের দিকে খুঁজলাম, ভাবলাম, স্রষ্টার যদি কোন চিহ্ন দেখা যায় কোথাও, তাকেই জিজ্ঞাসা করব, এর জন্য দায়ী কে! নাঃ, কিছুই নেই। যারা ভিখারী করেছে আমাকে, স্রষ্টার মাহাত্ম্য তাদের কাছেই। আমরা ঐ ওপরতলার মানুষদের ওপরে উঠবার সিঁড়ি মাত্র। বুক পেতে রাখব ওদের ওপরে উঠতে দিতে।

গিন্নী বোধহয় ঠিকই বলেছে, মরতে আর মারতে।

কোদালের বাঁট খুলে সোজা করে পুঁতে দিলাম বাচ্চার সমাধির ওপর। মৃত্যুর বিজয়দণ্ড? কার তরে? —আমার সন্তানের তরে।

ফিরে এলাম।

গিন্নি তখনও বিড বিড় করছে।

ওদিকে কে যেন কেঁদে উঠল। নরেন মিত্তিরের বউ কাঁদছে। কোলের ছেলেটার কলেরা হয়েছে।

সর্বনাশ! ছড়িয়ে পড়ল মহামারী। তাঁবুর লোক উৎকণ্ঠার সাথে

ছোটাছুটি করছে। সরকারী কর্মচারীরা হাঁপাচ্ছে। দুপুরের রোদে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভাবছে।

আমিও হাঁপিয়ে উঠলাম দু তিন দিনে। কদিন ধরে শেফালি একদানাও দাঁতে কাটেনি। তাঁবু থেকে বের হয়নি। অনবরত বিড বিড় করছে। চিন্তায় চিন্তায় আধমরা হয়ে উঠলাম।

সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখি গিন্নী নেই।

ডাকলাম, শেফালি, শিউলি, সই।

প্রতিধ্বনি ফিরে এল। শেফালি ফিরে এল না।

এপাড়া ওপাড়া খুঁজে হয়রাণ। কেউ হদিস দিতে পারলনা।

নন্তা বলেছিল, কাকিমাকে খুব ভোরে নদীর দিকে যেতে দেখেছি।

চললাম নদীর দিকে।

না।

শেফালি নেই।

গেলাম থানায়।

কি বলছেন, শোকের ধাকায় মাথার গোলমাল হয়েছিল? বেশ, বেশ, শোক কমলেই আসবেই। ছেলে মরলে ওরকম হয়ই।

সহানুভূতিটা দারোগার গোঁফের তলা দিয়ে ছিটকে বের হতেই আমিও ছিটকে বের হলাম পথে।

তাঁবুতে আসতেই নন্তা জিজ্ঞেস করল, কাকিমাকে পেলেন?

না।

সারারাত ভেবে ঠিক করতে পারলাম না কি করব। অবশেষে তাঁবুর মায়া কাটানোই স্থির করলাম।

শেফালির মত সবার অজান্তে বের হলাম তাঁবু থেকে। স্থির করলাম, দরকার হলে সারা জীবন ধরেই শেফালিকে খুঁজতে হবে।

ভালবাসা! মোটেই নয়। কর্তব্য। হয়ত তাই।

ছুটলাম দিশেহারা হয়ে।

উঠলাম ট্রেনে। পেছনে রেখে এলাম গৃহিনীর সংসার, কষ্টকরুণ স্মৃতি আর প্রাণের দুলাল। যাদের হাত ধরে এসেছিলাম তারা রয়ে গেল।
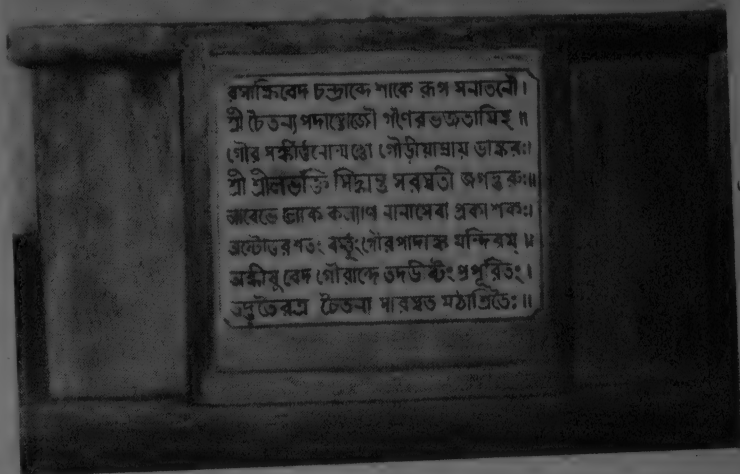
মহাপ্রভুর পদচ্ছায়া—গৌড় (পৃঃ-১৩৮)

সুজা দরওজা বা লুকোচুরি দরওজা—গৌড় (পৃঃ-১৪২)

দাখিল দরওজা— গৌড়   (পৃঃ-১৪০)

চারবাংলার মন্দির—বড়নগর   (পৃঃ-১২০)

আদিনা মসজিদের অভ্যন্তর—আদিনা (পৃঃ-১৫৩)

সিরাজদ্দৌল্লার কবর—খোসবাগ (পৃঃ-৯৭)

সোনা মসজিদ—গৌড়   (পৃঃ-১৩৯)

হোসেনশাহের মসজিদ—গৌড়   (পৃঃ-১৪১)

প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সৌজন্যে

মহারাজ নন্দকুমারের দুর্গাবাড়ি—কুঞ্জঘাটা (পৃঃ-১০৫)

যাদের নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিলাম তারা ঘর পেলনা। পরিসমাপ্তি এল বুঝি আশা-আকাঙ্খার আর সূত্রপাত হল বেদনা-লাঞ্ছনার।

ঝিমিয়ে পড়েছিলাম ভীড়ের মাঝে।

সবাই গাড়ি ছেড়ে নেমে গেছে। কুলি এসে ধাক্কা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কাঁহা জায়গা বাবু?

কলকাতা।

উতো আগিযা।

কলকাতা এসে গেছে। চমকে উঠলাম। ধীরে ধীরে নেমে এলাম গাড়ি থেকে, মিশিয়ে গেলাম জনারণ্যে।

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে তাকিয়ে দেখছি।

ও কে যায়?

ছুটে গেলাম।

না, শেফালি নয়।

ঐ যে ঘোমটাটানা বউটা।

না। শেফালি নয়।

ফুটপাত ছেড়ে রাস্তা। বড় রাস্তা ছেড়ে গলি।

দিনের পর দিন কাটছে। রাতের বেলায় ছুটে এসে শেয়ালদহের ছাউনিতে মাথা গুঁজবার জায়গা করে নিচ্ছি।

শ্যামবাজার।

ধর্মতলা।

ভবানীপুর।

সিঁথি।

বেলেঘাটা।

টালিগঞ্জ।

ক্লান্তি এসে গেছে।

থমকে দাঁড়ালাম একদিন। আর নয়।

শেফালি যদি ওরকম উলঙ্গ নারীর মতো এসে দাঁড়ায় সামনে, হি-হি করে হাসতে হাসতে ছুটে আসে, কাদা মাখা হাত দু খানা দিয়ে ধরতে আসে আমাকে তাহলে তা সহ্য করতে পারব না। তার চেয়ে শেফালি

চাপা পড়ে থাকুক উন্মাদ রাজ্যে। অতো বীভৎস শেফালিকে কল্পনা করে আঁতকে উঠলাম। মনে মনে বললাম, আর নয়।

পকেট ক্ষীণ হয়েছে।

কাজ চাই। নিজেকে বাঁচাবার দায়িত্ব নিজেকে নিতে হবে।

সকাল বেলায় বের হই কাজ খুঁজতে বিকেলে ফিরে আসি No Vacancy দেখে। নিত্যকার কাজ। এ কাজে মেহনোত হয় পেট ভরে না। এও তো কাজ। দেশের মহাপুরুষরা কঠিন কাজ করতে বলেন, তাই কঠিন কাজ করছি। কর্ম সংগ্রহ হল জীবনের সব চেয়ে বড কঠিন কাজ, তা আর শেষ হয় না।

হাঁপিয়ে উঠলাম।

তবুও ছোটার বিরাম নেই।

সন্ধ্যাবেলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম দক্ষিণ স্টেশনের পাশে।

কে যেন আবছা আলো থেকে এসে দাঁড়াল সামনে।

বলল, চিনতে পারেন?

রুগ্ন মেয়ে, ততোধিক ক্ষীণ তার কণ্ঠস্বর।

আমি লতাহু।

লতাহু। তুমি এখানে?

এখানে আজই এসেছি। হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে আজ এলাম। ছ মাস ছিলাম সেখানে। বউদি-বাচ্চা কোথায়? কেমন আছে?

আছে? —না, নেই।

মানে?

সহজ। বাচ্চা কলেরা হয়ে মারা গেছে। শেফালির মাথা খারাপ হয়েছিল, সে কোথায় যে উধাও হয়েছে জানি না। তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

লতাহু কি যেন ভাবল।

আচ্ছা, আবার দেখা হবে। পা বাড়ালাম।

লতাহু খপ্ করে হাত চেপে ধরে বলল, দাঁড়ান।

দাঁড়ালাম।

আমার কথা তো কিছু জিজ্ঞেস করলেন না?

তুমি তো পরিচয় কিছু রেখে যাওনি।

তা ঠিক। যেতে চাইনি। কষ্ট পেতেন। তাই নীরবে চলে এসেছিলাম।

তারপর ?

নিজের মুখে নিজের কথা সবাই বলতে চায় কি। তার উপর এই খোলা রাস্তায়। কোথায় থাকেন ? চলুন আপনার বাসায় যাই।

বাসা। বাসা বাঁধা হয়নি। ঐ পার্শ্বেল শেডের তলায় মাথা গুঁজে থাকি। তুমি কোথায় উঠেছ ?

আপনারই কাছাকাছি।

লতাম্নু হি-হি করে হেসে উঠল।

বললাম. চল আমার সাথে। পার্শ্বেল শেডের তলায় বসে কথা বলব।

তাই চলুন।

ফিবে এসে দেখি, আমার কদিনকার বাসস্থান হস্তান্তর হয়েছে। নতুন অতিথি এসে মাথা গুঁজবার স্থানটুকু দখল করেছে। আমি আবার বাস্তুহারা হয়েছি। দুঃখ হল। লতাম্নুর হাত ধরে এসে দাঁড়ালাম দেওয়ালটার কিনারায়। বললাম. ভাঙ্গা ইঁটখানা টেনে নিয়ে বস।

দুজনেই বসলাম।

এরপর ?

ভাবছি আর শেফালিকে খুঁজব না।

কেন ?

বললাম সেই বীভৎস উন্মাদ মেয়েটার ঘটনা।

লতাম্নু হাসল।

হাসছ কেন !

ভাবছি, এবার দুজনেই তাকে খুঁজতে বের হব। আমারও তো কোন কাজ নেই, আশ্রয়ও নেই।

আমার সাথে যেতে ভয় হবে না ?

লতাম্নু আবার হাসল। এ হাসিতে বিদ্যুত ছিল না, ছিল কেমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব। বলল, ভয়ের দিন পেরিয়ে গেছে অনেক দিন।

গম্ভীরভাবে ডাকলাম, লতাম্নু।

বলুন।

তোমাকে জানতে বড়ই ইচ্ছা হয়. কতই না অজানা তুমি।

সেই কান্নাভরা মুখখানায় হাসির ঝলক। দুধে আলতাগোলা গালে খামচানির কালো দাগগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বলল, দেরী করে কি হবে, আজ রাতেই বেরিয়ে পড়ি। আমাকে জানবার মতো অনেক অবসর পাবেন।

কোথায় যাবে ?

উত্তরস্যাম্ দিশি। তারপর চলতে চলতে একদিন ক্লান্তি আসবে। ভুলেই যাব কেন আমরা পথ চলছি। সেদিন দুজন দুজনকে জানতে পারব বেশি।

ভেবে পেলাম না, এই সেই লতাহু কিনা! তার কথাগুলো সাধারণ গেঁয়ো মেয়ের মতো মনে হল না। তার কেতাবী বিদ্যা বাদেও অন্য কোথাও বাঁধা রয়েছে তার বক্তব্যগুলো।

বেশ চলো।

ট্রেন ছুটছে। স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালেই ট্রেনের যাত্রীরা কমছে, ভীড় কমছে। আবার ছুটছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার অসুখ হয়েছিল ?

অসুখ। হি-হি করে হেসে উঠল লতাহু। হাসির কারণ বুঝলাম না। অসুখের কথায় কেউ হাসতে পারে তা ভাবতেও পারি না।

হাসছ কেন ?

সে মজার কথা। পালিয়ে এসেছিলাম সামাদের কাছ থেকে। আসবার সময় সামাদকে নিশ্চিন্ত করে এসেছিলাম, কিন্তু সামাদ আমাকে নিশ্চিন্ত হতে দেয়নি। সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম তার সন্তানকে। কলঙ্ক রয়ে গিয়েছিল গর্ভে। বুঝতে পেরেছিলাম বলেই আপনার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলাম। সামাদকে বিদায় করে এসেছিলাম, অ-জাত সন্তানকে বিদায় করতে পারিনি। পিতৃপরিচয়হীন কলঙ্ককে টেনে বেড়াবার মতো মেয়ে লতাহু নয়। প্রসব হতে এলাম হাসপাতালে। ছেলে হবার সময় জ্ঞান ছিল টনটনে। নার্সের সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগ নিতে মোটেই বিলম্ব করিনি। প্রস্তুত করে রেখেছিলাম মনকে। মায়া মমতা ভুলে যে কজার জোরে সামাদের মাথা দেহ থেকে আলাদা করেছিলাম, সেই কজার

একটি পেষণে থেমে গেল শিশুর স্পন্দন। একবার বোধহয় 'মা' ডাক শুনেছি, তারপর সব চুপচাপ।

চিৎকার করে উঠলাম, কি বলছ লতামু।

আস্তে কথা বলুন। এটা বাড়ি নয়, গাড়ি। হাঁ, এটাই সত্য। কলেজ থেকে ফিরে এসে তখনও হাত মুখ ধোওয়া হয়নি। দস্যুর দল ছুটে এসে আমার চোখের সামনে পিতা মাতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের কাছে দয়া মায়া কিছুই পাইনি। আমার বুকভাঙ্গা ক্রন্দন তাদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি। ওদের নিষ্ঠুরতা ক্ষমার অযোগ্য, তাই মার্জনা করতে পারিনি তাদের। ওদের সন্তানকে বাঁচতে দিতে পারি না। মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলাম। চোখে দেখে হয়ত অত নির্মম হতে পারতাম না। সামাদকে টুকরো করেছিলাম যত সহজে অত সহজে লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি পেতাম না নিশ্চয়ই। সারা জীবন অত্যাচারের কলঙ্কচিহ্ন বহন করতে পারব না বলেই সন্তানকে বিদায় দিয়েছি।

আমার মাথার মধ্যে চিন্-চিন্ করতে লাগল। গাড়ির জানালায় মাথা রেখে চুপকরে বসে রইলাম।

রাতের অন্ধকার ভেদ করে গাড়ি ছুটছে। ঠাণ্ডা মিঠে বাতাসে ঝিমিয়ে পড়েছিলাম। লতামুর ডাকে মুখ তুলে বসলাম।

লতামুকে জানবার প্রথম পদক্ষেপেই মুষড়ে গেলেন দেখছি।

মুষড়ে যাইনি।

ভয় পেয়েছেন।

না।

তবে ?

এতকাল শুনে এসেছি, নারী দয়াময়ী মমতার উজ্জ্বল প্রতীক। আমার সেই বিশ্বাস যেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

লতামু হো-হো করে হেসে উঠল !

হাসি থামল। বলল, দয়া মায়া মমতা সবলের ধর্ম। নারী দুর্বল, তার প্রয়োজন আত্মরক্ষা। অবলম্বনহীন নারী যদি দয়া মায়া মমতার বেসাতি করে তা হলে তাকে নর্দমায় নেমে যেতে হবে। তা আমি হতে দেইনি। নর্দমায় নামতে পারিনি, পারবও না।

চুপ করে বসে রইলাম।

কি ভাবছেন ?

ভাবছি কোথায় যাব ?

রাণাঘাটে।

তারপর ?

সেখানে গিয়ে ঠিক করব।

কিন্তু চলবে কি করে ?

সে দায় আমার।

হেসে বললাম, পুরুষ যে দায় বহন করতে পারে না, সে দায় তুমি বহন করতে পারবে কি।

ভরসা হচ্ছে না ?

বলতে পারি না।

যে লতান্ন সামাদকে খুন করতে পারে, সামাদের সন্তানকে গলা টিপে মারতে পারে তাকে বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন। কিন্তু লতান্ন মিথ্যা কথা বলে না।

আবেগহীনভাবে বললাম, বেশ। আত্মসমর্পন করলাম।

গাড়ি এসে দাঁড়াল রাণাঘাটে।

তখনও অনেক রাত।

নেমে পড়লাম।

প্লাটফরমের কোনায় আশ্রয় করে নিলাম।

লাইটপোষ্টের একদিকে পিঠ দিয়ে বসল লতান্ন অপরেক দিকে পিঠ দিয়ে বসলাম আমি। অচিরেই ঘুমে চোখ ভেঙ্গে আসল।

লতান্নর ধাকায় ঘুম ভেঙ্গে গেল।

ভাল হয়ে বসবার আগেই লতান্ন জিজ্ঞাসা করল, আমাদের পরিচয় কি হবে?

সে কথা তো ভাবিনি।

এখন ভাবুন।

কি বলব বলতো ?

তাও আমাকে বলে দিতে হবে। একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে। পারবেন কি সমর্থন করতে ?

আগে বল।

বলছি। আমি ভৈরবীর ভেক নেব, আপনি নেবেন ভৈরবের।

মন্দ নয়। তারপর ?

দুজনে ভৈরবী-ভৈরব সেজে বেরিয়ে পড়ব। জন্ম থেকে শুনেছি আমি অপয়া। আমার জন্মের ক'দিন পরে আমার এক বড় ভাই ছিল সে হঠাৎ গাড়ি চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল। সেই থেকে আমি ছিলাম মায়ের চক্ষুশূল।

তার পর ?

যেখানে গেছি সেখানেই সর্বনাশ উপস্থিত হয়েছে। আপনার সর্বনাশ ষোল কলায় পূর্ণ হয়েছে। এবার পথের সুখ দুঃখ সমানে ভাগ করে নিয়ে চলব। এইটুকুই হবে ক্ষতিপূরণ।

আমার সর্বনাশের সাথে তোমার কি সম্বন্ধ আছে।

আমার সাথে দেখা না হলে বাচ্চা হয়ত মরত না, হয়ত বা বউদি পাগল হয়ে যেত না।

লতায় বলতে বলতে ফুঁপিয়ে উঠল।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বললাম, নিজের হাতে মানুষ মেরেছ, নিজের সন্তানকে গলাসবো করে মরেছ অথচ পরের সন্তানের জন্য কাঁদছ। কি আশ্চর্য।

সন্তর্পণে আচল দিয়ে চোখ মুছে লতায় ধীরে ধীরে বলল, আপনার কথাতেই তো এর উত্তর রয়েছে। একই মানুষ দুটি পরিবেশে দুটি অভিনেতা।

আরও একটু অভিনয় করতে চাও বুঝি ? তবে ভৈরব-ভৈরবীর অভিনয় জমবে ভালো। তুমি নিশ্চয়ই গান গাইতে জানো।

জানতাম। এখন পারব কিনা জানিনা। আপনি জানেন ?

তোমার মতো আমিও বলছি, জানতাম, এখন জানি কিনা জানিনা।

তাহলে অভিনয়টা মন্দ হবে না। কিন্তু,

কিন্তু কেন ?

এই কি শেষ ?

বললাম, শেষ নয় আরম্ভ এবং আরম্ভের প্রথম পর্যায়। একদিন ক্লান্তি আসবে সেদিন ভুলে যাব আমাদের চলবার উদ্দেশ্য। এমন দিন যখন আসবে তখন পরিপূর্ণ ভাবে পরস্পরকে জানতে পারব। সেদিন হবে

আমাদের আরম্ভের দ্বিতীয় পর্যায়। শেষ যেদিন আসবে, সেদিন পরমায়ু হয়ত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হবে।

তুমি যেন দার্শনিক তথ্য জাহির করলে।

যারা দর্শন করতে জানে তারাই দার্শনিক হয়। দর্শন করবার ক্ষমতা আপনার কি কম আছে ?

মোটেই নেই। সকাল হয়ে এসেছে। এবার ওঠ, মুখ ধুয়ে একটু গরম জলের সন্ধান করে আসি।

লতাহু উঠল। উঠতে উঠতে বলল, দেখছেন যাবার লোক নেই। আসবার লোকই সব। এই মানুষের ভীড়ে বউদিকে খুঁজে পাবেন কি ?

তাইতো এতো ভাবনা। তবুও খুঁজতে হবে। ভালবাসার চেয়ে নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে সবচেয়ে বেশি। সহচরী না হলেও সহধর্মিনী।

লতাহু হাসল।

হাসছ কেন ?

হাসপাতালে আমি একা ছিলাম না। সাথে ছিল আরও অনেক রুগী। তাদের মধ্যে রমার সাথে ভাব জমেছিল খুব। বড়ই ভাল মেয়ে রমা। যেদিন সে হাসপাতাল থেকে খালাস পেল সেদিন তার কান্না দেখে আমিও কেঁদে ফেলেছিলাম।

তাতো বুঝলাম, কিন্তু কাঁদল কেন ?

তার নৈতিক দায়িত্ব নেবার লোক ছিল না বলে। গরীব বাপ মায়ের অনেক সন্তান যদি হয় তাতে সে সন্তানের দল যথার্থ শিক্ষা পায় না, আহার্য পায় না, পায় না প্রয়োজন মত আশ্রয়। তাই ঘটেছিল রমার কপালে। যেদিন রমাকে হাসপাতালে ভর্তি করল সেদিন আমার এখনও মনে আছে। ডাক্তার নার্স মিলে কি চেষ্টা করছিল তাকে বাঁচাতে। গলার ভেতর নল দিয়ে পাকস্থলী ধুয়ে দিচ্ছিল অনবরত। পরের দিন রমার জ্ঞান হল। চোখ মেলে তাকালো।

তারপর ?

তারপর অনেক ঘটনা। বাঁচাটাই তার বিড়ম্বনা। বোধহয় মৃত্যুই ছিল তার একমাত্র আশ্রয়। পুলিশ এল। জিজ্ঞেস করল, আর্সেনিক কেন খেয়েছিলেন ?

রমা বলল, জানিনা।

পুলিশের হাতে পড়লে কি অবস্থা হয় তাতো জানেন? রমা ধীরে ধীরে যা বলল, তার অর্থ, সে শোবার আগে জল খেয়েছিল। জল খাবার পর তার মনে হল কি যেন ছিল জলের সাথে। স্বামীকে ডেকে বলল। স্বামী বলল, ও কিছু নয়।

তখন কি রমা জানত জলের সাথে আর্সেনিক মিশিয়ে দিয়েছিল তার ইহকাল পরকালের আশ্রয় স্বামী।

যখন তার স্বামী বুঝল রমার বাঁচার আশা নেই তখন য্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল আত্মহত্যার ঘটনা বলে। রমা যে বাঁচবে সে কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

রমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন আর্সেনিক খাইয়েছিল?

বলল, জানি না।

রমা বলতে চায়নি প্রথমে। পুলিশের কাছে বলেছিল, তার স্বামী যা অর্থ সম্পদ চেয়েছিল রমার বাবার কাছে তা সে পায় নি। তাই বিষ খাইয়ে হিসাব নিকাশ শেষ করতে চেয়েছিল।

স্বামীকে তখন পুলিশে আটক করেছে।

স্বামীর ঘরে যাবার পথ তখন বন্ধ। পিতার সামর্থ্য ছিল না কন্যাকে চির কালের জন্য আশ্রয় দেওয়া। সাময়িক ব্যবস্থা হয়ত কিছু হয়েছিল, কিন্তু রমা তাতে নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। অবলম্বনহীন জীবনের আশঙ্কায় সে কেঁদে ভাসিয়েছিল।

তাই বলছিলাম নৈতিক দায়িত্বটা অতি ছেঁদো কথা। সামান্য Trust রাখবার যাদের ক্ষমতা থাকে না তাদের পক্ষে নৈতিক দায়িত্ব পালন একটা অবাস্তব ঘটনা। একটি যুবক আর একটি যুবতীর যখন বিয়ে হয় তখন তাদের পরিচয় হয়ত মোটেই থাকেনা। উভয় পক্ষের পিতামাতা যখন তাদের একটি ঘরে আটক করে, তখন পরম নিশ্চিন্তে তাদের বাস করা সম্ভব হয় একটি মাত্র কারণে। তাদের সচেতন মনে থাকে পরস্পরের প্রতি প্রচণ্ড বিশ্বাস নইলে অপরিচিত যুবক যুবতী পাশাপাশি একই শয্যায় শুয়ে রাত কাটাতে পারত কি? সেই বিশ্বাসটুকু নষ্ট করে রমার স্বামী হয়ত দিব্য আনন্দে মানুষের সমাজে বাস করছে, অথচ রমার সমাজ তখন বিরূপ,

আশ্রয়হীন হবার আশঙ্কায় বমা কেঁদে ভাসিয়েছিল। তাই হাসছিলাম আপনার কথা শুনে।

আমি নীরব শ্রোতার মত পথ চলছিলাম। চলতে চলতে বললাম, শুধু পুরুষকে অপরাধী করছ কেন?

না, না, পুরুষ নয়। মেয়েরাও Trust রক্ষা করে না। সমভাবে সবাই দায়ী কিন্তু যারা Trust অথবা নৈতিক দায়িত্বের বড়াই করে তাদের জন্য দুঃখ হয়।

চলতে চলতে লতান্ন দাঁড়িয়ে গেল।

বনগাঁর মত তাঁবুর শহর। কিল-বিল্ল করছে মানুষের দল। নর্দমার কৃমিদের মতো একবার যাকে দেখা যাচ্ছে তাকে আর দ্বিতীয়বার চিনে বের করা যাচ্ছে না।

নিরাপদ দূরত্ব রেখে গাছতলায় এসে বসলাম।

লতান্নর মুখে ক্লান্তির ছাপ।

তবুও বলল, এবার বেশভূষা প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে নিন।

কিনতে বের হলাম। বেশভূষা, আচ্ছাদন আর গুপী যন্ত্র কিনে নিয়ে শহরের বাহিরে মাঠে এসে দাঁড়ালাম।

লতান্ন হেসে বলল, এখানেই শেষ রাতে বেশভূষা বদল করে বেরিয়ে পড়ব হাঁটা পথে। কেউ জানবেও না, চিনবেও না। মানুষের সমুদ্রে আমরা হারিয়ে যাব। কেমন।

২

যাত্রী সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। চলবার পথে চলেছি দুজনে নয়, বহুজনে। লাইন দিয়ে পিঁপড়ের মতো পিল-পিল করে মানুষ চলছে। অজানার যাত্রী। পোঁটলা-পুঁটলি, বাক্স-প্যাটরা, ঘটি-বাটি চলন্ত মানুষের সাথে চলছে।

শেষ রাতেই যাত্রা। বেশভূষা বদলিয়ে রওনা হবার আগে লতাম্বুকে বললাম, নিজের চেহারা নিজে দেখা যায় না, আয়নাতে মালুমও হবে না। বল দিকিনি, কেমন হয়েছে দেখতে।

মন্দ কি। গলায় তুলসীর মালা, বগলে গুপীযন্ত্র, কপালে তিলক, বুকে মহাপ্রভুর পায়ের ছাপ। কার ক্ষমতা আছে বলবার, এ মানুষ সেই মানুষ।

হেসে বললাম তুমিও কম যাওনি। নাকে রসকলি, গলায় তুলসীর মালা, হাতে খঞ্জনী, পরণে গেরুয়া, মনটা রাঙা রয়েছে কি?

কি যে বলেন।

একটা ভুল থেকে গেল। গানের রিহার্সেল না দিলে পথ চলা কঠিন হবে। গলায় গলায় মিলিয়ে না নিলে, গেরস্ত বাড়িতে যখন বলবে, ও বষ্টুমি একটু নাম শোনাও, তখন বিপদ বৃদ্ধি পাবে।

এখন কিন্তু গলা মেলাতে গেলে ঐ মানুষগুলো দাঁড়িয়ে যাবে।

চলো ঐ মাঠের আল ধরে অনেকদূরে কোন গাছতলায় বসে রিহার্সেল দিয়ে নেব।

সূর্য তখনও ওঠেনি। বলতে গেলে ঊষাকাল। দুজনে অনেকটা মাঠ পেরিয়ে এসে বসলাম গাছতলায়। পথ থেকে অনেক দূর, আরও দূরে গ্রাম।

খঞ্জনীতে আঘাত করল, লতাম্বু।

জিজ্ঞাসা করলাম, কে গাইবে ?

দুজনেই।

গুপীযন্ত্রটায় রজন দিয়ে নিলাম।

গাব-গুবা-গুব বেজে উঠল। লতাস্থর খঞ্জনী তালে তাল দিতে লাগল।

হঠাৎ খঞ্জনী থামিয়ে লতাস্থ বিরক্তির সাথে বলল, গান করুন।

গান। গুপীযন্ত্র থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বললাম, লেডিস ফাস্ট।

ল্যাডস-ই বা নয় কেন ?

নিয়ম বিরুদ্ধ হবে।

আবার বাদ্যযন্ত্র দুটো গলায় গলা মেলালো। গলা মেলানো হল না দুটি মানুষের। চোখের ইসারায় লতাস্থ আবার অনুরোধ জানালো।

অনভ্যস্ত একটা নতুন জীবনের সাথে খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না। বললাম, বোধহয় গান গাওয়া সম্ভব হবে না।

জোর দিয়ে লতাস্থ বলল, হবে।

বলেই সুর ভাঁজতে লাগল। অচিরেই হারিয়ে ফেলল নিজেকে. গেয়ে উঠল :

> আন্ধল প্রেম পহিল নহি জানলু সো বহু বল্লভ কান।
> আদর সাধি বাদ করি তা সঞে অহনিশি জনত পরান॥
> সজনি, তোহে কহুঁ মরমক দাহ॥

লতাস্থ গেয়ে চলেছে। বাজছে গুপীযন্ত্র, তাল দিচ্ছে খঞ্জনী। আমিও হারিয়ে ফেললাম নিজেকে। গলায় গলা মিলিয়ে গুণ গুণ করতে করতে গলা ছেড়ে দিলাম। কোকিলের সাথে বায়সের সমন্বয় হল কিনা কে বলতে পারে। শ্রোতার নিজস্ব শ্রবনপথ তখন রুদ্ধ।

যখন দুজনে সম্বিত ফিরে পেলাম তখন আচমকা ডাকলাম, লতাস্থ।

সদ্য নিদ্রোত্থিতের মত লতাস্থ জিজ্ঞাসুভাবে বলল, কিছু বলবেন।

এমন গান কোথায় শিখলে ?

লতাস্থ হাসল।

শ্রোতা নেই, নইলে···

নইলে কি?

তোমাকে এক পা-ও এগোতে দিত না।

দিত এবং দেবে। গান আর গায়ক-গায়িকা দুটোই আলাদা। যারা এক মনে করে তারা ঠকে বেশি। ঠকবার পর সান্ত্বনা থাকে না।

উঠে পড়লাম দুজনেই।

আবার ফিরে চললাম পথের দিকে।

অনেকটা পথ এসেছি। বেলা দশটা বোধহয় বেজে গেছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ এসে জমেছে আকাশের বুকে। হেমন্তের মেঘ মাঝে মাঝে সূর্যকে ঢেকে দিচ্ছে, লুকোচুরি খেলছে সূর্যিমামা। পাশের গ্রামটায় ভীড় জমেছে চলন্ত মানুষের। বড বড গাছের তলায় আখা জ্বালিয়েছে অনেকেই। পাশে নদী। বর্ষার ঘোলা জল গডিযে গেছে, জলের রঙ বদলেছে।

সঙ্গীরা বলল, ঘুর্ণী।

একজন বলল, উঁহু চুর্নী।

গঙ্গার গা কেটে পশ্চিম থেকে পূবে এগিয়ে গেছে। সোঁ সোঁ করে মাঝে মাঝেই বয়ে যায় বালির ঝড। মানুষের কালো মাথা সাদা বালিতে ঢাকা পডেছে।

চলতি মানুষ বলল, ওপারেই ইষ্টিশান। গাডির সময় হয়ে এসেছে।

জোরে পা ফেলতে থাকে লতানু।

পেছন থেকে ডাকল, ও বোষ্টুমী দিদি।

নতুন নাম। নামের সাথে পরিচয় ছিল না কোনদিনই। লতানু এগোয়। পেছনে ডাক শোনা যায় আবার। বয়স্কা একজন এসে দাঁড়াল লতানুর সামনে। জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবে বোষ্টুমী।

লতানু বাধা পেয়ে চমকে উঠেছিল। নিজের বেশভূষার দিকে চোখ ফেরাতেই বুঝল নতুন নামের পরিহাস।

বলল, প্রভুর চরণ দর্শন করতে।

একাই চলেছ, না বাবাজি রয়েছে?

লতানুর মুখখানা দেখা গেল না, তার কাঁপুনিটা চোখে পড়ল। অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারল না। অবশেষে মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিল।

বয়স্কা বলল, বাবাজি একটু হরিনাম শোনাও।

বললাম, এ নাম প্রভুর পায়ে পৌঁছে দেব।

মানুষের বুঝি শুনতে নেই।

প্রভুর পায়ে নিবেদন করে প্রসাদ বিতরণ করব। তার আগে নয়। যার নাম তাকে না শুনিয়ে মানুষকে শোনালে গানের মাহাত্ম্য রইবে না।

বয়স্কা নাক সিঁটকে বলল, দেমাক।

বললাম, তাও প্রভুর ইচ্ছা।

লতানু কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, বিনয়ের অবতার।

চূর্ণী ঘাটে স্টেশন।

গাড়ি এসে দাঁড়াতেই হুড়মুড় করে গাদা গাদা মানুষ উঠতে থাকে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। কেউ জিজ্ঞাসাও করে না, কোথায় যাবে গাড়ি।

লতানু বলল, চলুন।

কোথায়?

যেখানে যায়।

টিকিট?

ভিখিরির টিকিট দরকার হয় না।

তারপর শ্রীঘর বাস।

বিনা মেহনতে কয়েকদিন আহার্য সমস্যার সমাধান হবে অথচ নিরাপদ।

উঠবার ইচ্ছা না থাকলেও ভীড়ের ধাক্কায় উঠে পড়েছি গাড়িতে। গাড়ি সোজা না গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিল। জিজ্ঞাসা করলাম, গাড়ি কোথায় যাবে?

শান্তিপুর।

নবদ্বীপ নয়।

সেখানেও যেতে পারবে। নবদ্বীপে বুঝি আখড়া?

আখড়া। শব্দটা শুনেছি অনেকদিন, বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না। আমি তো আমার সাজের তলায় ঢেকে গেছি। সাজ আমার পরিচয়। লতানু বুঝল আমার মনের কথা। আমার দুর্দশা বুঝে সেই বলল, আখড়া খুঁজতে হবে, নইলে গড়তে হবে।

সন্ধ্যার আঁধার সবে জমে উঠেছে গাড়ি এসে দাঁড়াল স্টেশনে।

সোজা পিচের রাস্তা চলে গেছে শান্তিপুর শহরে। শান্তিপুরের বুক ছুঁয়ে

রাস্তা শেষ হয়েছে একেবারে গঙ্গার কিনারায। সন্ধ্যায় চাঁদ উঠল। রূপালী জ্যোৎস্না কালো পীচের উপর চিক চিক করছে।

আজ মুশাফিরখানায় রাত কাটাব, কেমন ?

মন্দ কি।

ওপাশের বেঞ্চটা খালি রয়েছে, চলো গিয়ে জায়গা করে নেই।

প্লাটফরমের শেষ কোনায কাঠের বেঞ্চে স্থান করে নিলাম। শীতটা যেন একটু বেশি। কম্বল জড়িযে শুযে পড়লাম। লতাসু বইল বসে।

ডাকলাম, লতাসু।

বলুন।

শান্তিপুব তীর্থস্থান।

সবার নয়।

অদ্বৈত মহাপ্রভুর আশ্রম রয়েছে এখানে।

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গও এখানে এসেছিলেন নিশ্চয়ই।

তাতো বটেই।

আজ কোন তিথি ?

ও জ্ঞান আমার নেই।

আকাশে চাঁদ উঠেছে, পূর্ণিমার আর দেরী নেই।

বোধহয়।

ছাড়া ছাড়া কথা বলছেন কেন ?

এই জীবনের সাথে খাপ খাওযাতে পারছি না।

অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চট্‌চট্‌ করে।

হয়ত তাই, তবুও মনে হচ্ছে নিষ্কৃতি পেলেই বাঁচি।

এখনও যে অনেক বাকি। কাল থেকেই সুরু হবে আসল জীবনযাত্রা কাল মহাপ্রভুর আঙ্গিনায় বসব হরিনাম করতে। সেই নামের সাথেই সুরু হবে আমাদের নতুন জীবন। সূচনা হবে চেনা মানুষকে খুঁজে বের করবার প্রয়াস।

বললাম, আমি পারব না।

কেন ?

শেফালির সন্ধানে বেরিয়েছি।

সে কাজের পথে কতদূর এগিয়েছেন।

মনে হচ্ছে, এক কদমও এগোতে পারিনি।

তবুও তো চলতে হবে। আমার আপনার জন্য সময় দাঁড়াবে না, দেহ রক্ষার প্রয়োজন শেষ হবে না। পেটটা তো রেখে আসেননি। আহার্য চাই।

তুমিই তো বলেছিলে ছয় বৎসরের সংস্থান আছে আর আমার আছে ছয় মাসের। সেই ছয় বছর ছমাসের ছয় দিনও পেরোয়নি।

জীবনটা যে আরও বড়। ছয় থেকে ছয়চল্লিশে পৌঁছাতে হবে। সঞ্চয়ে হাত দিতে নেই। পথ থেকে কুড়িয়ে যা পাব তাই হবে পাথেয় এবং জীবিকার সম্বল। তা নইলে খোঁজাও হবে না, দেহও চলবে না।

না হেসে পারলাম না। একটু চুপ করে থেকে বললাম, খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি ততক্ষণ ঐ মালগুদামের ছাউনিতে জায়গা করে নাও। ভীড় জমেছে খুবই, এরপর জায়গা পাবে না।

কম্বল রেখে উঠে বসলাম। থলে হাতে করে এগোতেই লতাহ্ন ডাকল, শুনুন।

দাঁড়ালাম।

পয়সা নিয়েছেন?

দরকার হবে না।

ক্ষুব্ধভাবে লতাহ্ন বলল, রাগ করলেন?

নাতো। যতক্ষণ আমার কাছে রয়েছে ততক্ষণ তোমার সঞ্চয়ে হাত দিতে হবে না।

এটা রাগের কথা।

হেসে বললাম, মোটেই না। আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, আমি চললাম।

অনেকটা পথ। জ্যোৎস্নার আলোতে এগোচ্ছি। ডান পাশে স্কুল বাড়িটা পেরিয়ে বাঁয়ে মোড় নিলাম। বাজার এসে গেছে। খুঁজে বের করলাম চিড়ে-মুড়ির দোকান।

সওদা খরিদ করে ফিরছি। তখনও রাস্তায় ভীড় কমেনি। পথের দুপাশের বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছে অনেকে। এত লোক এখানে কেন? সবাই বুঝি পূব থেকে পালিয়ে এসেছে আশ্রয়ের আশায়।

এগিয়ে চললাম।

ডান দিকে মোড় না ফিরে বাঁয়ে চললাম। রাস্তাটা নেমে গেছে গঙ্গার বুকে। কিনারায় এসে দাঁড়ালাম। জল সরে গেছে অনেক দূরে। ধু-ধু করছে বালির চর। মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে আছে বানে ভেসে আসা গাছ লতাগুল্ম। চাঁদের আলো এসে পড়েছে সাদা সবুজের মাথায়, যেন রূপার আস্তরণ। ঠাণ্ডা মিঠে বাতাস বেয়ে চলেছে। দূরে একটা তালগাছ আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। গরু গাড়ি চলার লিক্ পড়েছে নদীর শুকনো বুকে। নদী অসারে শুয়ে আছে। সৌন্দর্য হয়ত আছে কূলের, নদীর বুকে নয়। জেলেদের নৌকায় টিমটিমে আলো জোনাকির মত পিট্‌পিট্ করে তাকিয়ে আছে।

এই পথেই একদিন প্রভু গঙ্গা পেরিয়ে কালনায় গিয়েছিলেন। এই মাটির বুকে প্রভুর পায়ের ছাপ পড়েছে, মিলিয়ে গেছে কালের প্রবাহে, সামান্য চিহ্নও নেই। দূরে ডেকে উঠল একদল শেয়াল। চমকে উঠলাম। একদল বাদুড় মাথার ওপর দিয়ে পাখা ঝাপ্‌টাতে ঝাপ্‌টাতে উড়ে গেল। পরিত্যক্ত নির্জন নদী কিনারার শান্ত সৌম্য পরিবেশ যেন হা-হা করে ব্যঙ্গ-হাসি হাসল।

ফিরে দাঁড়লাম।

পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, অদ্বৈত প্রভুর মন্দিরের চূড়াটা বোধহয় দেখা যাচ্ছে। জ্যোৎস্নার পরশ লেগেছে, মাতিয়ে তুলেছে হিমেল হাওয়া।

কে যেন সামনে এসে দাঁড়াল।

জিজ্ঞাসা করল, কে ?

বললাম, গোঁসাই।

নদীর কিনারায় কেন ?

উত্তর না দিয়ে কাছে এগিয়ে এলাম।

নারী !

হো-হো করে হেসে উঠল।

প্রশ্ন করলাম, তুমি এখানে কেন ?

আবার হেসে উঠল, বাতাসে হাসির কম্পন। হাসির ধাক্কা ছুটে চলল বাতাসের রথে, প্রতিধ্বনি ফিরে এল।

হাসছ কেন?

তোমায় দেখে।

দেখবার মতো কি।

মোটেই নয়। প্রভুর রাস্তায় ভোগীর পা পড়েছে। শান্তিপুরের শান্তি পুড়েছে। সেদিন কি আর আছে! আহা, কেমন ছিল সে গোরা। দেখনি বুঝি? প্রভু আমার ছিল:

> একে সে চিকণ তনু কাঞ্চন অভরণ,
> কিরণহি ভুবন উজোর।
> দরশনে লোচন লোরে আগোরণ
> না চিহ্নলুঁ কাল কি গোব॥

আবার হো-হো করে হেসে উঠল সে। হাসির দমকে চমকে উঠলাম।

বলল, বুঝেছ।

হাঁ।

এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

ঘর আমার নেই।

ছিল তো। না থাকে ঘর গড়ে নাও। এ পথ তোমার পথ নয়।

ছুটে চলল নারী।

ছুটলাম পিছু পিছু। নদীর শুকনো বুকে থেমে গেল সে। মুখ ফিরিয়ে বলল, ছুটছো কেন?

তুমি ছুটছ কেন?

ভালবেসেছি তাই।

থমকে গেলাম। •কি বলতে চায়। পাগল না ভ্রষ্টা।

আবার বলল, ভালবেসেছি এই খোলা মাঠ, ভালবেসেছি সবুজ ঘাস, ভালবেসেছি প্রভুর পায়ের ছোঁয়া এই মাটি। তাই ছুটে বেড়াই আনন্দে।

আবার সেই হাসি। পাশের ঝোপ থেকে ছুটে পালাল, এক জোড়া শেয়াল। দূর থেকে ভেসে এল পেঁচার ডাক।

ধীরে ধীরে ফিরে এলাম।

রাস্তায় পা দিয়েছি। পেছনে পায়ের শব্দ। ফিরে তাকালাম।

যাচ্ছ?

হাঁ।

কোথায়।

স্টেশনে।

কে আছে সেখানে।

লতাহু।

সে আবার কে?

আমার সঙ্গী। পথের সাথী।

তুমি আমার আয়ান ঘোষ, সঙ্গী তোমার বাধা। উহুঁ তুমি কেষ্টঠাকুর লতাহু তোমার শ্রীমতী। তুমি কাহু গোঠে এসেছ। পূর্ণিমা সামনে, রাস পূর্ণিমা, রাখালরাজা আসবে। হাতিতে চেপে আসবে। দেখতে এস। একা এস না, সাথে শ্রীমতীকে নিয়ে এস। তোমার শ্রীমতী তোমার ঘর ছেড়ে রাখাল রাজার বাঁশী শুনবে।

জোরে পা ফেলতে থাকি।

চলছ?

হাঁ।

যাও, আবার হো-হো করে হাসির শব্দ।

না, সে আর নেই। অনেকদূরে থেকে গেছে। কোথায় আঁধারিয়া গলির রাস্তায় মিশিয়ে গেছে।

শীতের রাতে ঘেমে উঠেছি।

দেহের সব সামর্থ্য দিয়ে ছুটে চলেছি।

ফিরে এসে ধপাস করে সওদা নামালাম মালগুদামের ছাউনির নিচে।

তাকিয়ে দেখি লতাহুকে ঘিরে বসে আছে একদল মেয়ে পুরুষ। মুচকি হাসি তার মুখে। বলল, এত দেরী কেন গোঁসাই।

উত্তর খুঁজে পেলাম না।

এদের সাথে পরিচয় করে নাও। কাল রাস, রাসের মিছিল বেরুবে। রাধারাণী হাতিতে চড়ে রাইরাজার সাথে দেখা করতে যাবে। এদের সাথে রাসের মিছিলে যাব। এরাও তাই বলছে।

লতাহু 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' আরম্ভ করেছে বিনা ভূমিকায়। উদ্দেশ্যটা বুঝতে দেরী হল না।

হাতজোড় করে বললাম, জয় গুরু রাধে শ্যাম।

সাথে সাথে প্রত্যুত্তর পেলাম একই ভাষায়।

বললাম, প্রভুর ইচ্ছায় এদের দর্শন মহাপুণ্য।

লতাহু বলল, তা আর বলতে।

সমস্বরে বলল, এ ভাগ্য আমাদেরও।

লতাহু কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল, তাহলে সেবার ব্যবস্থা হোক।

যারা ঘিরে বসেছিল তারা গা মোড়া দিল। শীতের দিনে গরম হয়ে বসেছে, উঠতে ইচ্ছা হচ্ছে না। তাদেরও সেবার সময় হয়েছে। একপাশে এক বাবাজি কেবল গাঁজার কল্কেতে আগুন দিয়েছিল, আমার দিকে কল্কে সমেত হাত বাড়িয়ে বলল, সেবা হোক।

বিনীতভাবে বললাম, মাপ করুন।

ক্ষুন্ন হল বাবাজি।

সবাই উঠল, বাবাজিও উঠল।

কলাপাতায় চিড়ে গুড় ঢেলে দিয়ে বললাম, এদের জোটালে কি করে?

জোটাতে হয় না। আপনা থেকেই জোটে! ঐ যে মাথায় নামাবলী বাঁধা মোহান্ত, ঐ এল প্রথম। শাস্ত্র শোনাচ্ছিল। একলা মেয়ে মানুষ, তায় যুবতী, পরকীয়া শাস্ত্রটা ব্যাখা করছিল আদিরস দিয়ে।

তুমি কি বললে?

মুখে সব বলা যায় না। চোখ দিয়েও বলতে হয় মাঝে মাঝে। ঐটুকু ওদের প্রাপ্য, এর চেয়ে বেশি চাইতেও ওরা সাহস পায় না। দেহটাকে একটু দূরে সরিয়ে রাখতে হয়, ছোঁয়াছুঁয়ি হলে আর রক্ষে নেই। বাঁদরের জাত মাথায় উঠতে কতক্ষণ।

আর শুনবার ইচ্ছে ছিল না। উঠে জল আনতে গেলাম। জল এনে চিড়ে ভেজালাম। লতাহু আমাকে খেতে দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

তুমি খেলে না!

আপনার খাওয়া হোক।

এক সাথে আপত্তি কি?

এটা বৈষ্ণবের দেশ, আমরা হলাম বোষ্টম-বোষ্টমী। গোঁসাইয়ের সেবা না করে মাতাজী কখনও দানা কাটে না দাঁতে। এগুলো শিখে নিয়েছি ওদের কাছে। নইলে চোবালোক সন্দেহ করবে, ধরে ফেলবে।

খেয়ে দেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। লতাম্বু গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, এত তাড়াতাড়ি ঘুম কেন?

বড়ই ক্লান্ত।

দেবী কেন হল তাতো বললেন না।

ওটা একটা মজার কথা। একটা পাগলী রাস্তা আটকে ছিল।

পাগলী।

হাঁ।

বউদি নয় তো?

না।

ভাল করে দেখেছেন তো?

হাঁ।

কি বলল সে?

অনেক কথা। সব মনে নেই।

যা মনে আছে তাই বলুন।

বলল, প্রভুর রাস্তায় ভোগীর পা পড়েছে। শান্তিপুরের শান্তি পুড়েছে।

লতাম্বু থমকে গেল।

প্ল্যাটফরমের ওপাশটায় একদল মেয়ে পুরুষ জটলা করছিল। তাকিয়ে দেখলাম লতাম্বু অঘোরে ঘুমুচ্ছে। পা টিপে-টিপে খাম্বার কাছে গিয়ে হেলান দিয়ে বসলাম। ওরা ছিল নিজেদের আলোচনায় মত্ত, আমি এসে নীরবে যে ওদের কাছেই বসেছি তা কেউ লক্ষ্য করল না। ফিকে জ্যোৎস্নায় লোক চেনা যাচ্ছিল না। বিকাল বেলায় ওদের দেখেছি বলে মনে হল না। মনে হল নবাগত ওরা।

সবতো মিটল, এবার শোবার ব্যবস্থা দেখ। বলল ওদের একজন। কণ্ঠস্বরে মনে হল নারী। ভাল করে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। এত রাত অবধি ওরা না শুয়ে কিসের আলোচনা করছিল তা জানবার প্রবল আকাঙ্খা জাগল মনে। আকাঙ্খা নিবৃত্তির কোন আশা নেই বলেই মনে

হল। কম্বল পেতে ওরা শুয়ে পড়ল। রইল বাকি দুই। দুইজনই মহিলা। যারা বিছানায় গা এলিয়ে দিল তাদের দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম, পাশাপাশি যারা শুয়ে আছে তাদের বেজোড়া সংখ্যা মহিলা। স্বামী-স্ত্রীর ভঙ্গীতেই যেন ওরা শুয়েছে।

সবাই যখন ঘুমের আরাধনায় ব্যস্ত মহিলা দুটো উঠে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। ওরা যে আমাকে লক্ষ্য করেছে তা জানতাম না। এসেই একজন বলল, কি গোঁসাই এই শীতে গা গরম করতে পারছনা বুঝি।

উত্তর দিতে পারলাম না এই লজ্জাহীন প্রশ্নের।

কথা কইছ না কেন গো? গলার শব্দ স্পষ্ট না হলেও বক্তব্যটা বেশ স্পষ্ট।

কথা বলতে বাধ্য হলাম, বললাম, তোমরা কোথা থেকে আসছ?

ঘোষপাড়া থেকে আসছি।

ঘোষপাড়া।

তুমি বুঝি ঘোষপাড়া চেন না? 'গুরু সত্যের' দেশ,—কাঁচড়াপাড়া থেকে পাঁচমাইল যেতে হয়।

বললাম, ওঃ। যাবে কোথায়?

গুরু যেখানে নিয়ে যায়।

তোমাদের সাথে গুরু বুঝি আছেন?

তাও বুঝি জানো না, গুরু আমাদের সত্য। গুরু বিনা আমাদের এক পা নড়বার নিয়ম নেই। জানো না বুঝি আউলচাঁদের শিষ্য আমরা। যাকে লোকে বলে কর্তাভজা সম্প্রদায় আমরা তাই।

মহিলা দুজন বসল আমার পাশে। দুজনের চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। যার সঙ্গে কথা বলছিলাম, তার আনুমানিক বয়স চল্লিশের কম নয়। দেহ স্থূল, মেদভারে থপথপে চেহারা, কৃষ্ণাঙ্গী, নাকে রসকলি, অলঙ্কার বর্জিত দেহ। হাতে একগাছা করে সোনার চুড়ি। অপর জনের বয়সও কম নয়। তবে যুবতী বলা যায়। দেহের ওজন প্রথম জনের মতোই। রসকলিও আছে আর আছে অলঙ্কারের পারিপাট্য, দেহের রঙে ঠিক কৃষ্ণাঙ্গী নয়।

যে কম্বলখানায় বসেছিলাম সেটাই বিছিয়ে দিলাম ওদের বসতে।

দুজনেই হাত-পা মেলে বসল। কৃষ্ণাঙ্গী অপরজনকে ডেকে বলল, আমি একটু গড়িয়ে নেই, তুই গোঁসাইয়ের সাথে গল্প কর বিমলা।

বিমলা এতক্ষণ কথা বলেনি। এবার তার বাক্যসুধা শ্রবন করবার সৌভাগ্য হল। বলল, নিমাইয়ের কাছে দুটো কাঁথা আছে, একটা নিয়ে আয়। গরম হয়ে শুতে পারবি। কৃষ্ণাঙ্গী ওঠে গিয়ে পার্শ্ববর্তী একজনের গা থেকে একখানা কাঁথা নিয়ে এসে আপাদমস্তক কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। তাকে শোবার জায়গা করে দিতে বিমলা সরে এসে বসল আমার পাশে।

বিমলা বলল, আজ একটু শীত যেন বেশী।

বললাম, বোধহয়।

তুমি শোবে না গোঁসাই।

জায়গা কোথায় ?

হরিমতী-ই জায়গা জুড়ে শুয়েছে। চল আমার কম্বল রয়েছে দুখান। ওদিকে কোথাও জায়গা করে শোবে চল।

বললাম, না।

বিমলা হকচকিয়ে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, তুমি আবার কেমন গোঁসাই। মেয়েদের মনের কথা বুঝতে যদি না পার তা হলে ঘর ছেড়েছ কেন ?

বুঝতে পারি বলেই তো ঘর ছেড়েছি।

বিমলা চুপ করে গেল।

হরিমতীর নাসিকা ধ্বনি শোনা গেল।

চুপ করে বসেছিলাম। বিমলা জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবে গোঁসাই।

ঠিক বলতে পারি না। তোমরা কোথায় যাবে ?

রাসের উৎসব দেখে নবদ্বীপ যাব, সেখান থেকে ফিরব ঘোষপাড়ায়। দোলের উৎসব হবার আগেই ঘোষপাড়ায় ফিরতে হবে। সেখানে সতীমার দোল হবে, লাখ লাখ মানুষ আসবে। সতীমার মন্দিরে উৎসব হবে। সে সময় আখড়ায় ফিরতেই হবে।

বিমলা থেমে গেল। আমি আর প্রশ্ন না করে চুপ করেই রইলাম।

রাত বোধহয় দুটো বাজে। জিজ্ঞাসা করল বিমলা।

বললাম, তা হবে।

ঘোষপাড়ায় কখনও যাওনি। যেও একবার। গেলে আমাদের আখড়ায় যেও।

বললাম, হুঁ।

হুঁ নয়, যেও। আমাদের ওখানে জীবন্ত দেবতা হল গুরু। গুরুর কৃপায় মুক্তি পাবে।

গুরু তো তোমাদের সাথেই আছেন। কৃপাটুকু এখানে পাওয়া যায় না।

জোড় না হলে গুরুর কৃপা কেউ পায় না। সেবা করবে তোমার জোড়, মুক্তি হবে তোমার আর তোমার সঙ্গী জো'ড়ের।

বিমলার কথা শুনে আতঙ্কিত হলাম।

বিমলা থামল না, আবার বলল, আমাদের গুরুর কথা বুঝি জানো না। আমাদের আদি গুরু আউলচাঁদ। গুরু আমাদের বসুন্ধরার পুত্র। মহাদেব বারুইয়ের পানের বরোজে পূর্ণ চন্দ্রের মত উদিত হয়েছিলেন গুরু। মহাদেব তার নাম রেখেছিল পূর্ণচন্দ্র।

বিমলার কথায় মোহ সৃষ্টি হল। অজান্তেই বললাম, তারপর?

পূর্ণচন্দ্র গেলেন ফুলিয়া। লেখাপড়া শিখলেন, বলরাম দাসের কাছে দীক্ষা নিলেন। দীক্ষার পর তাঁর নাম হল আউলচাঁদ। আমাদের গুরু শিখিয়ে গেলেন, ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, গুরু তার প্রতিনিধি। গুরুকে তোষণ, ভজন, পূজন ও সেবা করলে এই কালের সর্ব দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

এও কি সম্ভব?

কেন নয়। সিঁড়ি দিয়েই তো ছাদে উঠতে হয়। গুরু হল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাবার সিঁড়ি।

বললাম, তখন হেলিকেপটার সৃষ্টি হয়নি।

ঠাট্টা করছ গোঁসাই। ঠাট্টা নয়। গুরুর আজ্ঞা, মদ্য মাংস গ্রহণ পাপ। গুরুর আজ্ঞা, শুক্রবারে উপবাস, গুরুর আজ্ঞা, শুক্রবারে নামকীর্তন। কাল শুক্রবার, কাল আমাদের উপোস আর নামকীর্তনের দিন।

তোমার কথা শুনে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে ঘোষপাড়ায়। কখনও সময় পাব কিনা কে জানে।

ঘোষপাড়ায় বড় উৎসব সতীমার দোল, সেই সময় যেও।

সতীমা কি আউলচাঁদের স্ত্রী ?

দূর্! আউলচাঁদের কোন স্ত্রী ছিল না, আউলচাঁদের ছিল বাইশজন শিষ্য। নামডাকের শিষ্য হল রামশরণ পাল। গুরু রামশরণের সহধর্মিনী ছিলেন পরম ধার্মিক। এই রামশরণের সহধর্মিনীকেই সতীমা বলেন সবাই।

বললাম, ওঃ।

তুমি যেন তাচ্ছিল্য করছ গোঁসাই। গুরু রামশরণের ঘরে আউলচাঁদ আবার এসে জন্ম নেন রামদুলাল নাম নিয়ে। সতীমার মৃত্যুর পর আউলচাঁদ তাকে পুনর্জীবন দান করেছিলেন। জান তো পতি জায়ার দেহে প্রবেশ করে, নতুন রূপে পতি সন্তান রূপে জন্ম নেয়। তার ঘরে গুরুর জন্ম সে ভাবেই হয়েছিল। তুমি যেও, সব কিছু তোমাকে দেখাব। হিমসাগর দিঘীতে স্নান করে এস, দেখবে সব রোগযন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেয়েছ। ডালিমতলায় সতীমার সমাধির মাটি কপালে তিলক দিও, দিব্যদৃষ্টি পাবে। আমাদের আখড়ায় জপ করি :

মা তো মা সতীমা, সত্যকারের মা।
সন্তান অসত্য হলেও সেও পায় ক্ষমা।

ভীতভাবে বললাম, পরকীয়াটা কি ভাল ?

পরকীয়া, সহজিয়া, কর্তাভজা—ভাল মন্দ তুমি বুঝবে না গোঁসাই। যারা পার্থিব দেহটাকে বড মনে করে তারা মোক্ষলাভ করে না, তারা বোঝে না নামের মহিমা। তুমি যাকে পরকীয়া বলছ, এতো তা নয়, পরস্পরকে আপন করে নেওয়া। আপন করে নিতে হলে, দেহটার চেয়ে বড যে মনটা সেটা পবিত্র আছে কিনা তাই দেখতে হয়।

যদি সন্তান হয়।

দূর পাগল। বিমলার মুখখানা দেখতে পেলাম না। বুঝলাম, বিমলা যেন বলতে চায় তার সন্তান না হওয়াবার দীক্ষা সে পেয়েছে।

বিমলা আবার বলল, আউলচাঁদের মন্দির যদি দেখতে তা হলে ভক্তি আপনা থেকেই মনে জাগত। তুমিও গাইতে শুরু করতে :

গুরু সার, গুরু ধর্ম, গুরু কর্ম, গুরু মুক্তির পথ
ঈশ্বরের বান্দা গুরু, গুরুর নামেতে যাবি দুনিয়ার পার।
গুরু কৃপা, গুরু কৃপা, গুরু কৃপা, এই মন্ত্র ধর
মনে প্রাণে বল তুই গুরুর চরণ সার।

বুঝলে গোঁসাই :

গৌর ছিল নদেয়, আর ছিল আউল
আর সব ফুটফাট যতো দেখ বাউল।

বিমলাকে বাধা দিলাম না তবুও বিমলা কি যেন বলতে গিয়ে চুপ করে গেল।

বললাম, তোমাদের ট্রেনিং স্কুল আছে বুঝি।

মানে।

ভাবছি এত জানলে কি করে। ঘোষপাড়ায় না গিয়েও মনে হচ্ছে ঘোষপাড়াকে দেখতে পাচ্ছি। সতীমায়ের কথা শুনেই আমার মনে পরিবর্তন ঘটছে। বুঝলে বোষ্টুমি দিদি, সহজিয়া যা বলছ তা আমি বুঝিনা। আর বুঝি না জ্যান্ত মানুষ অথবা মরা মানুষকে দেবতা বলে কি করে পূজা করা যায়।

কি বলছ গোঁসাই।

ঠিক বলছি, তুমিও বুঝছ। তোমার গায়ের গয়না তাদের বেলায় চকচক করছে আর হরিমতীর তামার পাতের চুড়ি কেউ দেখতে পায় না, এর কারণ কি বলত!

বিমলার মুখ দেখতে পেলাম। মনে হল ক্রুদ্ধ হয়েছে। হঠাৎ ফেটে পড়বার উপক্রম। ঘটল কিন্তু উল্টোটা। বলল, এর মেয়াদ আর কত দিন। বয়স বাড়লে ওগুলোই বিক্রি করে খেতে হবে।

হরিমতী হঠাৎ ঘুমের ঘোরে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করল, কিছু হল রে বিমলি?

হাঁ, হয়েছে।

হরিমতী চোখ ডলতে ডলতে আমার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল। বলল, বিমলিকে ভাল লাগল গোঁসাই।

বললাম, মন্দ-ই বা লাগবে কেন।

ঠিক বলেছ। এই কারনেই তো বিমলিকে কত ভালবাসি।

হরিমতী বিমলাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, চল, শুবি চল।

দুজনেই উঠে দাঁড়াল।

বললাম, এই ভাবে সারা রাত শিকার ধরে বেড়ানই বুঝি তোমাদের কাজ।

ধরি না, আপনা থেকে জালে এসে গা ঘসে।

কেউ আবার ছুটেও তো পালায়।

আজও এমন হয়নি।

কথার পিঠে আর কথা বললাম না। ওরা উঠে গেল।

রাত শেষ হয়ে এসেছে।

ওপাশ থেকে উঠে এসে লতামুর কাছে এসে বসলাম। লতামু তখন ঘুমে অচৈতন্য।

আমিও ঘুমোবার লোভ সামলাতে পারছিলাম না। চোখ দুটো আপনা থেকেই যেন ভেঙ্গে আসছিল। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে যেন দেখলাম, আউলচাঁদ বলছেন, ওরা আমার নাম নিয়ে পাপ করে বেড়ায়, ওদের সাত জন্মেও নিষ্কৃতি নেই। সহজীয়া পরকীয়া নয়, সহজীয়া সহজ পথে মুক্তির নির্দেশ দেয়, মুক্তির পথ দেখায়। যারা তা করে না, তারা সহজীয়ার নাম নিয়েই অধর্মচারণ করে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। সকাল না হতেই ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিল।

এই শীতে ঘুমোচ্ছেন কি করে ?

শীতের চেয়ে ঘুমের শক্তি বেশি।

বেশিতো বেশি। এবার উঠুন, হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে চলুন শহরে যাই।

লতামু বর্তমানে গাইড এবং গার্ডিয়ান অতএব তার কথা শিরোধার্য।

শহরের দিক পা বাড়ালাম।

লতাহুও উৎসাহের সাথে চলল।

চলতে চলতে অদ্বৈত মহাপ্রভুর চাতালে এসে থামলাম।

চেয়ে দেখলাম চারিদিকে পুরাতনের চেয়ে নতুনের ছাপ বেশি। ভক্তদের দানে তৈরী হয়েছে নতুন আঙ্গিনা। পুরাতনকে নতুন পোষাক পরিয়েও মানাচ্ছে না।

তখনও ভীড় জমেনি আঙ্গিনায়।

লতাহু চুপি চুপি বলল, ঐ জায়গাটায় চলুন। গুপীযন্ত্রে বজন দিন।

সুবোধ বালকের মত তার আদেশ পালন করে গুপীযন্ত্রে বজন দিয়ে তারে টোকা দিলাম। যন্ত্র বেজে উঠল গাব গুবা-গুব। সবার দৃষ্টি এসে পড়ল আমাদের দিকে। মুখগুলো দেখে নিলাম। চেনা কেউ নেই। সব অচেনা। সব অচেনা, নিশ্চিন্ত হলাম, বুকে জোর পেলাম।

লতাহুর খঞ্জনী তালে তাল দিল। গুণগুনিয়ে উঠল সে। তারপর উঠল পদ আরাধনার সুর। লতাহুর গলা চিরে বের হল গান:

কি কব দুঃখের কথা
কহিতে মরম ব্যাথা
না দেখি বিদরে মোর হিয়া॥

আমিও গলা মিসিয়ে দিলাম। গানের সুরের সাথে কোথায় যেন ভেসে গেছি আমরা। ভীড় জমে গেছে ততক্ষণ।

গান থামল, থামল খঞ্জনী, থামল গাব গুবা-গুব। দুটো একটা করে পয়সা এসে পড়তে লাগল লতাহুর আঁচলে।

মোহান্ত নেমে এল মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে।

জিজ্ঞাসা করল, কোথা থেকে এসেছ গো?

পূব থেকে।

ওঃ, তোমরা পূবিয়া কিন্তু গলাতো ভারী মিষ্টি। এমন গলায় নামগান শুনিনি অনেক কাল। বড়ই মিঠে লেগেছে তোমার গলা। আজ সেবা নিও এখানে। আবার নাম শুনিও। কেমন?

লতাহু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বলল, ভোজনের ব্যবস্থা হল, এবার নগদ কড়ি কুড়িয়ে নিন।

নতুন করে বুঝলাম পথি নারী মোটেই বিবর্জ্জিতা নয়। বরং উপযুক্ত হলে নারী পথি পুরুষকে বৈতরণী পার করবার একমাত্র পুরোহিত। সারাদিন ঘুরে ঘুরে শহর দেখা শেষ করলাম। শুধু হাতে নয়। লতাসু যেন একাই একশত। বড বাড়ির দোরে দাঁড়িযে 'জয় মহাপ্রভু' বলে খঞ্জনীতে আঘাত দেয়, সে-ই গলা ছেড়ে দেয পদাবলীতে। শূন্য হাত পূর্ণ হয় সারাদিনে।

বিকেল বেলায রাসের মিছিল।

রাস্তায লোক গিস্ গিস্ করছে। দূর-দূরান্ত থেকে নরনারী এসেছে রাসের মিছিলে রাখালরাজা আর শ্রীমতীকে দেখতে। কেউ এসেছে পায়ে হেঁটে, কেউ এসেছে নদী পেরিয়ে, কেউ এসেছে গরুর গাড়িতে। হাতিতে আসছেন শ্রীমতী। গোঁসাই বাড়ির কোন এক কিশোরী সেজেছেন শ্রীরাধা। আগে আগে তুলকি চালে হাওদা চেপে চলেছেন শ্রীরাধা। পেছনে আসছেন রাখালরাজা। মৈত্রবাড়ির কোন এক কিশোরী রাখালরাজা সেজে মান ভঞ্জন করতে আসছেন পেছনে। তিনিও হাতির সোয়ার, দুলতে দুলতে আসছেন। মিছিলে সারি বেঁধে আসছে আশাসোটা হাতে নানা পোষাক পরে নানা মানুষ, জরির সাজ, আলোর ঝিলিকে ঝলমল করছে।

মানিনী রাধা চলেছেন। মান ভাঙ্গতে চলেছেন রাখালরাজা। যুগ যুগান্ত থেকে এই উৎসব হয়ে আসছে শান্তিপুরে। ভক্তরা খোল করতাল নিয়ে হরিনাম করতে করতে এগিয়ে চলেছে। মানুষকে দেবতার সাজে সাজিয়ে যে পরিতৃপ্তি সেই পরিতৃপ্তির পরিমাপ দুষ্কর। মানুষ যেন পাগল হয়ে উঠেছে উৎসবের আনন্দে, দুহাতে আনন্দসুধা নিঙড়ে নিয়ে যেন পান করতে চাইছে।

অবাক হয়ে দেখছিলাম।

লতাসুও পাশে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছিল। চুপিচুপি বলল, যবন হরিদাস বৈষ্ণব হয়েছিলেন কেন, জানেন?

ভক্তিতে।

বোধহয় তা নয়। গান শুনে, প্রভুর নামগান। গানের কণ্ঠ, বাদ্যের

ব্যঞ্জনা-মূর্ছনা মোহ সৃষ্টি করে। মানুষকে তার পার্থিব সুখ দুঃখের বাইরে টেনে নিয়ে যায়। এই গান-ই হরিদাসকে যবনত্ব ত্যাগ করিয়েছিল।

লতাসুর যুক্তি অস্বীকার করতে পারলাম না। এই রাসের উৎসবে যে গান গেয়ে চলেছে ভক্তের দল তাতে বাহ্য জ্ঞান হারানো স্বাভাবিক।

রাত অনেক হল। এবার আস্তানা খুঁজে নেই চলো।

কোথায় যাবেন ঠিক কবেছেন।

অদ্বৈত মহাপ্রভুর আঙিনায়।

সেখানে ভীষণ ভীড।

ভীডেব মাঝেই নিজেকে ভাসিয়ে দিতে চাই। নির্জনতায় নিজেদের হারিয়ে ফেলতে চাই না।

এলাম মন্দিরে। রাতের শেতল হয়ে গেছে। মন্দিরেব দরজা বন্ধ। আঙ্গিনার কোনায় খোলা জায়গায় টিনেব ছাউনি। সেখানেই কম্বল পেতে নিলাম। শুয়ে পড়লাম দুজনেই। জনসমাগম আর হট্টগোলে ঘুম আসছিল না। চোখ বুঁজেই ছিলাম।

রাত বাড়ছে।

হট্টগোল কমছে।

কে যেন ডাকল, বৈষ্ণবী।

লতাসু আলস্যজডিত কণ্ঠে বলল, কেন।

ছোট মোহান্ত তোমায় ডাকছে।

এত রাতে ?

তোমাকে বড ভাল লেগেছে, দুটো গান শুনতে চায়।

আজ শরীর ভাল নেই কাল শোনাবো।

ফিরে গেল লোকটা।

গাছের আড়ালে চাঁদ ঢেকেছে। ছাউনিটায় আবছা আঁধার।

জিজ্ঞাসা করলাম ফিস্ ফিস্ করে, ব্যাপার কি ?

বয়সের রোগ ধরেছে।

লতাসু ফিক ফিক করে হেসে উঠল।

হাসছ যে বড়।

এদের জন্য বড়ই কষ্ট হয়। এরাই প্রভুর সেবায়েত? যুবতী মেয়ে এদের নজরে ভোগের সামগ্রী। চুপ, কে আসছে।

আবেকজন এসে বসল মাথার কাছে। বোধহয় নজর করছিল আমার দিকে। ঘুমন্ত মনে করে ফিস্ ফিস্ করে ডাকল, বোষ্টুমী।

কেন?

জেগে আছ দেখছি।

তাতে তোমার কি?

তাই বলছিলাম। সকালে তুমিই না গান গেয়েছিলে।

গান নয়, নাম।

ঐ একই কথা একটা নাম শোনাবে।

এত রাতে।

হলইবা রাত। চল, গঙ্গার ধারে বসে বসে গাইবে, আমিও গাইব।

তোমাব রস আছে দেখছি।

চুপ করে গেল লোকটা। লতাসুব জবাবটা বড়ই শক্ত। সে লোকটাও কিন্তু পেছপা হবার মতো নয়।

রাস্তায় রাস্তায় কেন বেড়াবে। আমার বাড়িতে চলো।

আমার ভাগ্যি। কিন্তু কেন?

সুখে থাকবে। তোমার বাবাজি খেতে দিতে পারে না। আমার দোতলা বাড়ি, বাড়িতে কেউ নেই। আমি আর তুমি থাকব। তুমি নাম শোনাবে। রাণীর হালে থাকবে।

একটু আগে আরেকজন এসেছিল।

আমিই পাঠিয়েছিলাম।

তুমি ছোট মোহান্ত?

ছোট বড় সব সমান। বলতে ভুল করেছে, আমি মোহান্ত নই। এ হল প্রভুর দেশ। প্রভুর মাটিতে প্রভুই শীর্ষ। ছোট বড় নেই।

থামো, বলেই লতাসু উঠে বসল। বলল, প্রভুর নাম করে মেয়ে মানুষকে লোভ দেখাতে নেই। নিজের রাস্তা দেখ। মেয়ে মানুষ অতো সস্তা নয়। ও গোঁসাই, চলো চলো, এখানে আর থেকে কাজ নেই।

আমি উঠে বসতেই লোকটি গা ঢাকা দিল।

লতায় বলল, শুয়ে পড়ুন আর আসবে না।

যদি আসে।

আশ্চর্য নয়, ওদের লজ্জা একটু কম। তবে মনে হচ্ছে আসবে না। মুখ মেপে জুতো পড়েছে।

ঘুম আর হল না। লতায় বেঘোরে ঘুমোচ্ছিল। শীতের আমেজ নেমেছে। লতায় ক্রমে কুঁকড়ে যাচ্ছে। গায়ের কম্বলটার আধখানা বিছিয়ে দিলাম তার গায়ে! বসে বসেই রাত কেটে গেল।

সূর্য না উঠতেই লতায়কে ডেকে তুললাম।

উঠে বসেই লতায় বলল, বোষ্টম-বোষ্টমি না সাজলেই ভাল হ'ত। বরং স্বামী স্ত্রী সাজলে ভাল হত।

হাসলাম।

হাসছেন কেন।

শেষটায় তাই না হয়।

লতায় হাসল।

বলল, বড়ই ছেলে মানুষ আপনি। লতায় ঘর বাঁধে না, ঘর ভাঙ্গে। এই তার কৃতিত্ব। জন্ম থেকে লতায় অপয়া, তাকে নিয়ে ঘর বাঁধা যায় না।

আজকের সত্যি, কালকে সত্যি না'ও হতে পারে।

বলতে চান, লতায় ঘর বাঁধবে!

আশ্চর্য কি!

সেইদিনের অপেক্ষায় রইলাম।

হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধারে এসে বসলাম। শান্তিপুরের গঙ্গা দেখে কবিগুরু মুগ্ধ হয়েছিলেন। শীতের শীর্ণকায়া এই গঙ্গাকে কবি দেখেন নি। ঋষি জগদীশচন্দ্রও এই ভাগীরথীর চেহারা দেখেন নি। তাঁরা যদি এই গঙ্গাকে দেখতেন তা হলে কবির কাব্যিক মনটা শুকিয়ে যেত, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিস্তব্ধ হয়ে যেত। জেলে ডিঙ্গি গুলো ভেসে বেড়াচ্ছে গঙ্গার বুকে। শ্যামল বনভূমি শেষ হয়ে গেছে নদীর কিনারায়, বালির চর পড়েছে অনেক দূর অবধি। ওপারের কালনা শহর এপারের দিকে অপলকে চেয়ে আছে।

লতায় নাইতে নামল গঙ্গায়।

আমি আনমনে বসে রইলাম কাশের ঝোপের ওপাশে ফেরীঘাট থেকে কিছুটা দূরে।

স্নান সেরে লতাম্বু কাপড় জামা বদলে এসে বলল, আজ সেবা হবে না গোঁসাই।

তার বলবার ভঙ্গীতে হেসে উঠলাম। বললাম, তুমি গুপী যন্ত্রটা পাহারা দাও আমিও স্নান সেরে আসি। অনেকদিন গঙ্গার কথা শুনেছি, গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়িয়েছি, স্নান করবার সুযোগ পাইনি। আজ গঙ্গায় স্নান করে জীবন ধন্য করে নেব।

গঙ্গায় পা দেবার আগে মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল হাসির শব্দ। পেছন ফিরে অবাক হয়ে বললাম, হাসছ কেন লতাম্বু?

আপনার ভক্তি দেখে।

আবার খিল খিল করে হেসে উঠল লতাম্বু।

হাসি থামলে বলল, এই জনেই ওরা নিত্য স্নান করে। এই জলে স্নান করে ওরা যারা আমাকে নিয়ে যেতে চায় নিজের অট্টালিকায়।

সে তো গঙ্গার অপরাধ নয়।

তা নয়। গঙ্গার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। যিনি পাপ খণ্ডন করেন তিনি পাপ বইতে বোধহয় আর পারছেন না। নইলে গঙ্গায় গা ধুয়েও যাদের মনের ময়লা পরিষ্কার হয় না, তারা কি করে সমাজে বুক ফুলিয়ে চলতে সাহস পায়। সে পাপহরা গঙ্গার মরণ হয়েছে, এ গঙ্গা তার কঙ্কাল।

লতাম্বুর কথা শেষ হবার আগেই মাথা ডুবিয়ে দিলাম, আরও কিছু সে বলল তা আর শুনতে পাইনি।

স্নান করে প্রস্তুত হয়ে নিলাম।

যাবার পথে জিজ্ঞাসা করলাম, লতাম্বু তুমি ভেক নিয়েছ কেন?

বাঁচবার তাড়নায়।

আর কিছু নয়।

না গোঁসাই, আর কিছু নয়।

সত্যি।

আর বোধ হয় আপনাকে বাঁচাতে।

গম্ভীরভাবে বললাম, ভেক না নিলেও আমি বাঁচব। তোমার সাথে

থাকবার অথবা এই সাজ্ঞ দেহের সাথে জড়িয়ে চলবার কোন দরকার নেই।

তাহলে আমরা দু পথে চলি।

সে কথা বলছি না। বাঁচা ও বাঁচাবার চেয়েও বড় কিছু কি নেই?

হয়ত আছে, কিন্তু জানি না। কি বললে আপনি খুশী হবেন।

খুশী হবার প্রশ্ন নয়। আসল কথা, আমি খুঁজব শেফালিকে, কিন্তু তুমি কি খুঁজতে বেরিয়েছ! তোমার এই চলার সাথে কি স্বার্থ আছে বলতে পার।

পারি। খুঁজব একটি হৃদয়।

সে সন্ধানে পাবে কি?

হৃদয় নামক বস্তুটী যদি পাথর না হয়ে থাকে, একদিন তাকে খুঁজে পাবই, লতানু জন্মেছিল যার ঘরে তার ঘরে মানুষ ছিল, বিত্ত ছিল, চিত্ত ছিল, সে-ঘর সে হারিয়েছে, তাই লতানু হয়েছে খুনী, কিন্তু লতানু খুন করত না যদি সে পেত হৃদয়ের সন্ধান। যেদিন সে হৃদয়ের সন্ধান পাবে সেদিন তার চলাও শেষ হবে। আপনি খুঁজছেন মানুষ, আমি খুঁজছি মানুষের হৃদয়। যেখানে বঞ্চনা নেই, লাঞ্ছনা নেই, অত্যাচার নেই, অবিচার নেই এমনি একটি হৃদয়ের সন্ধান করছি। কে জানে পাব কি না, না পেলেও সান্তনা পাব, কেননা, খোঁজা আমার শেষ হবে না জীবনের শেষদিন অবধি, সেদিন অভিযোগ করবার কিছু থাকবে না। নিজেকে প্রবোধ দেব, আমি তো খোঁজার ত্রুটি করিনি। ত্রুটিহীন মন নিয়েই মরতে পারব।

বললাম, সারা জীবন ধরে খোঁজাই সার হবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লতানু বলল, তাতেও রাজি। সেজন্য প্রস্তুত হয়েই পথে পা দিয়েছি। নৈরাশ্য হল জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি, পূর্ণতা কখনও কেউ লাভ করেনি, আমিও করতে পারব না। নিরাশার দুঃখ আমাকে অঙ্গারে পরিণত করতে পারবে না!

আবার সেই কান্নাভরা মুখ, আবার সেই কালো খামচানির দাগগুলো আরও কালো হয়ে দেখা দিল।

পিচের রাস্তায় পা দিয়ে দুজনেই চুপ করে গেলাম। এগিয়ে চললাম রাসমঞ্চের দিকে।

শ্যামচাঁদের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে লতাম্বু গম্ভীর ভাবে বলল, মানুষের রুচি দেখুন।

বুঝতে না পেরে বললাম, কেমন রুচি!

যে দেশে মানুষ খেতে পায় না, যে দেশে মানুষ ধর্মের নামে অধর্ম করে, সে দেশে দেবতার জন্য তৈরী হয় এমন সুন্দর মন্দির। দেবতার মহিমার চেয়ে মন্দিরের সৌন্দর্য বেশি। শ্যামচাঁদের মন্দির নয়, পথে যে তোপখানা মসজিদ দেখে এলাম তাতেও ঐ একই সৌন্দর্য শিল্পীর গুণগরিমা প্রকাশ করছে, যুগ যুগান্ত থেকে মানুষ ঐ সৌন্দর্যের মাঝে স্রষ্টাকে খুঁজছে। স্রষ্টাকে খুঁজে না পেয়ে মানুষ সৃষ্টির আরাধনা করছে, স্রষ্টার গরিমা স্তিমিত হয়ে গেছে। কেন হয়েছে, এ প্রশ্ন চিরন্তন। মানুষ প্রতারণা করতে চায় পরিবেশকে তাই হর্মের চাকচিক্য দিয়ে হর্ম অধিকর্তাকে ভুলিয়ে দিতে চায়।

বিস্মিত ভাবে বললাম, তুমি এত কথা শিখলে কোথায়?

দেখা হল শেখবার বর্ণবোধ। চোখ দিয়ে যারা দেখে তারা যদি হৃদয় দিয়ে তার পাঠ গ্রহণ করত তাহলে শেখবার প্রয়োজন আপনা থেকেই ফুরিয়ে যেত। একটা কথা কিন্তু ভুলতে পারি না, ধর্মোন্মাদ বলুন আর যাই বলুন, মানুষ আদর্শকে ধারণ করে থাকে বলেই ধ্বংসের মাঝেই সৃষ্টির বীজ উপ্ত হয়। নইলে যে মোগল আমলে হিন্দুর মন্দির ভেঙ্গে চুরমার করা হত সেই আমলেই রামগোপাল খাঁ দুলক্ষ টাকা ব্যয় করে শ্যামচাঁদের এমন সুন্দর মন্দির গড়তে পারতেন কি! দু'শ আড়াইশ বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে এই মন্দির, মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল শহর, বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের সমৃদ্ধি, গড়ে উঠেছে শ্রীমণ্ডিত পরিবেশ। জলেশ্বরের মন্দির দেখেছেন তো, ঐ মন্দিরের প্রতিটি ইঁটের টুকরো যেন বাঙ্ময়। বাংলার গরিমা, বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার সংস্কৃতির কথা যেন প্রচার করছে পোড়ামাটির ঐ টুকরোগুলো। এগুলো মন্দির নয়, এগুলো মানুষের হৃদয়দর্শনের সাক্ষ্য বহন করছে। আসলকে দেখা না গেলেও, প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে।

আবেগের সাথে ডাকলাম, লতাম্বু।

ডাক শুনে লতাম্বুর ভাবাবেশ কমে গেল, বলল, কিছু বলছেন?

বলছি, মানুষকে বড় করে ভাবতে গিয়ে ব্যক্তিকে ছোট মনে করা কি উচিত হবে। ব্যক্তি যদি বড় না হত তা হলে মহাপণ্ডিত অদ্বৈতাচার্যের পক্ষে

কি মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ সম্ভব হত। যিনি একদিন জ্ঞানের পথ খুলে দিয়ে ছিলেন মহাপ্রভুকে তিনিই একদিন নিজ শিষ্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তির এই শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলেই সমষ্টিকে আমরা চিন্তা করতে পারছি।

ব্যক্তি বাদ দিয়ে যে সমষ্টি নয়, তা জানি। আমার বক্তব্য তা নয়। আমার বক্তব্য ব্যক্তির অহমিকা। দেবত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব যে হীন নয় তার প্রমাণ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল মানুষ। নশ্বর সৃষ্টির মাঝ দিয়েই যেন মানুষ বলতে চেয়েছে তার বিরাটত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্বের কথা। সে ভ্রান্তির বাইরে দাঁড়িয়ে, মানুষের অহমিকাকে অগ্রাহ্য করে কীর্ত্তির সামান্য ভগ্নাংশ যা রয়েছে তা শুধু সাক্ষ্য দিচ্ছে সমষ্টির কৃতিত্বের। ব্যক্তি সেখানে ম্লান হয়ে গেছে।

লতাহ্ কথা শেষ করে নীরবে চলতে লাগল।

বললাম, মানুষ যদি ব্যক্তিকে ভাল না বাসতো তা হলে এখানে আশানন্দের স্মৃতিসৌধ তৈরী হতে পারত কি? হৃদয়ের মূল্য সর্বাধিক, মানুষকে বিচার করা হয় হৃদয় ঔদার্যের পরিমাপে। তা না হলে মানুষকে পূজা করতে মানুষ ছুটে আসত না। কবে কোন অজ্ঞাত দিবসে আশানন্দ মুখুজ্যে ঢেঁকি নিয়ে ডাকাত তাড়িয়ে ছিলেন তারই স্মৃতিরক্ষা করতে মানুষ এত ব্যস্ত হত না। শান্তিপুরে শান্তি নেই, একথা যেমন সত্যি তেমনি সত্যি শান্তিপুর স্মৃতির দেশ। স্মৃতিকে মানুষ শ্রদ্ধা করে। স্মৃতির অঙ্গনে বসে কীর্ত্তিমানদের তর্পণ করে। নইলে সামান্য একজন ভাঁড় গোপাল পরামানিক তাকেও শান্তিপুরের মানুষ স্মরণ করে শ্রদ্ধার সাথে তার ভাঁড়ামির শ্রেষ্ঠত্বের জন্য। আমরা যান্ত্রিক যুগে এসে গেছি, সেই যুগে যদি ফিরে যেতে পারতাম তা হলে বাস্তব মানুষের সাক্ষাত পেতাম, তাদের মনের খবর খুঁজে পেতাম। তখন এত সহজে মানুষের কার্যকলাপকে বিশ্লেষণ করতে পারতাম না। যথাযোগ্য মূল্যদান করাই ছিল স্বাভাবিক। শ্যামচাঁদের মন্দিরের পোড়া মাটির কারুকার্য দাতার কথা স্মরণ করায় কিন্তু সামান্য দানের পশ্চাতে যাদের মেধা মেহনত লুকিয়ে রয়েছে, তাদের কথা তাদের ভাষায় বলবার অধিকার আমাদের নেই। সে যুগে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় বলেই ব্যাখ্যা ভিন্নমুখী হওয়াও সম্ভব।

লতাহ্ আর কথা বলেনি।

পথ চলছি।

অনেকটা পথ আসবার পর লতাহ্ বলল, শেফালি বউদির কথা যেন ভুলে যাবেন না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, তাকে ভুলিনি বলেই তো নিজেকে এখনও হারিয়ে ফেলতে পারিনি আমার সাজ সজ্জাব অন্তরালে। যদি কখনও ভুলে যাই তখন অবশ্য অন্য কথা।

তা হলে জোরে পা ফেলুন। পথ যে অনেক বাকি।

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, শেস হবে কি ?

তা জানি না।

বেশ চল। দৃষ্টি যেখানে ঝাপসা হবে সেখানেই আমাদের যাত্রা হবে শেষ।

৩

পথেই ব্রহ্মশাসন।

দস্যু চাঁদরায়ের আস্তানা ছিল এখানে। চাঁদরায় নিজস্ব কিছু রেখে যায়নি, রেখে গেছে ভক্তির মহিমা।

লতাহু চাঁদরায়ের শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষের সামনে এসে বলল, কাছে কোথাও যদি খাবার জল থাকে খুঁজে আনুন। রান্না খাওয়ার ব্যবস্থাটা এখানেই শেষ করতে চাই।

তথাস্তু।

জল খুঁজে বের করতে কষ্ট হল না। ফিরে এসে দেখি লতাহু অবাক হয়ে ভাঙ্গা মন্দিরের দিকে চেয়ে আছে।

কি ভাবছ লতাহু ?

ভাবছি না, কল্পনায় দেখছি চাঁদরায় চাঁদরায়কে। কত উপকথা জড়িয়ে আছে চাঁদরায়ের সাথে। শুনেছি চাঁদরায় ছিল ডাকাতের সেরা। নামজাদা ডাকাত হয়েও ভক্তির কোথাও তারতম্য ছিল না। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চারটি শিব মন্দির। সেকালে এই মন্দিরের সামনে গাজনের দিন হাজার হাজার মানুষ সমবেত হত, শিব মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করত। সেই কালের জনকোলাহল মুখরিত প্রান্তর আজ নিস্তব্ধ। দেবতা তার ভক্তকে আর ডেকে আনতে পারছে না। দেবতার অক্ষমতা অথবা চাঁদরায়ের অধর্মার্জিত অর্থে নির্মিত মন্দির এই হতাদরের কারণ তা নিরূপন সম্ভব নয়।

বললাম, সেদিন যারা আসত না, আজ তারাই আসছে।

আমাদের মতো কতকগুলো হতভাগা আসবে নিশ্চয়ই। দেবতার মহিমা কীর্ত্তন করতে নয়, চাঁদরায়ের এই ভগ্ন মন্দির দেখতে। শিল্পীর দক্ষতা দেখে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে পথিক। ভাঙ্গা মন্দিরের খণ্ড-বিখণ্ড ইঁটের সাথে

মানুষের নাড়ীর যোগাযোগ যেন জুড়ে দেওয়া আছে। তাই অনিসন্ধিৎসু মন যাদের তারা ছুটে আসে এখানে। বাংলার সাহিত্য নিয়ে যারা গবেষণা করেন তারাও মনের ক্ষুধা মেটাতে পারবেন এখানে। তিনশত বৎসর আগে দস্যু চাঁদরায় আকাশচুম্বী যে ধ্বজ তৈরী করে শঙ্করের পায়ে উৎসর্গ করেছিলেন, সে মন্দির সাক্ষ্য দিচ্ছে বাংলা ভাষার প্রাচীনত্ব বিষয়ে। দেখুন দেখুন, তিনশত বৎসর আগেও আজকের-মতো বাংলা হরফেই বাংলার মানুষ মনের কথা লিখে রেখে গেছে, এই হরফেই চাঁদরায় তার কীর্ত্তিকথা লিখে রেখে গেছে এই মন্দিরের গায়ে।

ডাকলাম, লতাম্ন।

কিছু বলতে চান?

আমরা গবেষক নই, ভাতেভাত সেদ্ধ করে স্বপথে গমন আমাদের মুখ্য কার্য, গৌন হল নিরাপদ স্থানে সন্ধ্যার পূর্বে পৌছানো।

লতাম্ন তর্কাতর্কি না করে চাল ডাল আলু একসাথে হাঁড়িতে তুলে দিয়ে উনুনে ফুঁ দিতে লাগল। শুকনো কাঠকুটো দাউদাউ করে জ্বলে উঠল।

গিয়ে বসলাম মন্দিরের ভাঙ্গা সিঁড়িতে। ভাবছিলাম আকাশ-পাতাল যার কোন সংজ্ঞা নেই, ধারাবাহিকতা নেই। তবু যেন খুঁজে পেলাম শেফালিকে। ভাঙ্গা মন্দিরের চত্বরে ছুটে বেড়াচ্ছে বাচ্চার হাত ধরে শেফালি। ছায়ার মতো সামনে এসে আবার ছুটে পালাচ্ছিল। অসারে চিৎকার করে উঠলাম, শেফালি—শিউলি—শিউ—সখি।

লতাম্ন চমকে উঠল। উনুন রেখে ছুটে এল আমার কাছে। গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, আপনি স্বপ্ন দেখছেন।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো অসারে লতাম্নর হাত ধরে আবেগের সাথে বললাম, লতাম্ন, গত জন্মে তুমি আমার কে ছিলে।

গত জন্ম আমি বিশ্বাস করি না।

এ জন্মে?

পথের সাথী। পথের সীমান্তে এসে যে যার পথে চলে যাব। এর বেশি নয়।

কিন্তু শেফালি যেন অনেক কিছু ছিল।

লতাহু উহুনের কাছে ফিরে যেতে যেতে বলল, শেফালি আপনার স্ত্রী, কিন্তু লতাহুর কোন ডেফিনেশন নেই।

উহুন থেকে হাঁড়ি নামিয়ে বলল, দেখুন কোথাও বড মানকচু পাতা পাওয়া যায় কিনা? তা হলে অনেক হাঙ্গামা মিটে যায়।

মানকচু পাতা নিয়ে এলাম। সেগুলো ধুয়ে নিয়ে হাঁড়ি থেকে মণ্ড ঢেলে দিল লতাহু। নীরবে আহার শেষ করে উঠে আসছিলাম, লতাহু বলল, বসুন, খেতে খেতে গল্প করব।

গল্প?

হাঁ।

কিসের গল্প।

আমার মাসীর একটি কন্যা সন্তান ছিল, তাব গল্প।

মাসী-পিসির গল্প শুনে লাভ আছে কি?

আপনার কথার জবাব এই গল্প থেকেই খুঁজে পাবেন।

মাসীর মেয়ে মল্লিকা।

বয়স হয়েছে, প্রতিজ্ঞা করেছে বিয়ে করবে না।

মা বাবা ভেবেই আকুল।

মল্লিকা বলল, আমি পডব।

বেশ পড়।

প্রবেশিকা হল, আই-এ হল, বি-এ পরীক্ষা দেবে সেবার। দুপুর বেলায় মাস্টার মশায়ের কাছে পডতে যায়। পবীক্ষা এগিয়ে এল, মল্লিকা পরীক্ষা দিল না। পডা বন্ধ করে দিল।

এবার আমার পালা।

আমি গেলাম মাস্টার মশায়ের কাছে পডতে। কিছু দিন পড়বার পর মাস্টার মশায় জেনে ফেললেন, আমি মল্লিকার বোন। বললেন, আমার শরীরটা ভাল নয়, আর পডাতে পারব না।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম! কযেক মিনিট আগে যাকে উৎসাহের সাথে পাঠ্যবস্তু শিখিয়ে দিতে দেখেছি, তিনি হঠাৎ অসুস্থ হলেন কি করে।

আমিও নাছাডবান্দা। রোজই আসতাম। একদিন মাস্টার মশায় বলেই ফেললেন।

মল্লিকা যে সর্বনাশ করেছে তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন ?

মল্লিকা আমাকে ভালবাসত, আমিও।

কিন্তু আপনি যে বিবাহিত।

বিবাহটা ভালবাসার প্রতিবন্ধক নয়। এ কথা জেনেও সে ভালবাসত।

অবাক হয়ে বললাম, তারপর ?

দুজনে চিরজীবন ভালবাসার প্রতিশ্রুতি দিলাম পরস্পরকে।

মাস্টার মশায় থেমে গেলেন।

বললাম তারপর ?

একদিন মল্লিকা বলল, চাকরি চাই। খুঁজুন চাকরি।

খুঁজতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু কি দরকার তার চাকুরির। বললাম, পরীক্ষা দিয়ে নাও। আমার কথায় মল্লিকা হেসেছিল। সে হাসির বেগে তার দেহের প্রতিটি তন্তু যেন ব্যঙ্গ করেছিল আমাকে। তখন বুঝতে পারিনি।

অনেক দিন তার আর দেখা নেই।

একদিন এসে বলল, আচ্ছা মনে করুন আপনার স্ত্রী মারা গেছেন। আপনাকে আমি বিয়ে করছি তারপর, আপনার ঐ স্ত্রীর সন্তান পালনের দায়িত্ব কিছুটা আমাকেও তো নিতে হবে।

তা হবে বইকি।

আর যদি আমি অন্যত্র বিয়ে করি, দু তিনটে সন্তান নিয়ে বিধবা হই, তা হলে আপনি আমাকে বিয়ে করে পূর্ব স্বামীর সন্তানের দায়িত্ব কিছুটা নেবেন তো ?

বললাম, নেওয়া উচিত।

উচিত অনুচিত নয়। আপনি কি করবেন তাই বলুন।

নেব।

বাস।' মল্লিকা ফিরে গেল।

অনেক দিন পর মল্লিকার চিঠি পেলাম। চিঠিটা আমাকে লেখা নয়। খামে ঠিকানা লিখতে বোধহয় ভুল হয়েছিল। ইচ্ছে করেও ভুলের অভিনয় করতে পারে। মল্লিকার চিঠিতে জানলাম সে বিয়ে করেছে। চিঠিখানা

স্বামীকেই লিখেছে। কিন্তু বিবাহের ঘটনা গোপন করে রেখেছে বাবা মায়ের কাছে। আকুল আবেদন জানিয়েছে স্বামীকে তার নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে থাকবার। রাত্রিযাপনের প্রতিশ্রুতি আছে তাতে।

ভাবলাম, মল্লিকা এল অথচ নিজেও বলল না বিয়ের কথা। তারপর কেন লুকিয়ে গেল অন্তরালে।

আজও ভেবে পাইনি কেন সে আমাকে একথা বলেনি, হয়ত সে তার স্বামীকেও বলেনি আমার প্রতি তার ভালবাসার কথা।

সেই মল্লিকার বোন তুমি। তাই তোমাকে ভয়।

গল্প বলা শেষ করে লতাম্বু হাসল।

খাওয়াও শেষ হয়েছে তার।

জিজ্ঞাসা করলাম, এ গল্পের সাথে আমার প্রশ্নের উত্তর কোথায়?

ঐ যে এ-জন্ম আর গত-জন্ম। ভালবাসা সেখানে ঘর বাঁধে না, বাঁধা ঘর যেখানে ভালবাসা মানে না, সেই মানুষের সমাজে ওসব ভাব প্রবণতার কোন মূল্যই নেই।

লতাম্বুর কথা শেষ হতেই রওনা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলাম।

পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে রাস্তায় পা দিলাম।

পথের শেষ নেই, চলছি তো চলছিই।

লতাম্বু জিজ্ঞাসা করল, পাথেয় কেমন আছে?

অচল হবার মতো নয়।

তবুও সঞ্চয় দরকার।

তুমি গৃহী।

আপনিও, কিন্তু বর্তমানে বিবাগী। ভুলে যাবেন না পয়সার প্রয়োজন।

সে কথা ভুলি না। আমি কিন্তু মাস্টার মশায় নই। অন্তত প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করবার কোন্ অবকাশ নেই।

তা জানি। জোরে পা ফেলুন, সামনে শহর। সন্ধ্যার আগে পৌঁছাতে চাই।

সামনে শহর।

মাটির শহর। মানুষ এখানকার অতীত যেন ভুলে গেছে। মাটির পুতুলের গায়ে রঙ চড়িয়ে এরা অতীতের ঐতিহ্য রক্ষা করে আসছে।

শহরে প্রবেশ করে লতাহ্ বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল।

বললাম, সব কিছুতেই তোমার অনাসক্তি।

না, মোটেই নয়। যারা অতীতকে ভালবাসে তারা বর্তমানকে ব্যঙ্গ করে। কেননা তারা রক্ষণশীল। তারা অতীতের সব কিছুকেই ভাল মনে করে আর নতুনকে মনে করে আজগুবী। আমি কিন্তু তা নই। আমি অতীতকেও শ্রদ্ধা করি নতুনকেও ভালবাসি। যারা অতীতকে শ্রদ্ধা করে না তাদের আমি প্রশংসা করি না আবার যারা অতীত নিয়ে নতুনকে ব্যঙ্গ করে তাদের রুচিও প্রশংসা পাবার দাবী করতে পারে না। সারা শহরে যা দেখবার দেখুন। নতুনের আস্বাদ পাবেন। অথচ এখানেই ছিলেন বিদ্যাসুন্দর, এখানেই ভারতচন্দ্র, এখানেই কৃষ্ণচন্দ্র, এখানেই গোপাল ভাঁড় কিন্তু এত বড় সংস্কৃতির ধারক এই শহরের সে গৌরবের কণামাত্রও নেই। আমরা গাঙ্গনীর তীরে এসেছি, পারে পাটনী নেই, আমাদের আকুল আহ্বান নিষ্ফল হবে।

মানুষ এখানে গৌরবময় অতীতকে স্মরণ করে।

কেননা নতুনকে স্মরণ করবার মতো অলঙ্কার দিতে পারেনি। ওরা কঙ্কালের মজ্জা খুঁজে বেড়ায়, তাজা মানুষের মজ্জা শুকিয়ে গেলেও আপশোষ করে না।

এই যে রাজবাড়ি।

রাজ্যহীন রাজার বাড়ি। এ যেন মাথা নেই মাথা ব্যথা। রাজার পরিমাপ হয়েছে অর্থের তৌল যন্ত্রে। ক্ষমতায় নয়, মহত্বে নয়। টাকার জৌলুস যেদিন কমবে সেদিন রাজাকে মুদির দোকান খুলতে হবে। এইটুকুই সান্ত্বনা রইবে আমাদের মতো লোকের।

বারদোলের আঙ্গিনায় এসে বসলাম। সামনে রাজবাড়ি। সন্ধ্যার আবছা আঁধার নেমে এসেছে। দেবালয়ে তখন সবে আলো জ্বালা হয়েছে। রাস্তায় বিজলি বাতি মিট মিট করে চেয়ে আছে মাঠের দিকে।

লতাহ্ বলল, গোঁসাই শহরের বাইরে কোথাও চলো। সেখানে গাছতলা দেখে রান্নার ব্যবস্থা করব। রাতও কাটাব।

আজ শুকনো খেয়ে থাকলে কেমন হয়। দু বেলা রান্না করলে মনে হবে ঘর সংসার পেতে বসেছি। সংসারের সব ছেড়েও সং-টা ছাড়তে পারছি না।

খাওয়াটা যত্র তত্র আব হট্ট মন্দির শয়ন করতে পারলে যেন অশান্তির লাঘব হয়, তখনই হয়ত নিজেদেব বিবাগী মনে হবে।

লতাহু রান্নাব জন্য উদ্‌গ্রীব নয়। আসলে সে শহর ছাড়তে চায়, শহর ছাড়তে পাবলেই সে খুশী। শহরেব বাইবে গাছতলায মানুষের প্রশ্ন নেই, চোখ টাটানি নেই, সুপ্ত লালসাব বঙ্কিম ভঙ্গিমা নেই। নিবলম্ব সাত্ত্বিক আশঙ্কাশূন্য সেই জীবন। লোকালয যেন হাহাকাবেব আশ্রয।

কে ?

চমকে উঠলাম, বললাম, গোঁসাই।

এখানে কেন ?

দেব দর্শনে।

নাম গান কবতে পাব গোঁসাই।

পাবি, তবে আজ নয।

কেন ?

সাবা দিনে আহার্য সংগ্রহ হয়নি, ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত।

তবুও দেবস্থান। দেবালয়ে সময স্থির কবতে নেই। মানুষের গান দেবতাব পায়ে বিলিয়ে দিতে সময ঘড়ি-ঘণ্টার প্রয়োজন হয় না।

লতাহু বাধা দিযে বলল, তাতে আনন্দ নেই।

কিসে আনন্দ ?

যাতে পবিপূর্ণতা। মানুষেব মন যদি গানের তালে নেচে না ওঠে সে গান মিছে। মাটি-পাথরেব দেবতাব গান শুনবাব কান নেই। গায়ক ও শ্রোতাব মন যখন এক সুবে বাঁধা পড়ে তখনই গান সৃষ্টি হয। বুভুক্ষুব কণ্ঠ থেকে গান বের হয় না, যা বের হয় তাকে বলে করুণ আর্তনাদ। সে আর্তনাদ শোনাতে চাই না। চলো গোঁসাই, এখানে স্থান হবে না।

লতাহু উঠে দাঁড়িয়ে হাত ধবে টানল।

প্রশ্নকর্তার আবও কিছু জিজ্ঞাস্য হযত ছিল, লতাহুব তাচ্ছিল্যপূর্ণ উক্তিতে সে যেন মূক হয়ে গেল। কিছু বলবার আগেই আমরা পথ ধরলাম।

পোঁটলা পুটলি নিযে চলছি।

শহব ছেড়ে অনেক দূরে এসে গেছি। সামনে গ্রাম। লতাহু বলল,

আজ রাতে এই মাঠে রাত কাটাব। সকালে গ্রামে গিয়ে নাম শোনাব।

পাশেই পুকুর। হাত মুখ ধুয়ে পেট ভরে জল খেয়ে নিলাম। মাঠে এসে কম্বল বিছিয়ে বসলাম। পাশেই উলুখড়ের জঙ্গল, গা ছম্ ছম্ করতে লাগল। শীতও বৃদ্ধি পেয়েছে। মাথার ওপরে ছাউনি থাকলে হত। আত্মরক্ষার সামান্য সুযোগটুকুও সেদিন ছিল না। ওপরে খোলা আকাশ, আকাশভরা ক্ষীণ নক্ষত্রের সারি, মিটি মিটি তারা চেয়ে আছে আমাদের দিকে, তাদের চাহনি আমাদের মতই শঙ্কাকুল। অদ্ভুত যোগসূত্র মনে হল।

রাত কেটে গেল।

সকালে উঠেই লতাসু বলল, হাত মুখ ধুয়ে আসুন। চিড়ে গুড় খেয়ে রওনা দেব।

সকালের কাজগুলো শেষ করে আবার রওনা দিলাম।

সামনে গ্রাম। নাম শুনলাম, দেবপল্লী।

ধীর পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালাম দেবপল্লীর নৃসিংহদেবের মন্দিরে।

নৃসিংহের বিরাট পাথর খোদাই মূর্তি।

ভীড় জমেছে মন্দিরে। শিশু কোলে নিয়ে জননী বসে আছে মন্দিরের বারান্দায়। ঢোল বাজছে, উৎসবের হুল্লোড় আরম্ভ হয়েছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম।

কানের কাছে কে যেন বলল, তোমরাও প্রসাদ পেও, আমার নাতির অন্নপ্রাশন আজ।

ভগবানের অশেষ করুণা, না চাইতেই জল।

লতাসু বলল, স্থানীয় লোকেরা শিশুর অন্নপ্রাশন দিতে আসে এই মন্দিরে। মানুষের বিশ্বাস নৃসিংহ অনাদি দেবতা। তাই তার ভগ্ন মূর্তিকেও এখানে পূজা করা হয়। অনাদি দেবতার প্রসাদ মুখে দিয়ে শিশুরা অনন্তজীবন লাভ করুক, এই কামনা করে দেশের মানুষ।

এ সংবাদ বুঝি এতক্ষণ সংগ্রহ করলে।

বলছিলেন ঐ বৃদ্ধা। ওর নাতির অন্নপ্রাশন। কত কচি ঐ বউটা। ওই বয়সে আজকাল কারও বিয়েই হয় না, অথচ ওকেই মা হতে বাধ্য হতে হয়েছে।

প্রাণী জগতের সত্যকে অস্বীকার করে যে লতাহু উন্নাসিকভাব দেখাল, তা সমর্থনযোগ্য নয়। শুধু বললাম, আর কিছু?

পূজা, ভোগ ও ভোজন শেষে পদাবলী শোনাতে হবে।

তুমি কি বললে?

রাজি হলাম। আপনিও প্রস্তুত হয়ে নিন।

যেরূপ আদেশ করছ সেরূপই হবে।

অনেক বেলায় সব মিটলো। লতাহুকে বললাম, আজই নবদ্বীপ পৌঁছাতে চাই। গানের সুরের সাথে নিজেকে ভুলে যেওনা যেন।

পাগল। কিন্তু একটা গান না শুনিয়ে এগোতে পারব কি।

গুপীযন্ত্র নিয়ে টুং টাং করতেই সবাই গোল হয়ে বসল। লতাহু খঞ্জনী তুলে নিল হাতে।

লতাহু গান ধরল :

সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলই গরল ভেল।

আমি দোহারের মত গলায় গলা মিলিয়ে দিলাম।

নৃসিংহদেব শুনেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু যারা শুনছিল তারা মোহাবিষ্টের মতো মুখের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। নিশ্চল পাথরের মতো। কখন গান শেষ হল টের পাইনি। যখন গুপীযন্ত্র আর খঞ্জনী থেমে গেল, চেয়ে দেখলাম তখনও বিস্ময় বিমূঢ়ের মতো বসে রয়েছে সবাই। মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আরেকটা হোক গোঁসাই।

জবাব দিল লতাহু, মাপ করুন মা, আজই আমাদের প্রভুর চরণ দর্শন করতে হবে, মানত রয়েছে। এখুনি না বের হলে সন্ধ্যের আগে পৌঁছাতে পারব না। যদি আবার আসি এ পথে তা হলে আবার শুনিয়ে যাব প্রভুর নামকেত্তন। জয় গুরু। চলো গোঁসাই।

লতাহু উঠে দাঁড়াল। বলল, কি ভাবছ গোঁসাই। চলো বেলা যে গড়িয়ে চলেছে।

কথা বলবার অবসর ছিল না। লতাহুর নির্দেশে পেছন পেছন চলছি। মন্তব্য শুনলাম, বোষ্টুমীর গলা আর রূপ দুটোই হুঁ, বুঝলি। বক্তাকে দেখতে পেলাম না, বুঝলাম, লতাহু আগুনের টুকরো, ওর রূপ ও গলা দুটোই মোহ সৃষ্টি করবে, লোভীর মনে আগুন জ্বালাবে। হতভাগা গোঁসাইয়ের কোন দাম নেই ওদের কাছে। রূপের সাথে রূপার সম্পর্ক বহুদিনের, লতাহু আমার রূপার তহবিলদার, আর রূপের জৌলুষ খদ্দের ডেকে আনবার চুম্বক।

চলতে চলতে মহেশপুরে এসে গাছতলায় বসলাম।

বললাম, বেলা তিনটে বেজে গেছে, শীতের বেলা পেরিয়ে গেল। আজ এখানেই আস্তানা খুঁজে নিতে হবে।

মন্দ কি।

স্টেশনের গায়ে গা দিয়ে পান বিড়ির দোকান। তার সাথেই রয়েছে চিড়ে মুড়ির ধামা। লতাহু গেল আহার্য সংগ্রহ করতে। আমি রইলাম বসে।

আঁচল বোঝাই মুড়ি এনে বলল, রাতটা কেটে যাবে এখানেই।

বললাম, নিশ্চয়ই। মুড়ি চিবিয়ে রাত কাটাবার অভ্যাস আছে।

শুনলাম, এক মাইল দূরে মায়াপুর। মহাপ্রভুর জন্মস্থান। ওখানে গেলে কেমন হয়।

তোমার ইচ্ছা। তুমি ইচ্ছাময়ী আমি সেবক মাত্র।

তা বটে। আমি ইচ্ছাময়ী আর আপনি ইচ্ছাপালনকারী! বলেই লতাহু খিল খিল করে হেসে উঠল।

পথে লোকের অভাব নেই।

চলতে চলতে একজন ভক্তের সাথে দেখা।

'জয় মহাপ্রভু', বলল তারা। আমরাও 'জয় মহাপ্রভু' বলে অভিবাদন জানালাম। মনে হল, ভক্তি আদায়ের পাত্রটি সঙ্গে রয়েছে বলেই ভক্তির প্রাবল্য।

কোথায় যাওয়া হচ্ছে মহাশয়দের?

প্রভুর জন্মস্থান দেখতে।

ভাল ভাল। শুভ শুভ। যাওয়া উচিত। আমরাও গিয়েছিলাম

সেখানে। প্রভুর জন্মভূমি। বলেই একজন যেন তুরীয ভাব ধারণ করল, বিড বিড করে বলতে লাগল :

নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুব নামে স্থান।
যেথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান ॥

তুরীয় ভাবের বিরাম ঘটলে ভক্তজন বলল, আরও একটু এগিয়ে যাবেন। আসল নবদ্বীপ ছিল বামনপুকুরে। ওখানে থাকতেন রাজা বল্লাল সেন, তার ভাঙ্গা প্রাসাদ দেখলেই বুঝতে পারবেন নবদ্বীপের মহিমা।

বললাম, প্রভুর জন্ম তো নবদ্বীপে।

ভক্ত বলল, আসলে নবদ্বীপ নদীর ওপারে নয়, এ পারেই ছিল। ভাগীরথীর ভাঙ্গনে ওপারে নবদ্বীপের নব প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

লতাহু এতক্ষণ কোন কথা বলেনি।

ভক্তের দৃষ্টির সামনে সে অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ব্যঙ্গভরা হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলল, কি দেখছ বাবাজিরা।

ভক্তের দল লজ্জা পেল।

বললাম, রূপ।

লতাহু বলল, রূপো আছে।

ভক্তদের ভক্তি উপে গেল। পথ বলল। বৈষ্ণবীর মুখে ওকথা সাজে না। নারী রাধার অবতার, পুরুষ স্বয়ং নারায়ণ। ওরা সহ্য করতে পারল না।

লতাহু নিলর্জ্জের মতো আমার দিকে চেয়ে বলল, শুনলেন তো।

শুনলাম, কিন্তু এতে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে।

ছোঃ। বিপদ বাদ দিয়ে মানুষ চলতে পারে কি কখনও। অতো ভয় কিসের। ওরা ভক্তিতে আসে না. ওরা আসে সমাজকে ফাঁকি দিয়ে জীবনকে কদর্যভাবে ভোগ করবার নেপথ্য স্থান খুঁজতে। ওদের আঘাত দিতে কষ্ট হয় না, কেমন যেন আনন্দ পাই।

সন্ধ্যায় চাঁদ ওঠেনি। আবছা আঁধার। সে আঁধার কেটে যাবে সত্বরই। চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। চলতে চলতে থেমে দাঁড়ালাম যোগপীঠ মন্দিরের সামনে। আবছা আঁধারে হীরের মত জ্বল জ্বল করছে মন্দিরের শীর্ষদেশ। আলোর

সাজ পরানো হয়েছে মন্দিরের সর্বাঙ্গে। কোন অজানা কাল থেকে এমনি করে মন্দিরকে সাজিয়েছে ভক্তের দল।

লতাহু দাঁড়িয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলাম, দাঁড়ালে কেন?

দেখছি। ভক্তির প্রাবল্যে যতই পুরাতন মনে করি না কেন, এ মন্দির বর্তমানের ছাপ গায়ে ছুপিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বললাম, হয়ত পুরাতনের স্থানে নতুন এসে স্থান করে নিয়েছে। পুরাতনের স্মৃতিকে নতুনের মাঝে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে মানুষ। তাই নতুনের আবির্ভাব হয়ে আসছে অনাদিকাল থেকে।

লতাহু প্রতিবাদ করল না যদিও নিজস্ব যুক্তিকে জোরদার করবার চেষ্টা অপরিসীম কিন্তু অপরের যুক্তিকেও সে অবজ্ঞা করে না কখনও। আলোক সজ্জিত শীর্ষকে দেখতে দেখতে এগিয়ে এসে বসলাম মন্দিরের সিঁড়িতে। দ্বিতল মন্দিরের আগাগোড়া তখন রূপের জৌলুসে হাসছে। সম্বিতহারার মতো বসেছিলাম। লতাহু যে পাশে বসে তাও যেন ভুলে গেছি।

কে সামনে দাঁড়িয়ে?

শ্রীগৌর-রাধামাধব! গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া। গৌর-লক্ষ্মীপ্রিয়া। ও কে? পঞ্চতত্ত্ব। দেখে আশা মিটছে না। মন্দিরের চেয়ে বিগ্রহ আরও বেশি সুন্দর। বিগ্রহ আছে বলেই তো মন্দির। সৌন্দর্যের আধার যে গৌর আর তার জীবনসঙ্গিনী। তাদের বিগ্রহই সৌন্দর্যের মূল। মন্দির তো তারই গৌরব ঘোষণা করছে। এ সৌন্দর্য আজকের নয়। কালজয়ী প্রচেষ্টা করেছে মানুষ মনের দেবতাকে সাজিয়ে রাখতে, তাকে জীবন্ত করে তুলতে। এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। হবেও না।

লতাহুর হাত ধরে নেমে এলাম সিঁড়ি থেকে।

এসে বসলাম, ক্ষেত্রপাল শিবের মন্দিরে।

কজন ভক্ত সেখানে জটলা করছিল। তাদের পাশেই জায়গা করে নিলাম। বেসামালে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যু হয়েছিল কি?

ফোঁস করে উঠল ওরা। বলল, প্রভুর পিতার মৃত্যু হয়নি।

মানে?

মৃত্যু হয় তোমার আমার। ওঁরা বেঁচে থাকেন চিরকাল। বেঁচে থাকেন মানুষের হৃদয়ে। ওঁরা দেহরক্ষা করেন মাত্র। ওঁদের ঐশ্বরিক ক্ষমতা ধারনের শক্তি নশ্বর দেহের থাকে না, তাই দেহরক্ষা করতে বাধ্য হন। ঐশ্বরিক ক্ষমতা বেঁচে থাকে চিরকাল, ওরা অজড় অমর।

বললাম, ভুল হয়েছে।

বৈষ্ণবের ওরকম ভুল হওয়া উচিত নয়।

লজ্জিত হলাম। সাজেব বৈষ্ণব যে কাজের বৈষ্ণব নয় তা বুঝতে একটুও বিলম্ব ঘটল না।

লতানু হাত ধরে টানল।

এলাম শ্রীবাস অঙ্গনে।

ভাবছিলাম।

লতানু জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছেন?

ভাবছি, ভাবছি আজকের কথা নয়। বহু দিন আগের কথা। ইতিহাসকাররা অস্পষ্ট করে রেখেছে সেদিনকার কথা। গৌর চলেছেন নাম সংকীর্তন করতে করতে। মুসলমান কাজী তা সহ্য করতে পারল না। পেয়াদাকে আদেশ দিল, ধরে নিয়ে এস নেড়ানেড়িদের।

ছুটল পেয়াদার দল।

গৌর চলছেন সদলে। খোল বাজছে, নামগান হচ্ছে। মুসলমান পেয়াদারা ঘিরে ফেলল সবাইকে। প্রভু তখন সমাধিস্থ। নামের মহিমায় প্রভু তখন বাস্তব পৃথিবীর বাইরে। পেয়াদারা যতবারই গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করছিল ততবারই তারা প্রভুকে হারিয়ে ফেলছিল। প্রভুকে ধরতে না পেরে খোল বাদককে চেপে ধরল। ভেঙ্গে দিল খোল। ভাঙ্গা খোল নিয়ে পেয়াদারা ফিরে গেল কাজীর কাছে।

কাজী চমকে উঠল।

ঐ যে শোনা যায় খোলের বাদ্য, নামের কীর্তন। কাজী উন্মাদের মতো ছোটাছুটি করতে লাগল।

আবার আদেশ দিল পেয়াদাদের, ধরে নিয়ে এস পাগলা নিমাইকে, কলমা পড়াও বেটাকে।

এবার খালি হাতে ফিরে এল পেয়াদার দল।

হুজুর, কাফেরটা যেন পাঁকাল মাছ। যতবার ধরতে গেছি হাত ফস্কে বেরিয়ে গেছে। ওর গায়েও হাত দিতে পারিনি।

কাজী তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। আদেশ দিল সব পেয়াদাকে কোতল করবার। আদেশ পালন করবার লোক পাওয়া গেল না। কাফেরের জয় দেখে কাজী উঠল ক্ষেপে।

তারপর ?

থেমে গেলাম।

লতাহু বলল, তারপর এই শুকনো মুড়ি চিবিয়ে রাত কাটাতে হবে। তার আগে আঙ্গিনায় বসে নাম শুনিয়ে দেই, কেমন !

বক্তব্য অসমাপ্ত রেখে ঝোলা থেকে খঞ্জনী বের করে দিলাম। গুপীযন্ত্রে বজন দিলাম।

লতাহু গান ধরল।

শ্রীবাস অঙ্গনে ভীড় জমে উঠল।

লতাহু নিজেকে হারিয়ে ফেলল গানের মাঝে, গাইতে লাগল :

হসত অপন পযোধর হেরি,
পহিল বদরি সম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ আগোয়ল অঙ্গ ॥
মাধব পেখল অপরুব বালা।
শৈশব যৌবন দুহু এক ভেলা ॥

অনেক রাতে গান থামল। কম্বল পেতে শোবার ব্যবস্থা করে নিলাম। খাবার ব্যবস্থা করবার আগেই অধিকারী এসে দাঁড়াল সামনে।

আমন্ত্রণ জানালো অধিকারী সেবা পাবার।

শুকনো মুড়ির চেয়ে অনেক ভালো।

লতাহু বলল, সেদিন রিহার্সেল দিয়েছিলাম ভাগ্যি, নইলে অনাহারেই কত রাত কেটে যেত।

খেয়ে এসে বসতেই লতাহু বলল, এখান থেকে পাত্‌তাড়ি ওঠাতে হবে এখুনি। এখানে রাত্রিবাস নিরাপদ নয়।

অজানা জায়গায় রাতের বেলায় কোথায় যাব ?

যেদিকে দু চোখ যায়। রাস্তা জেনে আসিনি, অজানা আমাদের পথ ও গন্তব্যস্থল। আমাদের যাত্রা অজ্ঞাত যাত্রা, এ কথা ভুলে গেছেন কি ?

লতাম্বুর কথায় তল্পীতল্পা গোটাতে বাধ্য হলাম।

জ্যোৎস্না রাত। চলছি দুজনে পাশাপাশি। লতাম্বু বলল, কাজীর কথা এখনও শেষ হয়নি। ক্ষিপ্ত কাজীর পরিণাম কি হল ?

কাজীর সমাপ্তি ওখানে ঘটেনি। অবশেষে কাজী হার স্বীকার করল, কাজী নিজেই খোল বাজাতো, প্রভু নামগান করতেন। ভক্তির কাছে শক্তির পরাজয় ঘটেছিল। যেখানে খোল ভাঙ্গা হয়েছিল আজও তাকে লোকে খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গা বলে স্মরণ করে, সেই সাথে স্মরণ করে প্রভুর মাহাত্ম্য আর কাজীর ঔদার্য।

লতাম্বু দেওয়াল ঘেরা জায়গা দেখিয়ে বলল, বড়ই নির্জন এই স্থান, এখানে রাত কাটালে কেমন হয়।

ছাউনি নেই মনে হচ্ছে।

ঐ বাঁধান স্থানটিতে বসেই রাত কাটাব।

এই শীতে, সহ্য হবে কি ?

শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়। জন্মবার কথা পিতামাতাও জানতেন না, তবে মরণের কথা পিতামাতা জন্মাবার সাথেই জানতে পেরেছিলেন, মৃত্যু যেখানে নিশ্চিত, জন্ম যেখানে কল্পনা সেখানে সহ্য এবং অসহ্য বলে কিছুই থাকতে পারে না। সেজন্য শীত গ্রীষ্ম সবই আমাদের কাছে সমান।

সকাল বেলায় চেয়ে দেখলাম, বিরাট গোলাপচাঁপা গাছের তলায় বাঁধানো কবরের পাশে বসে রাত কাটাতে হয়েছে। রাতের বেলায় টেরও পাইনি। গোলাপচাঁপা গাছটি আষ্টেপিষ্টে অক্টোপাশের মতো চেপে ধরে রেখেছে পুরানো কালের কোন ব্যক্তির সমাধিকে।

গরু নিয়ে রাখাল যাচ্ছিল মাঠে। জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কার সমাধি ?

আমাদের বেশভূষার দিকে চেয়ে বলল, চাঁদকাজীর।

চাঁদকাজী !

বাদশাহ হুসেন শাহকে যিনি পড়াতেন, যিনি খোল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন

নিমাই ঠাকুরের, সেই চাঁদকাজী। এটাই হল বামুনপুকুর এখানেই বল্লাল রাজার দুর্গ ছিল।

তুমি কি করে জানলে?

সবাই জানে। রাখাল গরু নিয়ে এগিয়ে গেল।

লতান্থ বলল, গোলাপচাঁপার গাছ দেখেছেন?

বললাম, হাঁ।

মানুষকে, মানুষের স্মৃতিকে কোলে করে রেখেছে ঐ গাছ। কত বছর হবে? হয়ত পাঁচশত, আরও বেশি। কিন্তু স্নেহালিঙ্গনে বেঁধে রেখেছে প্রীতির কেন্দ্রকে।

বললাম, তা হতে পারে।

ওটা কি? ঐ যে কতকগুলো উঁচু চূড়ো দেখা যাচ্ছে। ওখানে চলুন। এ বেলাটা ওখানেই কাটিয়ে দেব।

যেতে যেতে বললাম, চাঁদকাজীকে বেশ মনে রেখেছে এখানকার লোক।

মানুষের কাজ নিয়েই মানুষকে বিচার করা হয়। চাঁদকাজী খোল ভেঙেই যদি কাজ শেষ করতেন তা হলে তাকে মনে রাখবার লোক একটিও থাকত না। শতশত কাজী ডুবে গেছে, চাঁদকাজীও ডুবে যেত। একদিন গৌরাঙ্গের গলায় গলা মিলিয়ে, হাতে হাত মিলিয়ে চাঁদকাজী নামগান করে যে অপূর্ব ইতিহাস রচনা করে গেছেন, তারই জন্য নানা কথা, উপকথা, অলঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। চাঁদকাজী অমর হয়ে রয়েছেন গৌরাঙ্গের নামের সাথে।

বললাম, মানুষের ভালবাসাই কেবল তিনি পাননি, আরও অনেক বেশি পেয়েছেন তিনি। মাটি-মায়ের অকৃপণ স্নেহও পেয়েছিলেন। কোলে নিয়ে মাটি-মার পরিতৃপ্তি হয়নি, চাঁদকাজীকে আচ্ছাদন দিয়ে রেখে জানিয়ে দিয়েছে মানুষ ও মাটি-মার চিরায়ত মমত্ব বিকাশের ব্যাপকতা।

লতান্থ হাসল।

বললাম, এবার এগিয়ে চলো নিমাইতীর্থ নবদ্বীপে।

চলতে যখন আরম্ভ করেছি তখন চলবই। কিন্তু চলার শেষ হবে বলে তো মনে হচ্ছে না। পথের শেষ কোথায়?

যেখানে আরম্ভ সেখানেই শেষ। পৃথিবী গোলাকার, গোলাকার মানুষের

জীবন সমস্যা, তাই সমস্যার যেখানে আরম্ভ সেখানেই শেষ। যতই গতি তীব্র হোক, যতই এগিয়ে চলো, ফিরে আসতে হয় সেই পুরাতন সমস্যায়। সমাধান নেই। সমাধান হীন মানুষের জীবনচক্র শুধু মোহ সৃষ্টি করেছে। ক্রন্দনকে আচ্ছাদন দেওয়া হয়েছে হাসি দিয়ে। হাসির উচ্চগ্রাম ছাপিয়ে কাঁদার অশ্রু উপচে পড়ে। নিত্যই আমরা দেখছি চলমান নারীজনস্রোত, অথচ নারী দর্শন করতে পারছি না। দেখছি তাদের বেশভূষা, অঙ্গরাগ। যা দেখবার তা দেখা হয় না। যেদিন নারী দর্শন সম্ভব হবে সেদিন অপরে আঁতকে উঠবে, নইলে শ্রদ্ধায় মাথা নত করবে। মানুষের জীবনে বাহ্যিক দর্শনটুকুই সব নয়। তবুও হাসি দেখে ক্রন্দনকে ভুলে যাই। হাসি দেখলে ক্রন্দন দেখা হয় না, তাই সমস্যা যেখানে থাকে সেখানেই আমাদের ফিরে আসতে হয়। সেই কারণেই চলারও শেষ নাই, বলারও শেষ নাই। আরম্ভ ও সমাপ্তি এক সূত্রেই বাঁধা থাকে।

লতানু বাধা দিয়ে বলল, একটু তাড়াতাড়ি চলুন। পথ এখনও অনেক, আহার্য সন্ধানও একটা বড় কাজ।

বাক্যস্রোত বন্ধ করে এগোতে থাকি নীরবে।

ভাগীরথীর তীরে এসে পদসঞ্চালন সাময়িক বিরতিলাভ করল। উভয়েই বসলাম নদীর কিনারায়।

শীতে শীর্ণ কায়া ভাগীরথী। পাটনি ওপারে, তার আগমন প্রত্যাশায় বসে রইলাম ঘাটে।

ওপারে নবদ্বীপ।

নয়টি দ্বীপের সমাহার ঘটেছিল কোন কালে তাই সমাসান্তপদ নবদ্বীপের সৃষ্টি। ইতিহাস ঠিক স্পষ্ট নয়। লতানুকে জিজ্ঞাসা করলাম, এর নাম নবদ্বীপ কেন বলতে পার?

ওটা ইতিহাসের সমস্যা। আমাদের নয়। শোনা কথার দামতো নেই। শুনেছিলাম কোন তান্ত্রিক আরাধনা করত নয়টি দীপ জেলে তাই এর নাম দেওয়া হয়েছিল নবদ্বীপ।

হেসে বললাম, বৈষ্ণবরা কিন্তু বলেছে, "নবদ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত হয়।"

কিন্তু নবদ্বীপের জন্ম হয়েছিল বৈষ্ণব কবির জন্মের কয়েকশত বৎসর আগে। তখন মহাপ্রভুও জন্মেন নি। সেনরা গৌড় থেকে এসে এখানে

মাঝে মাঝে অবসর যাপন করত। তাদের দেওযা নামের সাথে বৈষ্ণব কবিদের নামেব মিল কতটা তা আজ আর জানবার পথ নেই।

বাধা দিয়ে বললাম, পাটনি এসেছে, চলো ওপারে যাই।

গঙ্গায় স্নান কবে নিলে হত না।

ওপাবেও তো গঙ্গা।

এতো নিবিবিলি নয়। ঐ বাঁকটায় গিয়ে নেয়ে আসি। আপনি বসুন।

লতাসু নাইতে গেল। গাছের গুডিতে হেলান দিয়ে বসলাম, ঝিমুনি এসে গেল। কে যেন কথা বলছে কানের কাছে। তাকিযে দেখলাম, না কেউ নয়। শেফালি নয়। আবাব ঝিমিয়ে পডলাম।

কে দাঁডিযে সামনে? পক্ষধর মিশ্র।

আপনি কেন?

তোমাকে দেখতে এলাম। শেফালির মাযা ত্যাগ কবতে পাবনি, তাই দুঃখ হচ্ছে।

মায়া ত্যাগ সম্ভব কি?

কেন নয়। আমরা তো পেবেছি, তুমিই বা পাববে না কেন?

আপনি ভালবাসতে ভুলে গেছেন।

ভুল। ভাল তুমিও বাসনি। তুমি মনে করছ, একজনকে ভালবেসেছি। আমি হয়ত একজনকে ভালবাসি নি। ভালবেসেছি সবাইকে। চেযে দেখ, ঐ আসছে মহেশ্বব বিশাবদের পুত্র বাসুদেব, আসছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যযন করতে। আমি জয়ধব মিশ্র-পক্ষধব, বাসুদেব আমার শিষ্য, জ্ঞানক্ষেত্রে সার্বভৌম। এমন দিন ছিল যখন ন্যায়শাস্ত্রের গবিমা ছিল মিথিলার। সেই গবিমা চূর্ণ কবে দিয়েছিলাম আমি। বাসুদেব আমাবই মন্ত্র শিষ্য, শল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলে খ্যাত হয়েছিল।

শল্য পরীক্ষা। সে আবার কি?

শল্য পরীক্ষার সূত্র হল সূক্ষ্মাগ্র লৌহ শলাকা ক্ষেপন কবা। এই ক্ষেপন শেষ যে গ্রন্থ-পত্র ভেদ করবে, সেই পত্রে যে জটিল সমস্যা থাকবে তারই বিচার করা হবে। তোমাদের লটারির মতো। আমার শিষ্য বাসুদেব শতশলাকা পত্র বিচার করে কৃতী বলে পরিচিত হয়েছিল তাই সে সার্বভৌম। পারবে তুমি?

না।

পারবে না, কেননা ত্যাগ তোমার ধর্ম নয়। ভোগের বঞ্চনা তোমার নিজস্ব সম্পদ, আলেয়া তোমার পথ দর্শক। মহাপ্রভু মহান কেন, জানো? ঐ ত্যাগ। মহাপ্রভুর ঘরে এলেন বল্লভাচার্যের রূপবতী কন্যা লক্ষ্মীদেবী। সর্প দংশনে দেবী দেহত্যাগ করলেন। লক্ষ্মী-হারা নিমাই বুঝল সংসারের নশ্বরতা। অনিত্য পৃথিবীর ওপর এল বিতৃষ্ণা। শচীদেবী লক্ষ্য করলেন নিমাইয়ের বিরাগ। আবার ঘরে আনলেন সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণু-প্রিয়াকে। নিমাই বাঁধন মানল না। উদ্ভিন্ন যৌবনে ত্যাগ করলেন যুবতী ভার্যাকে, পথ বেছে নিলেন মানব মুক্তির। এই ভালবাসা তো ব্যক্তি কেন্দ্রিক ছিল না। তাই মানুষের দেবতাকে মানুষ আকুল আহ্বান জানিয়েছে, সাদরে গ্রহণ করেছে, যুগযুগান্ত ধরে সশ্রদ্ধ ভাবে স্মরণ করছে এই ত্যাগীকে, মানব সমাজ ধন্য হয়েছে। মোহ ত্যাগ করে শেফালিকে দেখতে শেখ মানুষের সমাজে, যে ভালবাসা তার প্রাপ্য, সেটুকু বিলিয়ে দাও সবাইকে।

কে যেন গায়ে ধাক্কা দিল।

ও গোঁসাই, উঠুন। ঘুমোচ্ছেন কেন। লতানুর ডাকে ঝিমুনি ছুটে গেল।

বললাম, স্নান হয়েছে।

দেখতেই পাচ্ছেন। ঘুম আপনার বড়ই অনুগত, না ডাকতেই আসে। উঠুন, চলুন ওপারে।

বসেই রইলাম। বললাম, লতানু দিবা স্বপ্ন দেখছিলাম। কে একজন মহাপণ্ডিত এসেছিলেন, তিনি বললেন, নিজেকে বিলিয়ে দাও সবার মাঝে। মোহ মুক্তি ঘটাও, শেফালির মোহ ত্যাগ কর।

আমার কথা শুনে লতানু কোন মন্তব্য করল না। নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে বসে বসে কি যেন ভাবতে লাগল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি ভাবছ লতানু?

ভাববার কি শেষ আছে। আচ্ছা, আপনি শেফালি বউদিকে ভুলে যেতে পারেন কি। পারেন, খুব পারেন। স্মৃতি ধীরে ধীরে দুর্বল হবে, শেফালি বউদি আপনা থেকেই মন থেকে মুছে যাবে। প্রথম যেদিন শেফালি বউদিকে হারালেন সেদিন যে ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছিল, আজ সে

ব্যাকুলতা নেই। আছে কি তা? না নেই। তা হলেই বুঝুন। মোহমুক্তির প্রযোজন হয়না, মোহের মুক্তি ঘটে স্বাভাবিক ভাবে। ব্যক্তি কেন্দ্রিক ভালবাসা সর্বক্ষেত্রে মোহ নয়। কর্ম জগত থেকে যখন মানুষ ফিরে আসতে চায ঐ ব্যক্তি কেন্দ্রে অপর সব কিছুকে উপেক্ষা করে তখনই তা মোহ। ত্যাগ ভোগীর ধর্ম অথবা কাপুরুষের। সৃষ্টির উদ্দেশ্য সংযত ভোগের, ত্যাগের নয়।

আমি নীরবে শুনছিলাম।

বললাম, আমিও স্নান করে নিচ্ছি।

লতানু বলল, শুভ বুদ্ধি।

স্নান শেষ করে আসতেই লতানু বলল, চলুন।

ওপারে নৌকা ভিড়তেই লতানু গুন গুন করে গান ধরল। আমি পেছন পেছন নেমে এসে বেলাভূমিতে পা দিতেই মনে হল নতুন জগতের সাথে পরিচয ঘটল। বিকেলের পড়ন্ত বেলার রোদ এসে পড়েছে লতানুর মুখে। লতানু যে এত সুন্দর তা কখনও খেয়াল করিনি। তার গৌর বর্ণে যেন সোনালী ছাপ লেগেছে। বৈষ্ণবীর ভূষা ভেদ করে আসল মানুষটির পরিচয় ফুটে বেরিয়েছে। কে যেন বলতে চাইছে ইঙ্গিতে, লতানু নারী, তার ক্ষুদ্ধ নারীত্বের হাতছানি বুঝবার তোমার সামর্থ্য নেই। লতানুকে নারীরূপে আজই যেন প্রথম দেখলাম। বিস্ময বিমুগ্ধ দৃষ্টির সামনে লতানু বুঝি শঙ্কিত হযে উঠল।

আমাকে অপলকে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে লতানু গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছেন?

তোমাকে।

প্রতি নিয়তই তো দেখছেন, নতুন করে দেখবার কি আছে?

এতদিনকার দেখা যেন অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, আজ মনে হচ্ছে আসল লতানুকে দেখতে পেযেছি। এতদিন যে লতানুকে দেখেছি সে লতানু মেকি লতানু।

কিসে? রূপে না গুণে?

দুটোই। তবে আজ দেখছি রূপ। এই রূপ হৃদয় ভেদ করে দেহে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তুমি যে এতো সুন্দর তাতো কোনদিন ভাবিনি। হৃদয়ের

রূপ গুণের নামান্তর, নামান্তরিত গুণ দেহে আশ্রয় নিয়েছে রূপের পরিচয়ে।

লতাফু উত্তর দিল না।

আমি লজ্জিত হলাম। অজ্ঞাতে তার ভাব প্রবণতাকে অপমান করেছি বলেই মনে হল। লতাফু এগিয়ে চলল। আমি চলতে পারলাম না। শঙ্কা ও সরম দুটোই আমাকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করেছে। বালির বুকে বসে পড়লাম। লতাফু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়েই চলেছে। বালির চর ভেঙ্গে কিনারায় উঠে তার খেয়াল হল। গোঁসাই পেছনে রয়েছে একথা স্মরণ করেই বোধহয় থেমে গেল। ফিরে তাকাল, দাঁড়িয়ে রইল, আবার চলতে লাগল সম্মুখে। হঠাৎ মোড় ঘুরে নেমে আসল ত্বরিত পদে। সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, বসে আছেন কেন?

উত্তর দিতে পারলাম না।

খিলখিল করে হেসে উঠল লতাফু। তার হাসির প্রচণ্ড ধাক্কায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল আমার কর্ণমূল।

সহজ সরল ভাবে বলল, মহা অন্যায় করে ফেলেছেন, নয় কি?

তবুও উত্তর দিতে পারলাম না।

লতাফুর রূপ দেখবার অবসর পেয়েছেন, এইটেই লতাফুর সৌভাগ্য। রূপ ধুয়ে জল খেয়ে তো পেট ভরবে না। রূপকে দেখবার মতো করে সাজাতে হয়, তা পারবেন কি? রূপো না হলে রূপের কদর থাকে না। রূপো যখন নেই তখন রূপ দেখা নিরর্থক। চলুন।

লতাফুর আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারলাম না। তার পেছন পেছন চলতে থাকি। বালির চর পেরিয়ে কিনারায় দাঁড়ালাম।

আবার চলছি।

এসে উঠলাম পোড়ামা তলায়।

সন্ন্যাসী বৃহদ্রথ এখানে থাকতেন। দেবীর আশীর্ব্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু দেবী তার আশ্রয়ে থাকতে রাজি হন নি। অভিমানী সন্তান অনাহারে দেহত্যাগ করতে কৃতসঙ্কল্প দেখে দেবী আত্মপ্রকাশ করে প্রতিশ্রুতি দিলেন, প্রতিদিন দুই দণ্ড কাল তিনি বাস করবেন তাঁর ভক্ত

সন্তানের গৃহে। বৃহদ্রথ স্থাপন করল জগন্মাতার ঘট, দেবীর তুই দণ্ড আগমন প্রত্যাশায়।

তারপর কত শতাব্দী পেরিয়ে গেছে।

বাসুদেব সার্বভৌম ঘটটি এনে স্থাপন করেছিলেন এই বর্তমান মন্দিরের পাশে ঐ বটগাছ তলায়। বাসুদেব দেহত্যাগ করলেন। দেবী আরাধনার কোন ত্রুটি কখনও হয়নি। কালক্রমে দেখা দিল অনাচার। দেবীর অভিশাপ নেমে এল, আগুন লাগলো আচ্ছাদনকারী বৃক্ষে। নবদ্বীপের মানুষ হাহাকার করে উঠল। মায়ের পূজায় অনাচার ঘটেছে দেখে সবাই আশঙ্কিত হল। পুড়ে গেল দেবীর ঘটের আচ্ছাদন, নতুন আচ্ছাদনের চিন্তা করে ব্যাকুল হয়ে উঠল নবদ্বীপের অধিবাসীবৃন্দ। ভক্তজন নির্মান করল এই বিরাট মন্দির, অনাচারের প্রায়শ্চিত্ত্য করল তারা। দেবীর ঘটের নতুন আচ্ছাদন তৈরী হল।

মন্দিরের আঙ্গিনায় পা দিয়ে লতাম্ব বলল, অনাচার এখানে সহ্য হবে না।

জানি।

আরও একটু জানা দরকার। অনাচার হল আচারের সঙ্গী। নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমান তার অনাচার বহুল জীবন যাত্রা। অনাচার না থাকলে নবদ্বীপ এত বড হবার সুযোগ পেতনা। আচার ও অনাচার পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে নবদ্বীপের জীবন পথে মন্থর গতিতে চলেছে।

বোধহয় তাই। আছে বলেই নাই বুঝায়। বাসুদেব সার্বভৌমের চতুষ্পাঠী নেই, তার সেই বটগাছও নেই, নতুন করে চতুষ্পাঠী গড়েছে অপরে, নতুন করে বটগাছ গজিয়েছে দগ্ধমুলে, নতুন জীবনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলছে নবদ্বীপের নতুন মানুষের দল।

নাট মন্দিরে এসে বসলাম, বৈষ্ণব রাজ্যে শক্তির ঘট পূজার বিরাট আয়োজন। নবদ্বীপকে যারা বৈষ্ণবের কেন্দ্রমণি বলে দাবী জানায় হয়ত তারা জানে না বৈষ্ণবীয় চিন্তাধারা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বার অনেক আগেই বাঙ্গলার শাশ্বতশক্তি আরাধনার কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ। পোড়ামা তলার ঘট শক্তি ও বিষ্ণুর সম্মিলিত ভাবধারার উৎস। বলতে হয়, শক্তি ও বিষ্ণুর সহাবস্থান।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে।

বাদ্য বেজে উঠল। দেবীর আরতী শেষ হল। আমার হাত ধরে লতাসু বলল, চলুন। নবদ্বীপ হল উৎসবের রাজ্য। এ রাজ্যে একস্থানে বসে থাকা মূর্খতা। উৎসবে অংশ গ্রহণই এখানকার কাজ। এমন দিন নেই যেদিন উৎসব নেই নবদ্বীপে।

বললাম, আমি বড় ক্লান্ত। ক্লান্তিতে দেহ ভেঙ্গে পড়েছে। আজ এই নাটমন্দিরে রাত কাটালে কেমন হয়?

অনিচ্ছার সাথে লতাসু এসে বসল নাটমন্দিরে। সন্ধ্যার টিমটিমে আলো নিভে গেছে। আকাশে ধীরে ধীরে চাঁদ দেখা দিল। চৌকোনা মন্দির শীর্ষ চাঁদের আলোয় ঝলমল করতে লাগল।

লতাসু স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, খুবই ক্লান্ত বুঝি?

খুব না হলেও কম নয়। দেহের চেয়ে মনটা ক্লান্ত বেশি। এতটা হতাম না, দিবা স্বপ্ন যেন আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে গেছে।

লতাসু হাসল। দেখতে পেলাম না, শব্দটা শোনা গেল। ঠাট্টার সুরে বলল, আমার বলও নেই, বালাইও নেই। চলুন বিষ্ণুপ্রিয়ার মন্দিরে গিয়ে বসি। ওখানে নামগান হচ্ছে?

ডাকলাম, লতাসু।

যেতে আপত্তি আছে।

স্বভাবতই। দেবী মহাপ্রভুকে হারিয়ে তার স্মৃতির ফলক বসিয়ে গেছেন, কিন্তু আমি কিসের স্মৃতি বহন করছি তাতো তুমি জানো। ত্যাগের আনন্দ আমার নেই, অস্বীকার করবার সামর্থ্যও আমার নেই। বিরহ বেদনাহীন ঐ স্মৃতিমন্দিরে আমার স্থান নেই।

ক্ষুব্ধস্বরে লতাসু ডাকল, গোঁসাই।

বললাম, গৌর প্রভুর বিগ্রহে দেবত্ব রয়েছে, রক্তমাংসের মানুষের ভুল-ত্রুটিগুলো ফুটে ওঠেনি। দেবতার সামনে ভুলে ভরা মানুষ সঙ্কুচিত হয়, মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না।

মহাপ্রভুকে দেবত্ব দান না করে সাধারণ মানুষরূপে চিন্তা করুন। মানুষের মহামানবীয় গুনই তাকে দেবত্ব দান করে, কিন্তু ত্রুটিগুলো কোথায় টেনে নিয়ে যায় তা ভেবেছেন কি? মহাপ্রভু মানুষের প্রভু কিন্তু দেবীর কাছে তিনি সর্বত্যাগী দেবতা নন। যুগ সন্ধিক্ষণে মহাপ্রভুর আগমন ছিল সমাজব্যবস্থার

প্রতি আশীর্ব্বাদ, ঠিক একই সময়ে দেবীর পক্ষে তিনি ছিলেন দায়হীন মানুষ যিনি সংসারের ভার বহন করবার অনুপযুক্ত। মানুষের বিষয়-চিন্তা মহাপ্রভুকে দেবত্বের আসনে বসাতে ইতস্তত করেনি, ত্যাগধর্ম তাকে দেবত্ব দান করেছে, বরং সেই গৌরাঙ্গকে চিন্তা করুন, যিনি ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বামী, তাহলে সঙ্কোচ আর থাকবে না। তাই সঙ্কোচ যাকে মনে করছেন তাকে মনে হবে মানসিক বিকার মাত্র। তার সবগ্রাহ্য প্রেম মানুষকে তার উপযুক্ত আসনে বসাবার সুযোগ দিয়েছে, হীনকে শ্রেষ্ঠত্বদান করেছে, তাই তিনি দেবতা। এ দেবত্ব মহামানবত্বেরই রূপান্তর। মহামানবের পাদমূলে সঙ্কোচের কোন স্থান নেই। শঙ্কা-সঙ্কোচ বাদ দিয়ে চলুন সেখানে।

কে যেন হেসে উঠল অন্ধকার গলির কোনায়। লতানু থেমে গেল। জিজ্ঞাসা করল কে ওখানে ?

আমি গো আমি।

তুমি কে ?

চেন না। ভালই হয়েছে। চিনলে কষ্ট পেতে। আমার মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হত। আমি রঘু ভট্চাজের মেয়ে। স্মৃতির পাতি দিয়ে গেছেন যে রঘুনন্দন, আমি তারই মেয়ে। মোছলমানে টেনে নিয়ে গেল, জাত গেল। কেবল জাত দেবার ব্যবস্থা রঘু ভট্চাজ করে নি, জাত মারবার ব্যবস্থাও করে গেছেন। হি-হি-হি !

হাসি থামবার আগেই আমরা পা বাড়ালাম এগিয়ে চলতে। ডাক শুনলাম, দাঁড়াও, দাঁড়াও।

দাঁড়িয়ে গেলাম।

কোথায় যাচ্ছ ? হরি ঘোষের গোয়ালে ? ন্যায়শিরোমণি রঘুনাথ পণ্ডিত হয়ে এসে জায়গা পেল না টোল খুলবার। হরি ঘোষ ডেকে বলল, ও ঠাকুর, আমার গোয়ালে গরুকে পাঠ দাও, তার বেশি বিদ্যা তো তোমার নেই।

রঘুনাথ তামাসা বুঝল। তবুও গোয়াল ঘরেই খুলল তার টোল। শিষ্যরা গিস্ গিস্ করতে থাকে। তাদের চিৎকারে নবদ্বীপের মানুষ ঘুমোতে পায় না। তারা প্রহারের উদ্দেশ্যে ঠেংআ নিয়ে ছুটে এসে আবার ফিরে যায়। হরি ঘোষের গোয়ালে গরু পড়িয়ে মানুষ করল রঘুনাথ। তাই না লোকে বলে হরি ঘোষের গোয়াল।

ওকি আবার যাচ্ছ? দাঁড়াও। বুনো ঠাকুরের গিন্নি তোমাদের ডেকেছেন তিন্তিরি পাতার ঝোল খেতে। ঝোল খেয়ে এসো। নইলে নদে আসার ফললাভ হবে না। মহারাজা কেষ্টচন্দোর তা জানত, তাই 'না বুনো রামনাথের পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিয়ে ধন্য হয়েছিল। হি-হি-হি।

হাসির শব্দে চমকে উঠলাম। লতাম্বুও কেমন যেন ঘাবড়ে গেল।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে চারিদিক।

বললাম, আজ কি তিথি।

লতাম্বু বলল, জানিনা।

পূর্ণিমায় জন্মেছিলেন মহাপ্রভু। আমিও। একই দিনে দুটো মানুষ জন্মেছিল, একই সময়ে, এরকম লক্ষ মানুষ হয়ত জন্মেছে ঐ একই দিনে এবং সময়ে, অথচ সেই মানুষটি কেউ হতে পারেনি। একেই বলে বিধিলিপি।

লতাম্বু জবাব দিল না। টানতে টানতে নিয়ে চলল বিষ্ণুপ্রিয়ার মন্দিরে।

মন্দিরে এসে লতাম্বু বসল মন্দিরের সিঁড়িতে। নিরিবিলি আবছা আলো দেখে আঙ্গিনার শেষ কোনায় কম্বল বিছিয়ে ছাউনির তলায় বসলাম। নামগানের স্রোত বেয়ে চলেছে। নাম শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঊষার আলো চোখে লাগতেই জেগে উঠলাম। লতাম্বুকে মন্দিরের সিঁড়িতে দেখে এসেছিলাম। ঘুম ভাঙ্গতেই তার কথা মনে পড়ে গেল। চেয়ে দেখলাম, কোথাও তাকে দেখা গেল না।

ধীরে ধীরে উঠে এসে দাঁড়ালাম মন্দিরের সামনে। উপরের সিঁড়িতে মাথা রেখে নীচের সিঁড়িতে বসে লতাম্বু ঘুমুচ্ছে। সারা রাত ঠাণ্ডা হাওয়াতে জমে যাবার উপক্রম তবুও তার ঘুম ভাঙ্গে নি। সকালের আলো এসে পড়েছে তার মুখে। খামচানির কালো দাগগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চাঁদের কলঙ্ক। ভাবনাবিহীন একটা মানুষ যেন পরম পরিতৃপ্তিতে বিশ্রাম নিচ্ছে। ভাবছিলাম ডেকে তুলব। ডাকতে মায়া লাগল। ঘুমোক। ধীরে ধীরে এসে বসলাম পুরানো স্থানে। সেখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম তাকে। সূর্য উঠল। সকালের সোনালী রোদ এসে পড়েছে তার মুখে। তার গৌর বরণে ছলকে উঠছে জীবনের মাধুরী, সকল সুধার ঢেউ।

লতাসু চোখ মেলে দেখলো। ধীরে ধীরে উঠে এসে খুঁজতে লাগল আমাকে। দেখতে পেয়ে ত্বরিত পদে এসে দাঁড়াল সামনে।

আপনি এখানেই ছিলেন? সাগ্রহ জিজ্ঞাসা তার কণ্ঠে ও দৃষ্টিতে। উত্তর দিলাম না। ব্যাকুলভাবে আবার বলল, কত যে খুঁজলাম।

উত্তর দিলাম না।

লতাসুর চোখে জল। আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকল।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কাঁদছ লতাসু?

লতাসু উত্তর দিল না।

ভেবেই পেলাম না, এই সেই লতাসু কিনা। এই লতাসুই আমাদের গলায় হাঁসুয়ার আঘাত দিয়ে পালিয়ে এসেছিল কি? এই লতাসুই কি আমাদের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেও হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে নি? ভেবেই পেলাম না।

চোখ মুছে ধরা ধরা গলায় লতাসু বলল, চলুন। এখনও অনেক দেখার কি, অনেক পথ বাকি। তাড়াতাড়ি না হলে সীমান্তে পৌঁছাতে পারব না।

স্টেশনের পথ ধরলাম। লোকালয় ছেড়ে কিছুটা পথ এগিয়ে যেতেই লতাসু গুন্ গুন্ করে পদাবলী আওড়াতে লাগল। কান পেতে ভাল করে শুনতে থাকি।

লতাসু গান করছিল:

নবদ্বীপ হেন প্রেম ত্রিভুবনে নাই।
যাঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোঁসাই॥

আরও এগিয়ে চলেছি। স্টেশনের ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। লতাসুর গুনগুনানি থেমে গেল। এতটা পথ ভাবতে ভাবতে এসেছি, নবদ্বীপ তো মন্দিরের গ্রাম নয়, নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠত্ব তথাকার জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে। বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, রামভদ্র সার্বভৌম, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতি দেশবিশ্রুত পণ্ডিতেরা একসময় নবদ্বীপকে অলঙ্কৃত করেছেন, এই হল নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠত্ব। আর সর্বাধিক গৌরব হল নবদ্বীপ মহাপ্রভুর জন্মভূমি।

লতানু গুনগুনানি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছেন ?

তোমার গান শুনছিলাম।

লতানু হেসে উঠল, বলল, আমার গানের কাঙ্গাল আপনি নন। আপনি অন্য কিছু ভাবছিলেন।

কিছু খাবার সংগ্রহ করে স্টেশনে এসে বসলাম। গাড়ির তখনও অনেক দেরী। মুড়ি মুড়কি চিবোতে চিবোতে বললাম, এবার কোথায় যাবে ?

লতানু হেসে বলল, যেদিকে চোখ যায়। যেদিক থেকেই গাড়ি আসুক, যে গাড়ি প্রথম আসবে তাতেই উঠে বসব।

বরহাবোয়া যাবার গাড়ি এল সবার আগে।

লতানু বলল, এতেই উঠুন।

লতানু পোঁটলা-পুটলি সমেত আমাকেও টেনে তুলল গাড়িতে। টিকিটের জন্য লতানু মোটেই ব্যয় করতে রাজি নয়।

জিজ্ঞাসা করলাম, টিকিট নিলে না ?

চুপ করে বসুন।

গাড়িতে চেক হচ্ছে।

সে দায় আমার।

দায় মাথায় নিয়ে লতানু কখনও পেছয় নি। পুরুষরা বৈষয়িক বুদ্ধিতে মেয়েদের তুলনায় অবলা। মেয়েরাই যেন বেশি ডাঁটো। লতানুর ওপর দায় চাপিয়ে নিশ্চিন্তে বসে রইলাম।

টিকিট ?

লতানু খাঁটি পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় বলল, নেই। টিকিট করবার পয়সা কোথায় পাব ?

নেই বললে তো হয়না। তা হলে নেমে যাও।

ওরে বাবা, দেশের মোছলমান তাড়িয়েছে, এখানে হিঁদুরাও তাড়াচ্ছে। কোথায় যাই বলতে পারেন ?

চেকার থেমে গেল। বোধহয় তার হৃদয়ের কোন দুর্বল অংশে আঘাত দিল। বলল, কোথায় যাবে ?

ঠিক নেই, যেখানে গেলে খেতে পাব, মাথা গুঁজবার জায়গা পাব সেখানেই যাব।

ওপারে সরকারী ক্যাম্প আছে, সেখানে যাওনা কেন। লালবাগে নেমে নদী পেরিয়ে ওপারে যাও।

তাই যাব।

চেকার উপদেশ দিয়ে নেমে গেল।

লালবাগ রোড আসতেই লক্ষ্মী হাত ধরে টানতে টানতে নেমে পড়ল তল্পীতল্পা নিয়ে।

মাঝ রাস্তায় নেমে কি লাভ?

চেকার আবার যদি আসে তখন ছাড়বে না। বলবে, তোমাদের লালবাগ যেতে বলেছি, শোন নাই কেন।

অগত্যা আবার হাঁটা পথ।

আমগাছ তলায় বসে বিশ্রাম নিতে হল।

বললাম, এপারেই খোসবাগ।

খোসবাগ। চলুন দেখে আসি। বাংলার নবাবরা ঘুমিয়ে আছে সেখানে। চলুন দেখে আসি সে ঘুম ভেঙ্গেছে কিনা।

সে অনেক দূর।

হলই বা দূর। বাংলার মানুষ যদি খোসবাগ না দেখে তা হলে নিরর্থক তাদের জন্ম।

চলতি লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করতে করতে চলেছি। হতচ্ছাড়া রাস্তায় হোঁচট খেতে খেতে চলেছি। দুজনেই বাক্যহীন।

এসে দাঁড়ালাম খোসবাগ।

আলিবর্দীর দুলাল শুয়ে আছে খোসবাগের সমাধিতে, পায়ের কাছে শুয়ে আছে লুৎফা। বাংলা বিহার উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব আর তার বেগম। নকীব আর হাঁক দেয় না, শান্ত্রীরা আর পাহারা বসায় না।

কই নকীব কোথায়?

না কেউ নেই।

আছে শুধু মৃতের প্রহরী এই অন্ধ ভগ্ন সমাধি মন্দির। সাধারণ মানুষের ভালবাসাটুকুই এ পেয়েছে, আর পেয়েছে অসাধারণ মানুষের কাছ থেকে লাঞ্ছনা।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, হীরাঝিলে হীরার চমক তো নেই।

চমকে উঠলাম। দেখলাম দৃষ্টি মেলে, না কেউ নেই, কিছুই নেই, আছে শুধু স্মৃতির বেদনা।

দুজনে বসলাম সিঁড়িতে।

মালী এসে দাঁড়াল সামনে।

জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কোথাও দোকান আছে?

আছে, ঐ ওখানে।

ভাগীরথীতে হাত পা ধুয়ে দোকানের দিকে চললাম।

লতাহু বলল, কেমন দেখলেন?

দেখলাম? কি, বাড়ি না স্মৃতি?

যেটাই হোক।

বাড়ি বললে বলতে হয় এত বড় নবাবের অনুপযুক্ত এই সমাধি বাড়ি। আর স্মৃতি বললে বলব, অপূর্ব মানুষের ভালবাসা।

লতাহু বলল, ভাবাবেগ আশ্রয় করেছেন দেখছি। সেদিনের মুর্শিদাবাদকে চিন্তা করুন। সেদিনের মুর্শিদাবাদ সিরাজকে ভালবাসেনি। তার সুদ আর আসল উশুল করেছে আজকের সারা বাংলার মানুষ। সেদিন সিরাজ যেমন ছিল ভাগ্যান্বেষীর বংশধর, মীরজাফরও তেমনি ছিল ভাগ্যান্বেষী। মীরজাফর যদি জানত, ইংরেজ তাকেও গ্রাস করবে তাহলে সত্যিই পলাশীর অভিনয় হত কিনা সন্দেহ। ভারতীয় মুসলমানী প্রথায় একে অপরকে হত্যা করে যেমন চিরকাল ক্ষমতা দখল করেছে, তেমনি ঘটেছিল সেদিনও। মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক, সেই বিশ্বাসঘাতকতার চরম পরিণতি সহ্য করতে হয়েছে তাকে। যদি ইংরেজ বাংলা দখল না করত তা হলে ইতিহাস হয়তবা অন্য ভাবে লেখা হত। তাই বাংলার ঋণ রয়েছে সিরাজের কাছে। ভালবাসার কাঙ্গাল সিরাজকে অফুরন্ত ভালবাসা ঢেলে দিচ্ছে বাংলার মানুষ। আর মীরজাফর পাচ্ছে অফুরন্ত ঘৃণা। কে জানে ইতিহাস কি বলবে, আমি বলব সেই সময়ের রাজনীতিতে ইংরেজের ভূমিকা মীরজাফরের সমতুল্য হলেও দেশের লোক ইংরেজকে স্বীকার করতে দ্বিধা করেনি, কেননা সাধারণ মানুষের সাথে সিরাজ অথবা মীরজাফরের উত্থান পতনের এবং ইংরেজের ক্ষমতা দখলের কোন সম্পর্ক ছিল না। সেই কারণেই রাজনীতির খেলায় আজকের মানুষ যেমন আশ্রয়ের সন্ধানে পথে পথে দৌড়াচ্ছে, সেদিনকার

মানুষকে তা করতে হয়নি। পরধর্ম সম্বন্ধে অসহিষ্ণু শাসকদল সাতশত বৎসরে যে ক্ষতি না করেছে, তার সহস্রগুণ বেশী ক্ষতি করেছে তাদের বর্তমান বংশধররা।

লতাম্নু গর-গর করে কথাগুলো শেষ করে আরও কিছু বলবার জন্য মুখ খুলবার আগেই তাকে বাধা দিয়ে বললাম, আর দেরী করে লাভ নেই। সন্ধ্যা না পেরোতেই আমাদের নদী পার হতে হবে। নদীর কিনারায় বাঘ শেয়ালের হাতে প্রাণ দিতে নিশ্চয়ই তুমি ইচ্ছুক নও।

আজ ওপারে যাওয়া হবে না, বলেই লতাম্নু হাসল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? এই স্মৃতি মন্দিরে রাত কাটাবে বুঝি? মন্দ নয়। সিরাজ নেই, লুৎফা নেই, তাদের সমাধিতে রইব আমি আর তুমি। সিরাজের পায়ের তলায় শুয়ে আছে লুৎফা, পাশে শুয়ে আছে মির্জা মেহেদি। বর্বর ক্ষমতাপ্রিয় মানুষের বর্বরতার সাক্ষ্য দিতে এরা রয়েছে মৌন ব্যথার অভিব্যক্তি নিয়ে। আজকের এই সভ্য জগতে এই নৃশংসতা ভাবতেও কষ্ট হয়। গদীর লোভে যারা সিরাজকে মেরেছিল তারা একটু অনুকম্পা প্রদর্শন করতে পারত কিশোর মির্জা মেহেদীর প্রতি। তার অপরাধ, সে সিরাজের সহোদর। এই অপরাধে দুখানা কাঠের তক্তায় দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে পিষে মারা হয়েছিল তাকে। বিন্দু বিন্দু করে তার রক্ত মোক্ষণ করা হয়েছিল। ঘাতকের তরবারির একটি আঘাতে যাকে নিস্তব্ধ করে দেওয়া যেত তাকে পিষে মারবার মতো যে জহ্লাদ সেই মীরণকেও ফাঁসির দড়ি গলায় জড়িয়ে মরতে হয়েছে। মার্জনা সে পায়নি। কে কাঁদে?

না কেউ নয়। বাতাসের শব্দ।

না লতাম্নু, ওটা ক্রন্দনের শব্দ। বাতাস কাঁদছে, আকাশ কাঁদছে, প্রকৃতি কাঁদছে, তারই প্রতিধ্বনি কানে এসে বাজছে। ওটা ক্রন্দন, ওটা ক্রন্দন, বলতে বলতে দম ধরে বসে রইলাম।

লতাম্নু আবেগের সাথে বলল, ইতিহাস বড়ই সত্য। সরফরাজকে হত্যা করে আলীবর্দির উঠে বসেছিল গদীতে, সে গদীও শান্তির ছিল না। আলীবর্দির দুলাল সিরাজকে দিতে হল সরফরাজের মৃত্যুর বদলা। বিশ্বাস-ঘাতক মীর্জাফর বদলা পেল মীরকাশিমের হাত। ইংরেজকেও বদলা দিয়ে

যেতে হয়েছে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা কোথাও ক্ষুন্ন হয়নি। তাই আপনি কাঁদার আওযাজ শুনতে পাচ্ছেন।

কিন্তু কি অপরাধ করেছিল লুৎফা। কি অপরাধ করেছিল আমিনা বেগম! কোন অপরাধ তো করে নি এই দুই নারী। তবুও তারা রেহাই পায নি। জানো লতাহু, এই পৃথিবীতেই আমাদের কুকার্যের মাশুল দিযে যেতে হয়। হয়ত ধীরে ধীরে এই মাশুল উশুল করতে হয তাই আপাত দৃষ্টিতে তা নজরে পড়ে না, তা বলে বিনা মাশুলে কেউ-ই যেতে পায না। এই হল বিধাতার অমোঘ বিধান।

লতাহু বলল, খোসবাগে এসে কাল্পনিক জগতের মানুষকে দেখে লাভ নেই। বাস্তব মানুষ আরও অনেক দূরের অনেক বেশি অস্পষ্ট। ওদিকে নজর দিযে লাভ নেই।

লাভ নেই? কি বলছ লতাহু? মীরণকে একবার দেখ। মীরণকে প্রাণ দিতে হয়েছিল ঘাতকের হাতে। কিন্তু ইতিহাস যদিও বলছে. বজ্রপাতে মীরণের মৃত্যু ঘটেছিল, কিন্তু তার মৃত্যু তার কৃতকর্মের ঋণ পরিশোধ মাত্র। চক্রান্তের বলীরূপেই তাকে ঘাতকের ফাঁসীর দড়ির গলায মাথা দিতে হয়েছিল। খোসবাগের এই নির্জন কবরখানায যদি কারও মৃত্যু দণ্ডদাতাকে ব্যঙ্গ করতে পারে তা হল সিরাজের মৃত্যু। সিরাজ কাঁদে নি, কেঁদে বেড়াচ্ছে বাংলার মানুষ, এই হল বাস্তব, কল্পনা নয। একে অস্বীকার করতে পার কি।

লতাহু গাযে ধাক্কা দিয়ে বলল, পারি আর না পারি আপনি উঠুন। রাত নেমে আসছে।

কোথায় যাব?

কিরীটকণায় কিরীটেশ্বরীর মন্দিরে আজ রাত কাটাব।

কোন কিরীটেশ্বরী?

দর্পনারায়ণ যার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেবীর কিরীট কণা এখানে পড়েছিল। বায়ান্ন পীঠের এও এক পীঠ। মনোহরশাহী কেত্তন যিনি শুনিয়েছেন সেই বদনচাঁদ ঠাকুর এই এখানেই থাকতেন। আর মহারাজ নন্দকুমার ছিলেন এঁরই সেবায়েত।

শুনতে শুনতে এগোচ্ছি।

পথটা পশ্চিমে এগিয়েছে।

মন্দিরে এসে যখন পৌঁছালাম তখন অনেকটা রাত। সন্ধ্যারতি ভোগ শেষ হয়েছে, নাটমন্দিরে কোন লোকের চিহ্নও নেই।

লতাহ্ন বলল, আশ্চর্য।

কি আশ্চর্য ?

এই কিরীটেশ্বরীর পদামৃত পান করেছিল মীরজাফর কুষ্ঠরোগ থেকে নিরাময় হবার আশায়। এখানে রাণী ভবানীর দত্তকপুত্র আসতেন সাধনা করতে, নন্দকুমার এরই চরণামৃত পান করে ধন্য হয়েছিল। আজ সেই মন্দিরে মানুষ নেই। এক মুঠো অন্ন দেবার লোক নেই।

ভালই হয়েছে। চল জায়গা করে শোবার ব্যবস্থা করি। ঘুমটা ভালই হবে মনে হচ্ছে, ক্লান্তিও কম নয়।

লতাহ্ন কম্বল পেতে নিল নাটমন্দিরের কোনায়। পোঁটলা-পুটলি থেকে চিড়ে গুড় বের করে বলল, জলের চেষ্টা করুন।

জল নিয়ে ফিরে এসে দেখি লতাহ্ন যেন সংসার পেতে বসেছে।

ব্যাপার কি ?

বড্ড শীত। কিছু কাঠখড় খুঁজে আনতে পারলে মোটামুটি রাতটা মন্দ কাটতো না।

খেয়ে দেয়ে আবার কাঠকুটোর সন্ধানে বের হলাম। সংগ্রহ করতে বেগ পেতে হয়নি।

লতাহ্ন আগুন জেলে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে রইল। আমিও বসলাম।

আর কতদিন এ জীবন টেনে নিয়ে বেড়াতে হবে।

আমার প্রশ্নে লতাহ্ন সচকিতে সোজা হয়ে বসল, বলল, ভাল লাগছে না বুঝি ?

না।

কি হলে ভাল লাগত ?

কোথাও বসতে গেলে।

শেফালি বউদিকে বাদ দিয়ে বাস করতে পারবেন তো ?

লতাহ্ন যত সহজভাবে জিজ্ঞাসা করল তত সহজভাবে উত্তর দিতে পারলাম না। আবার বললাম, তাকে পাওয়া যাবে কি ?

ধরুন পাওয়া যাবে না, তা হলে কি করবেন ?

কাজকর্ম খুঁজে নিয়ে নিজের চিন্তা নিজে করব।

আর কারও চিন্তা নয়।

তুমি কি বলতে চাইছ লতাহু ?

লতাহুর চিন্তাও কিছু কিছু করতে হবে, কেননা লতাহু এতদিন ধরে আপনাব চিন্তা করে এসেছে। নইলে লোক বলবে বেইমান।

তুমি কি বলবে ?

আমি বলব, আপনার শিউলি বউদিকে খোঁজা ভণ্ডামি। কর্মের প্রতি যে অনাসক্তি তাকে গোপন করবার দুষ্ট চিন্তা অপরের অঞ্চল ছায়ে লুকিয়ে রাখতে চান।

কি বলছ লতাহু !

লতাহু তার নিজেরও নয়, আপনারও নয়। লতাহু বিশ্বের, সেই বিশ্বের কণিকা হয়ে বিরাটের মাঝে মিশিয়ে যেতে চায়। তার বেশি কিছু নয়, তবুও কষ্ট হয় ভাবতে। এই বেশভূষা এবং পরিচয় ভিন্ন দুজনে পাশাপাশি বাস করতে পারব না এই হল আমার আপশোষ, নইলে দুজনেই কোথাও চাকরি নিয়ে বসে যেতাম। তা হচ্ছে না, যেহেতু লতাহু অপয়া, লতাহু ঘর ভাঙ্গে, ঘর গড়ে না, বুঝলেন। তা যদি হত আপনার একটুখানি চিন্তার খোরাক আমি জুটিয়ে চলতে পারতাম। সেটুকু যদি না গ্রহন করেন তা হলে বেইমানি হবে না কি।

লতাহুকে যেন দেখতে পেলাম। বলতে পারলাম না কিছু। কম্বল টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। লতাহু বসেই রইল।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পেলাম কিরীটেশ্বরী ভৈরব। দেখেই লতাহু গালে হাত দিয়ে বসল, এতো ভৈরব নয়! এতো গৌতম বুদ্ধের মূর্তি।

বৌদ্ধধর্ম যখন লোপ পেল বাংলা থেকে বাংলার মানুষ তখন বুদ্ধমূর্তিকে শিব আখ্যা দিয়ে উপাসনা আরম্ভ করেছিল। এর দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে বাংলা দেশে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

একসময়ে এই অঞ্চল যে বৌদ্ধ ধর্মের পীঠস্থান ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এগুলি তারই প্রতীক মাত্র।

চলুন কিরীটেশ্বরী দেখে আসি।

গুপ্তমঠে কিরীটেশ্বরী রয়েছেন। মহারাজা নন্দকুমারের দিন থেকে কিবীটেশ্বরী লাল কাপড়ে ঢাকা রয়েছে। দেবীর মূর্তি দেখা নিষেধ। অনর্থক কষ্ট করে কি হবে। তাব চেয়ে চল ওপারে যাই।

লতাম্বু নাটমন্দিরে ফিরে এসে সংসার নিয়ে বসল। হাঁড়িটা এগিয়ে দিযে বলল, জল আহুন, ভাতে ভাত করে সেদ্ধ শেষ করে নেই।

লোক চলাচল আবম্ভ হযেছে। দুচারজন মন্দিরে উঁকি দিযে ফিরে গেছে। পূজারীও এসেছে।

রান্না চাপিযে লতাম্বু গালে হাত দিয়ে বসেছিল।

পূজারী ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল তার কাছে। জিজ্ঞাসা কবল, কোথা থেকে আসা হয়েছে?

পূব থেকে।

কোথায় যাওয়া হবে?

ঠিক নেই।

আশ্রম?

আগে ছিল, এখন নেই। জাত ধুযে খেয়েছি।

প্রসাদ পেও।

অনেক দেরী হবে, পথ অনেক বাকি। দুটো মুখে দিয়েই বওনা হব। প্রসাদ মাথায় থাকুক।

তা ভাল।

বৃদ্ধ পূজারী ফিরে গেল।

ভাতের হাড়িটা ঠক্ করে নামিয়ে উল্টে দিল। ফেন গালিয়ে আবার হাড়িটা ঠিক মত বসিয়ে হাঁক ছাড়ল, কই গো গোঁসাই, স্নান হয়েছে, সেবা-টেবা হবে!

দূরে বসে সবই দেখছিলাম, শুনছিলাম, লতাম্বুর ডাক শুনে উঠে এলাম।

মানকচুপাতায় ভাত ঢেলে নিয়ে দুজনেই খেতে বসলাম। খেতে খেতে লতাম্বু বলল, আমাদের পরিচয়টা বদলাতে হবে।

এ নতুন খেয়াল কেন?

জোয়ান বোষ্টুমী দেখলে ছোঁড়াবুড়ো সবারই নোলায় জল আসে। কোন রকমে মুখে তুলে দিতে পারলে ওরা খুশী হয়।

বললাম, ঐটুকুই তো ওদের সান্ত্বনা। ভয় পেয়েছ বুঝি?

ভয়! মোটেই নয়। তবে ওদের চোখের জলুনি মনটা খিঁচড়ে দেয়। মনে হয় একটা থাপ্পড় কসে দেই। পারি না, কেন না আমি বোষ্টুমী। আপনি হাসছেন। পৃথিবীতে ঐ একটি জায়গায় মানুষের সবচেয়ে বেশী মিল, কেন না সব মানুষই পশু।

এতোই যদি জানো তাহলে রাগ করছ কেন?

রাগও নেই অনুরাগও নেই, আছে অনুকম্পা আর ঘৃণা। আগে অনুকম্পা বোধ করতাম, এখন বোধকরি ঘৃণা। মানুষ হয়ে মানুষকে ঘৃণা করতে হবে এটা যেন সহ্য হচ্ছে না। তাই পরিচয় বদলাবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

ভেবে বলব।

কিন্তু তাড়াতাড়ি।

সংসার গুছিয়ে নিতে দুপুর পেরিয়ে গেল।

আবার পা বাড়ালাম।

অনেক পথ।

সন্ধ্যার আঁধার নামবার আগেই ঘাটে এসে বসলাম। হাত পা ধুয়ে বসতেই কেমন যেন ক্লান্তি নেমে এল সারা দেহে।

তাকিয়ে দেখলাম।

ওপারে মুর্শিদাবাদ। শুষ্কপ্রায় ভাগীরথীর পাটনি পার করে দিল। নদীর কিনারা বরাবর শহর। শহর আর নেই, রয়েছে শহরের কঙ্কাল। মেদ মজ্জা শুকিয়ে শুকনো হাড় কখানা দাঁড়িয়ে আছে নতুনকে ব্যঙ্গ করতে।

ঘাট পেরিয়ে শহরের রাস্তায় পা দিলাম।

দু পাশে ঝাঁপ তোলা দোকান গুলোতে কেরোসিনের আলো জেলে দোকানী বসে রয়েছে, পশারীর সংখ্যা খুবই কম। রাস্তা চলাচলকারী মানুষের দল যেন ঝিমিয়ে আছে। আট লক্ষ মানুষ যেখানে সোরগোল তুলত, যেখানে আলিবর্দীর জামাতা নওয়াজেস খাঁয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে হাজার হাজার লোক যে শোক ধ্বনি তুলেছিল তার প্রতিধ্বনি শোনা

পেয়েছিল ওপারের খোসবাগে, সেই মুর্শিদাবাদ সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে না নামতে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। মৃত শহরের মত তার চেহারা।

নবাবী কেল্লার পাশে বিরাট আস্তাবলের বারান্দায় দুজনে এসে বসলাম। রাতের বেলায় চেনবার মতো মুখও নেই, দেখবার মতো দৃশ্যও নেই, দুজনে কম্বল পেতে শুয়ে পড়লাম।

আজ যেন শীত বেশি।

লতাস্থ শীতটা উপভোগ করতে চায়। আমাকে জড়সড় হয়ে বসতে দেখে বলল, খুব শীত করছে বুঝি?

না বলতে পারলাম না।

লতাস্থ গায়ের চাদর খানা ফেলে দিয়ে কম্বলের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল।

বললাম, গায়ের ঢাকনা ফেলে শুয়েছ কেন?

শীতটাকে উপভোগ করতে দিন। মানুষ যখন ঘুমোয় তখন ঘুমকে জানতে পারে না। আধা ঘুম আধা জাগরণ ঘুমকে অনুভব করবার সুযোগ দেয়। তেমনি শীতের ভয়ে লেপ কাঁথা জড়িয়ে থাকি, আসল শীতকে উপভোগ করতে, যাকে বলে শীতকে জানবার চেষ্টা আমরা করি না। শীত বেশি রুদ্র অথবা গ্রীষ্ম সেইটে জেনে নিতে চাই।

জবাব দিলাম না। চুপ করে বসে রইলাম।

আকাশে জ্যোস্নার রেশ এসেছে, চাঁদ উঠেছে। তারকাপুঞ্জ মিট মিট করে চেয়ে আছে। বিরাট আস্তাবল দৈত্যপুরীর মতো খাঁ খাঁ করছে। নবাবী প্রসাদ হাজারদেউড়িতে পেটা ঘণ্টার সময় নির্দেশ করছে। লতাস্থ গায়ের সাথে আঁচল জড়িয়ে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ফিকে জ্যোৎস্না এসে তার মুখে পড়েছে। খামচানির সেই কালো দাগগুলো আরও স্পষ্ট ও বীভৎস হয়ে দেখা যাচ্ছে। ঘুমন্ত লতাস্থ মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে, নিঃশ্বাসের সাথে সাথে বুকখানা ওঠা নামা করছে। লতাস্থ যে কত সুন্দর তা দেখেছিলাম একদিন, আর আজ দেখলাম। সেদিনকার সৌন্দর্যও হার মেনেছে তার ঘুমন্ত দেহের রূপের কাছে। সৌন্দর্যের এমন একটি পর্যায় আছে যখন সৌন্দর্যের গরিমা পরিস্ফুট হয় ঠিক ফুটন্ত কুসুম কোরকের মতো। একই মানুষকে সময় বিশেষে একই দর্শক বিভিন্ন ভাবে দেখে থাকে।

আমার চোখেও একই লতাহুর বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন সময়ে ফুটে উঠেছে। বুদ্ধিব প্রাখর্য্য আব পাণ্ডিত্য তার প্রতি যে অটুট শ্রদ্ধা সৃষ্টি করেছে সেই শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি তার সৌন্দর্যের দিকে ফিরিয়ে সুন্দরতার বাস্তব অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি।

বুঝতে পারছিলাম না নিজেকে, বুঝতে পারছিলাম না লতাহু কেন পরিচয় বদলের প্রস্তাব দিয়েছিল। প্রস্তাবের কোথাও কোন উদ্দেশ্য নিহিত আছে কিনা তাও অবোধগম্য রয়েছে। তবে নিশ্চিত ভাবে একথা মনে হচ্ছিল যে, নৈকট্য যেন শেফালির স্থানে লতাহুর স্থান গড়ে তুলছিল। আগেও লতাহুর রূপ দেখেছি, মুগ্ধ হয়েছি, মোহ সৃষ্টি হয়নি। আজ যেন দেখবার চোখ বদলে গেছে। লতাহুর রূপে মোহের আবরণ সৃষ্টি করেছে। লতাহুকে দেখবার চোখ যেন বদলে গেছে।

উত্তরের বাতাস প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গেল। লতাহু পা গুঁটিয়ে বুকের কাছে নিয়ে অসাড়ে ঘুমোচ্ছিলো। তার অনুমতির অপেক্ষা না করেই কম্বল দিয়ে তাকে ঢেকে দিলাম।

শেষরাতে লতাহু উঠে বসল। শীতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। আমাকে বসে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল. আপনি ঘুমোন নি ?

দেখতেই তো পাচ্ছ।

আগে জানলে আমিও ঘুমোতাম না।

দুজন কষ্ট করে লাভ আছে কি ?

এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে। সহধর্মিনী না হলেও সহচরী তো। মাসের পব মাস ধরে সুখ-দুঃখ সমানে ভাগ করে নিয়েছি, আজও না হয় তাই করতাম।

তা বটে। তাতে অধিকার সাব্যস্ত হয় না। ভাড়াটিয়া বাড়ির বাসিন্দার মালিকানা সত্ত্ব সৃষ্টি হয় কি ? তেমনি বহুদিন এক সাথে ওঠা বসা করেও আমাদের দূরত্ব কমেনি। সুখ দুঃখ ভাগ করে নেওয়াটাই হবে সম্বল, সঞ্চয় নয়।

লতাহু অভিযোগপূর্ণ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন গোঁসাই। যারা বৈষয়িক বুদ্ধিতে তুরুপের তাস দিয়ে কেল্লামাৎ করে, হাতের টেক্কা তাদের হাত ছাড়া হয়ে যায় সহজেই, তাই তাসের ফোঁটা গুনতে মেয়েরা

হেরে যায়, পুরুষরা ডঙ্কাবাজী করে এগিয়ে চলে। যার সঞ্চয় নেই তার চেয়ে তুর্ভাগা কেউ নয়।

ঠিক অতোটা আমি স্বীকার করিনা। তবুও, যাক ওসব কথা। সকাল হতে দেরী নেই। ততক্ষণ আবার একটু গড়িয়ে নাও। শীতকে ভাল করেই উপভোগ করেছ নিশ্চয়ই।

লতাহ্ন কোন কথা না বলে গোঁজ হয়ে বসে রইল।

আকাশে ধ্রুব তারা উঠেছে। শেষরাতের দমকা বাতাসে আস্তাবলের ভাঙ্গা দরজা জানালাগুলো ঝট্‌পট্‌ করে আঘাত করছে। পাশের বাড়ি থেকে অবিশ্রান্ত কাশির শব্দ ভেসে আসছে, শিশুর ক্রন্দন শোনা যাচ্ছে।

কাক ডাকল।

আকাশে আলোর রেখা।

লতাহ্ন তেমনি গোঁজ হয়ে বসে রয়েছে।

ডাকলাম, লতাহ্ন।

জবাব না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বসল লতাহ্ন।

হেসে বললাম, এত অভিমান কেন, তুমি তো বিশ্বের।

লতাহ্ন জবাব দিল না।

আবার বললাম, পৃথিবীর চাকা ঘুরছে, আমরাও ঘুরপাক খাচ্ছি। মনের স্থিরতা আজও আসেনি।

বাধা দিয়ে লতাহ্ন বলল, মনকে চিনেছেন।

বোধ হয় না। তাইতো এতো ভয়।

চিনবার চেষ্টা করুন।

ভালো। আজ এই শীতের সকালে একটা প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে?

যে প্রতিশ্রুতি পরক্ষণেই রক্ষা করা সম্ভব নয়, সে সম্বন্ধে সজাগ হয়ে কোন প্রতিশ্রুতি আদায় করলে কোন আপত্তি নেই।

কিন্তু বিষয়বস্তু মোটেই সহজ নয়।

তা হলে থাক। আপনি নিজেই যে ক্ষেত্রে অনিশ্চিত সে ক্ষেত্রে সে আলোচনার কোন মূল্য আছে কি?

আছে। আজ এখানে কেউ নেই। ঊষার আলো আমাদের সামনে।

নিস্তব্ধ প্রকৃতি আমাদের সাক্ষ্য। তাই নীরবে গোপনে একটিমাত্র কথা শুনতে চাই। কেউ জানবে না, কেউ বলবে না, আমিও না। তুমি শুধু বল, আমাদের এই যাত্রা ও সাহচর্য স্থায়ী হবে কি?

জানিনা। আমি জ্যোতিষী নই।

তবুও তোমার দিক থেকে স্থায়িত্ব দেবার চেষ্টা থাকলে তুমি অনায়াসে এ প্রতিশ্রুতি দিতে পার।

পারি। দেব না। কেননা, আপনিও এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। যতক্ষণ পাশাপাশি চলছি ততক্ষণ কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু যে দিন এগিয়ে যাব অথবা পেছিয়ে যাব সেদিন প্রতিশ্রুতির মূল্য থাকবে না, কেননা পরিচয়হীন একজন নারী আর একজন পুরুষ সমস্বার্থেই পথ চলে, দায় নেবার মতো মানসিক ঔদার্য সৃষ্টি হয় না তাতে। যদি কখনও সে মন আমরা উভয়েই পাই সেদিন প্রতিশ্রুতি দেব।

গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলাম, লতাম্বু।

লতাম্বু হাসল, বলল, গোঁসাই আপনি যেমন ছেলে মানুষ তেমনি চালাক, কিন্তু চালাকিতে লতাম্বুকে হার মানানো যায় না। সোজাসুজি যা বলতে পারেন না, তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। যদি বলতেন, লতাম্বু, আমি তোমার সাথে ঘর বাঁধতে চাই তা হলে শুনতে ভাল লাগত। আমিও বলতাম, ঘর বাঁধব কিন্তু বাঁধন মানব না। তা না বলে, কাব্য করতে গিয়েই তো টাল সামলাতে পারছেন না। গোঁসাই, লতাম্বুও মানুষ, সে দেবতা নয। পাথর নয়, রক্তমাংসের জীব।

জবাব কি দেব ভেবে না পেয়ে আকুল আগ্রহে লতাম্বুর হাত চেপে ধরে বললাম, ঘরই বাঁধব, বাঁধন দেব না। বাঁধন দিযে মানুষকে আপন করা যায় না, এ জ্ঞান আমার আছে।

লতাম্বু মুখ ফিরিয়ে নিল। হাঁ-না কিছুই বলল না।

আমি মনে মনে শঙ্কিত হলাম। কেমন একটা লজ্জায় আচ্ছন্ন হয়ে পডলাম। মনে হল, একথা না বলাই ছিল ভাল।

রোদ উঠবার আগেই দুজনে নেমে পড়লাম, ভাগীরথীতে স্নান করতে। কনকনানি শীতে স্নান করে কেমন যেন তৃপ্তি পেলাম। স্নান করে কাপড় জামা

বদলে লতাহ্ সামনে এসে বসল, আজ থেকে 'তুমি', আর 'আপনি' নয়। আজ থেকে 'ওগো', আর 'গোঁসাই' নয়।

লতাহুর ঠোঁটে হাসির ঝলক। এ হাসির সাথে নতুন পরিচয় ঘটল।

প্রকাণ্ড দেউড়ি পেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম হাজার-তুয়ারীর সামনে। পাশেই কেল্লা। ফোর্ট উইলিয়ম নয়, লাল কেল্লাও নয়, বাঁশের কেল্লাও নয়। মোটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা কতকগুলো বাড়ি ভাগীরথীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মীরজাফরের বংশধরের দল এখানে বাস করছে। সেনানীর পাহারা নেই, ভিখারীর ভীড় রয়েছে। ওরা লাইন দিয়ে দাঁড়ায় লালবাগের খাজাঞ্চিখানায় মাসোহারা পেতে। ইংরেজ কোম্পানী আর তার কর্মচারী কয়েক কোটি টাকা লুটে নিয়ে গিয়েছিল মুর্শিদাবাদের রাজকোষ থেকে। তারই সুদ দিচ্ছে দেশের লোক, মীরজাফরের বংশধরদের মাসোহারা দিয়ে। বিশ্বাসঘাতকদের এমন পরিচর্যা ইংরেজই করতে পেরেছে, ভাগ্যের পরিহাস বেইমানী করে সোনার বদলে তামের ঘরের রাজা হয়েছিল মীরজাফর আর তার সুদ উশুল করছে বাংলার মানুষ। যারা প্রাণ দিল দেশকে রক্ষা করতে তারা অনাহারে ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে গেল ধরাধাম থেকে। যারা করল বেইমানি তাদের রসদ জোগাচ্ছে অনাহারী মানুষের দল। এ সুদ কতো বছর দিতে হবে কে জানে।

লতাহ্ দাঁড়িয় দাঁড়িয়ে বাড়িগুলো দেখছিল আর ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি দেখছ?

নিমকহারামীর পরিণতি।

হাঁটতে হাঁটতে এলাম জাফরাগঞ্জ। নবাব প্রাসাদের যাত্নঘর দেখবার স্পৃহা মনে জাগলেও লতাহ্ যেতে রাজি হয়নি বলেই এগিয়ে চলেছি।

বাঁ-দিকে ভেঙ্গে পড়ছে আলীবর্দীর প্রাসাদ। মীরজাফরের খোদ বাসস্থান।

সামনের ঐ ঘেরা বাগানটা কিসের?

বাগান নয়, নবাব পরিবারের সমাধিস্থল।

নবাব! কোন নবাব?

ক'জন নবাব আছে। নবাব নাজিমদের কবরখানা।

দুজনেই প্রবেশ করলাম।

সারি সারি শুয়ে আছে নবাব আর তার বংশধররা। শ্বেত পাথরের স্মৃতি ফলক গুলো পরিচয় দিচ্ছে শায়িত নবাব নাজিমদের। কার সমাধি? নবাব নাজিম মীরজাফরের। তার পাশে কে শুয়ে? অনেক অনেক নবাব নাজিম। নিজামতী হারিয়ে শুয়ে আছে মাটীর তলায়। এই হল পরিণতি।

মনে হল, একবার ডেকে জিজ্ঞাসা করি মীরজাফরকে, ওগো মীরজাফর, বল দেখি তুমি সুখী কিনা? কে উত্তর দেবে। সব নিশ্চল হয়ে গেছে। নবাবী কবরখানায় বেগমদের জন্য পর্দা দেওয়া হয়েছে, মরেও তারা পর্দাব হাত থেকে বাঁচতে পারেনি।

লতানু বলল, মণি বেগমেব কবর আছে কি?

জানিনা, খুঁজতে হবে।

খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গেলাম। না মণিবেগম নেই। মীরজাফবের প্রিযতমা বাইজি-বেগম হারিযে গেছে। মণিবেগম সাহস পাযনি মীবজাফবের পায়ের তলায় শুযে থাকতে, যেমন ভাবে লুৎফা শুয়ে রযেছে সিরাজের পায়ের তলায়। লুৎফাব মতো তার তেজ ছিল না, ছিল কুটবুদ্ধিব প্যাঁচ। জীবনের ভোগকেই বড মনে করেছে, মীরজাফরকে ভালবাসতে পারেনি। তার যৌবন মীরজাফরের বার্দ্ধক্যকে অনুকম্পা প্রদর্শন করেছে মাত্র। ভালবাসা মীরজাফর কারুরই পায়নি, মণিবেগমেরও নয়, নইলে পাযের তলায় সে রইত। ঘৃণায় মণিবেগম চলে গেছে অনেক দূর। কোথায়? খুঁজে পেলাম না। বেগমের নশ্বরদেহ, তাব নূপুরধ্বনি শুনবার প্রতীক্ষায় দাঁডিযেছিলাম। না কোথাও কোন সাডাশব্দ নেই।

মণিবেগমকে খুঁজতে বলে লতানু ফটকে এসে বসেছিল। সবগুলো কবর সে ভাল করে দেখেও নি।

ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, ফিরে এলে কেন?

ঘেন্নায়। খোঁসবাগ যে পবিত্রতা অনুভব করেছিলাম, সে পবিত্রতার আংশিক কিছু যদি অনুভব করতাম তা হলে কোন দুঃখ ছিল না। মীরজাফর আর মীরণের বংশধরদের কবরখানায় ঘৃণা ভিন্ন আর কিছুই মনে জাগে না। জানি, যে নেই সে শত্রু নয়, তবুও মার্জনা করতে পারিনি। ভাবছি, সেই পলাশীর যুগে যদি আমি জন্মাতাম।

তাও লাভ হত না। আজকের মত দিন সেদিন থাকতো না।

না গো না। অতীতকে দেখবার প্রলোভন মানুষের রয়েছে বলেই মানুষ ছুটে আসে এসব জায়গায়। সেদিনকার মানুষের আচার ব্যবহার, সবকিছু খুঁজে বেড়ায় আজকের মানুষ। তারা পরিচয়ের সুগন্ধ খোঁজে ঐসব ইঁট কাঠ-পাথরে। তোমার আমার কাছে অকিঞ্চিৎকর নয় বলেই আমরা এসেছি। কল্পনাকে প্রসারিত করলে সেদিনের দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে, কিন্তু সত্যিই যদি সেদিন থাকতাম তা হলে বাস্তবকে কল্পনা বলে ভুল করতাম না।

ফিরে এলাম ইমামবাড়ায়।

সামনেই হাজারদুয়ারী। নবাব হুমায়ুনজা সতরলক্ষ টাকা খরচ করে ইতালীয় ধরণে তৈরী করিয়েছিল এই প্রাসাদ। এই প্রাসাদ নেমকহারামকে গোপন করবার চেষ্টা করেছে, সে চেষ্টা কত বেশি ব্যর্থতা লাভ করেছে তা বোঝা যায় প্রাসাদ অলিন্দে জনমানবশূন্যতায়। দেখে এসেছি নেমক-হারামীর দেউড়ি। ভেঙ্গে পড়েছে বন্দীশালা। এই বন্দীশালায় মহম্মদী বেগ শাণিত ছুরিকা বসিয়ে দিয়েছিল নিবস্ত্র বন্দী সিরাজের বুকে। সেই নেমকহারামীর সামনে চাকচিক্যময় এই প্রাসাদ নেমকহারামির নীচতাকেই বেশি ফুটিয়ে তুলেছে, এতে নবাবীর গৌরববৃদ্ধি করেনি। সিরাজের কাতর আর্তনাদ বোধহয় আজও শোনা যায় ঐ ভাঙ্গা বন্দীশালায়।

ইমামবাড়া তৈরী করেছিল সিরাজ। বাংলায় এতবড় ইমামবাড়া সে যুগে আর ছিল না। সেটা ভেঙ্গে পড়ল, তাকে রক্ষা করবার দায়িত্ব ও নৈতিকবোধ সেই মানবের উত্তর পুরুষদের ছিল, একে রক্ষা করবার ব্যবস্থা না করল নবাব, না করল ইংরেজ। সিরাজ ওদের কাছে ছিল অস্পৃশ্যজন। তাকে হত্যা করবার একশত বৎসর পর নবাব মনসুর আলি ফেরদুনজা তৈরী করেছিল এই নতুন ইমামবাড়া। ধর্মের গৌরব রয়েছে এতে, কিন্তু মনুষ্যত্বের গৌরব ম্লান হয়ে গেছে।

লতামু বলল, চলুন, মুর্শিদকুলীকে দেখে আসি।

মুর্শিদকুলী।

কঙ্কনের ব্রাহ্মণ বালক। লুঠেরার হাতে বন্দী হয়ে দাসবাজারে পণ্যরূপে বিক্রীত হয়েছিল। সেখান থেকে তাকে সোজা নিয়ে এসেছিল ইরাণে।

মুর্শিদকুলী ভুলে গেল কঙ্কন, ভুলে গেল মারাঠী আবহাওয়া, ভুলে গেল বাল্যজীবন, পিতামাতার স্নেহ। মুর্শিদ হল খাঁটি মুসলমান। একদিন সুযোগ বুঝে মুর্শিদ পালিয়ে এল ভারতে। খুঁজতে খুঁজতে এল মারাঠার পার্বত্য দেশে। তখন লড়াই চলেছে পার্বত্য মুষিকের সাথে। ভাগ্যান্বেষী মুর্শিদ আলমগীরের সামনে নতজানু হয়ে কর্মপ্রার্থী হল। বাদশা আলমগীর মানুষ চিনতে ভুল করত না, এক্ষেত্রেও ভুল করেনি। আলমগীর তাকে দেওয়ানী দিল হায়দ্রাবাদের।

আলমগীর রাজকোষ তখন শূন্যপ্রায়। রাজকোষ পূর্ণ করবার আশায় আলমগীর দেওয়ানী দিয়ে মুর্শিদকে পাঠাল সোনার বাংলায়। সুচতুর মুর্শিদ শাহজাদা আজিমকে ফেরত পাঠাল দিল্লীতে, নিজেই তুলে নিল সুবেদারীর দায়িত্ব। মুর্শিদ বাংলা দোহন করে যুদ্ধের খরচ পাঠাতে লাগল দাক্ষিণাত্যে। ঢাকা থেকে রাজধানী তুলে আনল মুকসুদাবাদে, নতুন নামকরণ হল মুর্শিদাবাদ। বাদশাহ তাকে খেতাব দিলেন, মুর্শিদকুলী মতিমন্-উল্-মুল্ক্ আলাউদ্দৌল্লা জাফরখাঁ নাসিরী নাসিরজঙ্গ কারতলব খাঁ। এতবড় নামটার প্রথম আর শেষ শব্দটি রয়ে গেল মানুষের মনে, সুবেদার পরিচিত হল মুর্শিদকুলী খাঁ নামে।

বাংলার জমিদারদের শায়েস্তা করেছিল মুর্শিদ। সময়মত রাজস্ব না দিলে মুর্শিদাবাদের কারাগার হত তাদের বাসস্থান। প্রজাপীড়নের জন্য খাজনা বৃদ্ধি করলে জমিদারী বাজেয়াপ্ত করবার ব্যবস্থাও করেছিল মুর্শিদ। বাংলায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে কেউ যদি আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে, সে হল মুর্শিদ। এ সব বিষয়ে ছিল নমস্য, অথচ ধর্মান্ধতায় ছিল সর্বাধিক অত্যাচারী।

বাংলায় ন্যায় বিচারের আদর্শ স্থাপন করেছিল মুর্শিদ। অন্যায়কারী স্বীয় পুত্রকেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতে মুর্শিদ পেছপা হয়নি।

একদিন একটি বালিকা এসে কেঁদে পড়ল সুবেদারের পায়ের তলায়।

কি হয়েছে মা? জিজ্ঞাসা করল মুর্শিদ।

হুগলীর কোতোয়াল আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে সম্ভ্রম নষ্ট করেছে।

পরোয়ানা জারী করল মুর্শিদ। ফৌজদার বন্দী কোতোয়ালকে পাঠিয়ে

দিল মুর্শিদাবাদে। সুবেদার আদেশ দিল, পাথর ছুড়ে মেরে কোতোয়ালকে হত্যা করতে।

আদেশ পালিত হয়েছিল।

এহেন মুর্শিদকুলীকে দেখবার অনুরোধ অথবা আদেশ পেয়ে ধন্য মনে করলাম। বললাম, চলো, মুর্শিদকুলীকে দেখে আসি।

শহর ছেড়ে অনেক দূরে কাটরার মসজিদ।

বিরাট পাঁচটি গম্বুজ। বাংলার ছোট ইঁটে তৈরী বিশাল মসজিদের চত্বরে এসে থমকে দাঁড়ালাম।

লতাম্নু বলল, চলো দাঁড়িয়ে কেন?

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে বাধা পেলাম। মুর্শিদ শুয়ে আছে সিঁড়ির তলায়। নেমে এলাম। সিঁড়ির তলায় ছোট্ট ঘরখানার দরজা খুলে দাঁড়ালাম মুর্শিদের সামনে। অতি নগণ্য কবর ব্যবস্থা। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না অতিশক্তিধর ন্যায়বিচারক মুর্শিদের কবর এটি। এক টুকরা পাথরেও লেখা নেই কে শুয়ে আছে চিরনিদ্রায়।

নামের কাঙ্গাল ছিল না মুর্শিদ, ভক্তজনের পায়ের ধুলো বুকে নিয়ে মুর্শিদ শুয়ে আছে রোজ কিয়ামতের প্রতীক্ষায়।

লতানু বলল, আশ্চর্য।

বললাম, ত্যাগী বলতে হলে মুর্শিদকেই বলতে হয়। গরিমার সাথে গর্ব ছিল না, ক্ষমতার সাথে ক্ষমা ছিল, ন্যায়ের সাথে ছিল নায়কত্ব করবার মতো ব্যক্তিত্ব।

নমস্কার করলাম মুর্শিদের পায়ের কাছে। মালী এসে দাঁড়াল। সত্য মিথ্যা নানা কাহিনী বলতে বলতে ভাবাবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

লতানু কবরের ওপর থেকে এক মুঠো মাটি নিয়ে আঁচলে বাঁধল।

জিজ্ঞাসা করলাম, ও দিয়ে কি হবে?

মুর্শিদের মরণ আর বাংলার শান্তিহরণ একসাথে ঘটেছে। শ্বেত পারাবত উড়িয়ে বাংলায় শান্তি আসবে না। মুর্শিদের কবরের মাটি দিয়ে হিন্দু মুসলমান যেদিন তিলক কাটবে, তিলক চর্চিত কপালের দিকে পরস্পর চেয়ে দেখবে, সেইদিন শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

মসজিদের আঙ্গিনায় এসে দাঁড়ালাম।

মক্কার কাবা মসজিদের নতুন ধরণ বলে মনে হল এই মসজিদকে। মুর্শিদ যে ধর্মকে ভালবাসতেন, ধর্মের অনুশাসনগুলো উদার দৃষ্টি দিয়ে দেখতেন তার পরিচয় এই মসজিদের প্রতিটি কোনায় কোনায আঁকা রয়েছে। চব্বিশ বছর মুর্শিদ ছিলেন বাংলায। আলমগীর তখন গতায়ু। মুঘল তখন ঘরোয়া বিবাদে ছন্নছাড়া, সেদিন মুর্শিদ যদি স্বাধীনভাবে বাংলাকে রক্ষা না করতেন তাহলে দিল্লির নোংরা আবহাওয়ার ঢেউ-এ বাংলাও ভেসে যেত।

ইঁট পাথরের গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিযে অনুভব করতে চেষ্টা করলাম, কত মানুষের কত মেহনতে এমন সুন্দর ধর্মস্থান গড়ে উঠেছিল। কাটরার মসজিদ আজ জনারণ্য থেকে দূরে দাঁড়িযে রযেছে। সরকারী ব্যবস্থায মেরামত হচ্ছে ভগ্ন চত্বর। অর্ধভগ্ন মিনারের মাথায় দাঁড়িযে মোয়াজ্জেম আজান আর দেয় না, তবুও ভবিষ্যতের মানুষ বিস্ময়ে তাকিযে থাকবে এই কাটরার মসজিদের দিকে, স্মরণ করবে মুর্শিদকে।

আবার পথ ধরলাম। বাঁ দিকে বাঁক ঘুরে খালের মুখে তোপখানায় এসে দাঁড়ালাম। বাদশাহী সাঁকোটা ভেঙ্গে গেছে। মুর্শিদাবাদের প্রবেশ পথের খালের বুকে বালি পলি জমে প্রাকৃতিক বাধা নষ্ট হযে গেছে অনেক কাল আগে। শত্রুর আক্রমন থেকে রাজধানী বাঁচাবার জন্য এই পথ রোধ করে দাঁড়াত বাঙ্গালী গোলন্দাজরা। আজও সেখানে জনার্দ্দন কর্মকারের হাতে তৈরী জাহানকোষা কামানকে বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট এক অশ্বত্থ গাছ।

জগজ্জয়ী এই কামান তৈরী হযেছিল ষোলশত সাঁইত্রিশ সালে। তৈরী হয়েছিল ঢাকার কামারশালে। স্বাধীনতা রক্ষার এই প্রাণহীন প্রহরীকে মানুষ প্রায় ভুলেই গেছে কিন্তু প্রকৃতি তাকে স্নেহের আচ্ছাদন দিয়ে কোলে তুলে নিয়েছে। মাটি থেকে অনেক উঁচুতে বুকে করে আদর জানাচ্ছে বৃক্ষজননী। বঙ্গজননী যা পারেনি বৃক্ষজননী তা পেরেছে। নিখুঁত এর গঠন, নিখুঁত এর স্থায়িত্ব। আজ জাহানকোষার গর্ভ থেকে আগুন বের হয় না, বোধহয় ক্রন্দনধ্বনি শোনা যায় জাহানকোষার কণ্ঠ থেকে। স্থানীয় মানুষের প্রীতি পেয়েছে জাহানকোষা, তাই রঙীন হয়ে রয়েছে সে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে স্থানীয় কজন মানুষ জাহানকোষাকে দেবত্বদান করেছে, সেটা জাহানকোষার শ্রেষ্ঠত্ব কিনা কে বলতে পারে!

ফিবে এলাম জাহানকোষাব কাছ থেকে। বিদায় নিলাম। বললাম, সব গেছে, তুমি আছ, তোমায নমস্কাব।

লতাহু প্রণাম কবল লোহাব দেবতাকে।

এবাব কোথায যাবে ?

যাবনা, এখানেই থাকব কদিন। কাঁদব। যাদেব জন্য কেউ কাদেনি, তাদেব জন্য কাঁদব। আমাদেব দুজনেব অশ্রু দিয়ে পূর্বপুরুষদেব অপবাধেব জন্য মার্জনা চাইব অশবীবী আত্মাব কাছে। বাংলাব মানুষ সবাই বেইমান নয, চোখেব জল দিযে তাদেব বুঝিযে দেব।

সন্ধ্যাবেলায গাছতলায বান্নাব ব্যবস্থা কবে লতাহু বলল, এবাব পবিচ্ছদ বদল কবতে হবে। কাল সকালে দোকানে গিয়ে কাপড জামা কিনে আনবে। তৃতীয পর্যায আবম্ভ হবে আমাদেব জীবনে।

প্রযোজন আছে কি ?

আছে। দৃঢতাব সাথে কথাটি বলে লতাহু নিজেব কাজে মন দিল।

তার কণ্ঠস্বব দ্বিতীয প্রশ্ন কববাব ভবসা দিল না।

গাছতলায বান্না শেষ করে খেয়ে নিলাম।

লতাহু বলল, চলো।

একটু বিশ্রাম কববে না।

চারিদিকে ভাঙ্গা ইঁটেব স্তুপ। এখানে বাত্রিবাস কবলে সাপের হাতে প্রাণ দিতে হবে।

মিটে যাবে দায় দেনা ভাবনা চিন্তা।

মৃত্যু যদি অতো সহজে আসত তাহলে ভয় ছিল না। ভয় হল অপ্রার্থিত যন্ত্রণাকে। যন্ত্রণাকে রোধ কবতেই মানুষ সভ্য হয়েছে, অথবা হতে চেয়েছে। মৃত্যু পরিসমাপ্তি জেনেও কেউ মরতে চায়নি।

আজ রাতটা এই গাছতলায় কাটালে কেমন হয় ?

তুমি যদি নেহাত না যাও তাই থাকতে হবে।

নিস্তব্ধ পরিবেশ। আকাশে চাঁদ উঠল অনেক বাতে। আজ শীতও যেন কম।

কম্বল পেতে বসলাম।

লতাহু কাজ কর্ম মিটিয়ে পাশে এসে বসল।

লতায়।

কেন?

সংসার চাও।

চাই। তবে সংযমকে উপেক্ষা করে নয়।

বুঝলাম না তোমার কথা।

অর্থাৎ বাহ্যত স্বামী-স্ত্রী সেজেও পরস্পরের সান্নিধ্য না ঘটিয়ে থাকতে চাই। কথাটা শুনতে বোধহয় ভাল লাগল না।

উত্তর দিলাম না।

লতায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

বসেই রইলাম।

শেয়াল ছুটে পালাল।

পেঁচা ডেকে উঠল ঝোপের মাথায়।

সামনে ভাঙ্গা ইঁটের রাস্তা। একটি জীবন্ত প্রাণীও নেই সেখানে। এটাই ছিল লালবাজার মহল্লা। সৈন্যের পদক্ষেপণে রাতের মুর্শিদাবাদ চমকে উঠত। জনতার ছোটাছুটি কোলাহলে মুখরিত থাকত লালবাজার, আজ কেউ নেই। শ্মশানের চেয়েও ভয়ঙ্কর এই লালবাজার। লালের দল লুপ্ত হয়ে গেছে অতীতের অন্ধকারে।

দূরে ভাঙ্গা ঘরের ভাঙ্গা জানালা দিয়ে পিদিমের মিটমিটে আলো দেখা যাচ্ছিলো। সে আলোও নিভে গেছে। আকাশের চাঁদ ধীরে ধীরে গা এলিয়ে দিচ্ছে।

রাত বাড়ছে।

শীতে হাত পা অবশ হয়ে আসছে।

লতায়ের বুকের কাছে হাঁটু নিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে শুয়ে আছে। তার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আকাশের বুক কেটে ছুটে গেল একটি উল্কা।

ঝিমিয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ কার ধাক্কায় ঝিমুনি ছুটে গেল।

বসে বসে ঘুমোচ্ছ কেন?

তাই নাকি।

তাই তো দেখলাম। হঠাৎ গায়ের ওপর না পড়লে টেরও পেতাম না। ঝিমোতে ঝিমোতে উল্টে পড়ে কোনদিন কোন কেলেঙ্কারী না কর।

হাসলাম। বলবার কিছু নেই।

আবার সকাল হল। তল্পীতল্পা গুটিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লালবাগে এসে সবার আগে পেটের ধান্দায় বের হলাম।

লতাহ্ন ভাগীরথীর ধারে নির্জনে গাছতলা বেছে নিয়ে সংসার পেতে বসল।

বাজার থেকে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, এরপর কোন প্রোগ্রাম আছে?

লতাহ্ন হেসে বলল, আছে গো আছে। মুর্শিদাবাদের ধূলিকণায় জড়িয়ে আছে কত বেদনা তা তুমি বুঝি জানো না। বেদনার সাথে আমাদের চোখের জল মিশিয়ে দিতে চাই। রান্না খাওয়া শেষ হলে মোতিঝিলের মসজিদ দেখে আসব। এত কান্নার ইতিহাসে একজন মাত্র ছিল সুখী। সেই সুখী মানুষের স্মৃতি না দেখে ফেরা হবে না।

লতাহ্নর মুখে উনুনের আগুনের লাল আভা এসে পড়েছে। উস্কো-খুস্কো চুলগুলো দলা পাকিয়ে মুখের ওপর ঝুলছে। বিরক্তির সাথে মাঝে মাঝে চুলের গোছা সরিয়ে দিয়ে আঁচলে মুখ মুছে নিচ্ছিল। অপলকে তার কাজ দেখছিলাম। তন্ময়তা এসে গিয়েছিল। হঠাৎ লতাহ্ন বলল, ঘসেটি ছিল বাংলার অন্যতম ভাগ্যবিধাত্রী, অন্তত বাংলার ভাগ্য গঠনে তার দান ছিল অপরিমেয়। অথচ তারই স্বামী নওযাজেস খাঁ দত্তক নিয়েছিল সিরাজের ভাই এক্রামকে। নওয়াজেস কখনও চায়নি এক্রামকে মসনদে বসাতে, অথচ ঘসেটি চেয়েছিল সিরাজকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে। আলিবর্দীর বেগমের যত গুণ ছিল তার শতগুণ বেশি দোষ ছিল ঘসেটির। ইংরাজকে সম্পদ ঢেলে দিয়েছিল সিরাজকে শায়েস্তা করতে। সেই ঘসেটির স্বামী নওয়াজেস ছিল সারা মুর্শিদাবাদের সর্বজন মান্য একমাত্র ভদ্রব্যক্তি। নওয়াজেসের কোন শত্রু ছিল না। একমাত্র শত্রু ছিল তার গৃহে, সে হল তার প্রিয় মহিষী ঘসেটি বেগম। এই নওয়াজেসকে দেখে না গেলে মুর্শিদাবাদ দেখা হবে অর্থশূণ্য।

নওয়াজেসকে আমিও জানি। লতাহ্নকে বাধা দিয়ে বললাম। এতক্ষণ

নীরব শ্রোতার মতো শুনে চলেছি লতাম্বুর কথা। বাধা পেয়ে লতাম্বু থেমে গেল। উনুন থেকে হাঁড়ি নামিয়ে বলল, যেদিন নওয়াজেস মারা গেল সেদিন মুর্শিদাবাদের পঞ্চাশ হাজার মানুষ ছুটে এসেছিল তাকে শেষবারের জন্য দেখতে। তাদের শোকধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছিল ওপারের খোসবাগে।

কোন কথা না বলে গামছা নিয়ে নদীতে নেমে পড়লাম। স্নান শেষ করে আসতেই লতাম্বু বলল, একটু বসতে হবে। আমিও স্নান সেরে আসি।

মোতিঝিল থেকে সোজা এসে উঠলাম আজিমগঞ্জে। বেলা তখন পেরিয়ে গেছে। আসবার আগে বাজার থেকে নতুন কাপড় জামা কিনে এনেছিলাম। নওলাখী বাগানে কাপড় জামা বদলে বৈষ্ণবের বেশভূষা টাঙ্গিয়ে রাখলাম বাগানের আমগাছে। নতুন জীবনের পথে পা দিয়ে পুরাতনের পতাকা উড়িয়ে দিলাম লোকচক্ষুর অন্তরালে।

লতাম্বু বলল, দুটো জিনিস চাই।

জিজ্ঞাসু ভাবে তার দিকে তাকাতেই বলল, এক কৌটা সিন্দুর আর হাতের লোহা।

বললাম, চমৎকার।

নইলে পরিচয় দিতে পারব কি?

তা বটে।

নওলাখী বাগানের শান বাঁধানো ঘাটে রাত কাটিয়ে সকাল বেলায় গঙ্গার কিনারা বরাবর চলতে লাগলাম। অনেক দূর থেকে মহাবীর জৈনের মন্দিরের মাথায় পেতলের কলসীগুলো দেখা যাচ্ছিলো। সকালের রোদে চক্চক করছিল মন্দিরের চুড়া। মাঝে মাঝে পেছন ফিরে দেখছিলাম আর এগিয়ে চলছিলাম।

এ পথ কোথায় গেছে?

যাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে বলল, বড়নগর।

বড়নগর! যেখানে রানী ভবানী থাকতেন।

হাঁ।

এগিয়ে চললাম।

সামনেই বড়নগর।

নগর আর বড় নয়, নগর উঠে গেছে, রয়েছে শুধু নগরের স্মৃতি।

ভবানীশ্বর শিবের মন্দিরে এসে লতাম্ বলল, এখানেই কিছুকাল বাস করব।

আপত্তি করলাম না।

রাণী ভবানী!

মানস চক্ষে দেখতে পেলাম তাকে। বাংলা যতদিন থাকবে তিনিও ততদিন থাকবেন।

ভবানীশ্বর শিব আজও আছেন। নেই তার প্রতিষ্ঠাতা আর তার গৌরবোজ্জল ঐতিহ্য। সবই কালের কপোলতলে বিলীন হয়ে গেছে।

নাটোরকে দেখলাম।

ক্লাইভের দূত এসেছে প্রাসাদে। সিরাজকে উৎখাত করবার ষড়যন্ত্রে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানাতে। ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছে সে প্রস্তাব। এক সেই নারী। সেই নারী আমাদের মহীয়সী রাণী ভবানী।

হেষ্টিংস ফৌজ নিয়ে এসে নাটোর প্রাসাদ আক্রমন করেছে। রাণী বন্দিনী। মুক্তিপণ দিতে হয়েছে বাইশ লক্ষ টাকা। এও সেই রাণী ভবানী।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে অনাহারে মানুষ মরছে, রাণী উন্মুক্ত করে দিয়েছেন ভাণ্ডার। একজনও যেন না খেয়ে না মরে তার রাজ্যে। এই সেই রাণী ভবানী।

বড়ই দুঃখ তার জীবনে। কন্যা তারাময়ীকে নিয়ে বাস করেন গঙ্গাতীরে। গড়ে তুলেছেন নতুন নগর। মন্দিরে মন্দিরে ভর্তি করেছেন নগরের চৌহদ্দি। চার বাংলার মন্দিরে স্থাপন করেছেন শিব। বাংলার শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য এই চার বাংলার মন্দির। বড়নগরের প্রবেশ পথে শিবমন্দির, এ মন্দিরও রাণী ভবানীর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তার দুভার্গা বংশধররা তাকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নেয়নি, তার দায়িত্ব নিয়েছে বিদেশী বণিক নওলাখা পরিবার।

তারপর একদিন বিদায় নিলেন। চির বিদায়। কিন্তু তার গরিমা রক্ষা করবার মতো বংশধর আর এল না। রাণীর গৌরব বহন করবার ক্ষমতা তাদের রইল না।

লতাম্ বলল, চার বাংলার মন্দিরের মতো মন্দির এখনও দেখিনি। প্রতিটি মন্দির সাক্ষ্য বহন করছে বাঙালীর অপূর্ব শিল্প প্রতিভার। সমগ্র

রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণের সম্পূর্ণ কাহিনী পোড়ামাটির গায়ে এঁকে তুলেছে বাংলার শিল্পীর দল। সে শিল্পী আজ আর নেই। কিন্তু এই অপূর্ব শিল্প সম্ভার রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেনি তার সম্পদভোগকারীর দল।

আমি বললাম, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য হল, ভবানীদেবীর আরাধ্য দেবতা ভবানীশ্বরের মাথায় ফুল বেলপাতা দেবার লোকের অভাব ঘটেছে। এই মন্দিরটির সমকক্ষ শিল্প প্রতিভা বাংলায় অজ্ঞাত বললেও হয়। রাণীর প্রাসাদ ভেঙ্গে গেছে, দেউল মিশে যাচ্ছে মাটিতে, শিববিগ্রহ রয়েছে উপেক্ষিত, গোবিন্দ আর রাজেশ্বরী কাটাচ্ছেন অর্ধাহারে। মানুষ দেবতাকে ভাল না বাসলেও, শিল্পকে ভালবাসে অথচ ১৭৫৫ সালে যার প্রতিষ্ঠা তার রক্ষণ ব্যবস্থা দুশো বছরে কেউ করেনি। গঙ্গার বুকে একদিন এসবের সমাধি রচিত হবে, দেবতা আশ্রয় পাবে অতলে বালুকা গহ্বরে।

লতানু শুধু হাসল।

বললাম, হাসছ কেন?

লতানু আবার হাসল। আমার প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কথা বলছ না কেন?

ভাবছি তোমার কথা। অতীত মহাকালের নিষ্ঠুর আক্রমনে লোপ পেতে বসেছে, মানুষের জাত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এগিয়ে আসছে অথচ পেছনে তাকিয়ে দেখছে না, কেন? এ প্রশ্ন জেগেছে মনে, তাই হাসছি।

লতানু ঘর খুঁজে নেব করল। রাজেশ্বরী মন্দিরের নহবতখানার ভাঙ্গা বারান্দায় সংসার পেতে বসল। সকালে বিকালে পোড়ামাটির ভাস্কর্য দেখে বেড়াতে লাগল। সন্ধ্যাবেলায় এসে বসত চার বাংলার মন্দিরে। আরতি শেষ হলে উঠে আসত। রাঁধত, খেতে দিত, নিজেও খেত। আসক্তিবিহীন আনন্দবিহীন জীবনযাত্রার পদক্ষেপে বারবার মন যেন সচকিত হয়ে উঠতে লাগল।

মন্দির জনশূণ্য হলে বাইরে মাদুর পেতে শুয়ে রাত কাটায়, লতানুর কেমন ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম।

একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, বড়নগরেই ঘর বাঁধবে কি?

না বড়নগরের মহত্বকে বিন্দু বিন্দু করে ভোগ করতে চেষ্টা করছিলাম। এখন দেখছি এ চেষ্টা ফলবতী হবার কোন সম্ভাবনা নাই। এখন নিজেকে

তৈরী করতে পারিনি মহত্ত্বের কণা সংগ্রহের মতো করে। এবার চল। যেদিন ক্লান্তি আসবে সেদিন আশ্রয় গড়ে নেব।

রাতের বেলায় বসে বসে ভাবছিলাম। মনের কোণা থেকে শেফালিকে খুঁজে বের করলাম। কয়েক মাসেই শেফালি অপরিচিত হয়ে গেছে। তাকে চিনতে কষ্ট হল। বাচ্চাকে খুঁজতে খুঁজতে হয়রাণ হয়ে গেলাম। জনারণ্যে তাকে হারিয়ে ফেলেছি। শেফালির শূণ্য কোলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েও বাচ্চাকে খুঁজে পাচ্ছি না। ডাকলাম, শেফালি, শিউলি, সই।

উত্তর ভেসে এল বাতাসে, কুহু!

বাতাসটা মিঠে মনে হল, আবার উত্তর পেলাম, কুহু।

৪

বিশ্রাম নিতে এসে বসলাম সিংহী দালানে। গঙ্গার গায়ে রাজা মানসিংহ নির্মান করিয়েছিলেন এই দালান। পুরনারীদের বৈকালিক প্রমোদ-গৃহ। গঙ্গার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আজও।

হিসাব করে দেখলাম অনেক পথ এসেছি।

গেরিয়া পেরিয়ে এসেছি। একপাশে জালিম সিংহের মাঠ, আরেক পাশে মীরকাশিমের মাঠ। ধু-ধু করছে। বাংলার নবাবী ভাগ্য এখানে বার বার স্থির হয়েছে, এখানেই আলিবর্দী সরফরাজকে হত্যা করে বাংলার মসনদ লাভ করেছিল, এখানেই মীরকাশিম সেই মসনদ ইংরেজের হাতে তুলে দিয়ে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল উধুয়ার দুর্গে।

আলিবর্দী বীরের সম্মান দিতে জানত, তাই নিহত বিজয় সিংহের কিশোর পুত্র জালিম সিংহকে বুকের সাথে আঁকড়ে ধরতে দ্বিধা করেনি। ইংরেজ নিজের বীরত্বটুকু জাহির করেছে চিরকাল, মীরকাশিমের স্বাধীনতা রক্ষার স্পৃহাকে সম্মান করতে পারেনি ইংরেজ তথা দেশের লোক।

উধুয়া এসে লতাহু নেতিয়ে পড়ল।

গেরিয়ার মাঠে ভাগিরথীর জলে স্নান করে লতাহু পরিতৃপ্তির সাথে বলেছিল, তীর্থ দুর্শনের এক পর্যায় পার হয়েছে।

উধুয়া এসে দ্বিতীয় পর্যায়ে পা দিয়ে লতাহু কেন যে উৎসাহে গদ্‌গদ্‌ হল না তা ভেবে পেলাম না।

হিসাব করে দেখলাম অনেক পথ এসেছি। পথ আরও প্রশস্ত হয়ে যেন হাতছানি দিচ্ছে।

উধুয়ার খাল আজও মীরকাশিমের দুর্ভাগ্যের কথা জানাচ্ছে।

ক্ষুদকিপুর থেকে বাদশাহী রাস্তা ছুটো টিলার মাঝ দিয়ে নালার কিনারায় সাঁকো অবধি এসেছে। পাথরের টিলা দিয়ে প্রকৃতি গড়েছে দুর্গ।

ডান পাশে ছোট টিলা। এখানে ছিল নবাবী তোপখানা। পাশেই ছিল গঙ্গা, সে গঙ্গা সরে গেছে অনেক দূর। তখন ছিল ডান দিকের পথ বন্ধ। নদীপথে এগোবার রাস্তা বন্ধ। মাল্লামাঝিরা ওপারে মানিকচকে আটক রয়েছে। বাঁ দিকে দ্বিতীয় টিলার মাথায নবাবী সেনার সবচেয়ে বড় সমাবেশ। তোপখানা, রিসালদারী ব্যবস্থা আর রয়েছে রসদ। এরই পাশ দিয়ে চক্রাকারে রয়েছে ঐতিহাসিক জলাভূমি। একটি মাত্র পথ। সে পথে প্রবেশ করে কার সাধ্য। প্রকৃতি এই দুর্গ তৈরী করে রেখেছিল মীরকাশিমের জন্য। এই দুর্ভেদ্য প্রাকৃতিক দুর্গে মীরকাশিম এসে আশ্রয় নিল সহস্র সহস্র যোদ্ধা নিয়ে, যার তিন ভাগই ছিল হিন্দু।

রাস্তায দাঁড়িযে প্রকৃতির এই দানকে দেখছিলাম, লতাহু হাত ধরে টানতে টানতে টেনে তুলল ডান দিকের টিলায। লম্বায হযত তিরিশ হাত, চওড়ায হয়ত পঁচিশ হাত, এই ছোট্ট টিলায ইঁট বাঁধানো চবুতরা আজও রযেছে, আর রযেছে কোন পীরের কবর, সামনে দাঁড়িযে আছে আধা শুকনো একটি বেলগাছ। প্রকৃতির নিষ্ঠুর বুকে শ্যামের কণিকা মাত্র। দূরে গঙ্গার বলুচরা, পাশেই দর্গাগাঁয়ের মসজিদের মাথা উঁচু করে আছে। সামনে কৃষ্ণপুর। বাঁ দিকে বড় তোপখানার সামনে বিরাট দিঘীর জল টলমল্ করছে।

যুদ্ধব্যবসায়ী নই, তবুও সেকালের যুদ্ধবিদ্দের স্থান নির্বাচনের কৃতিত্ব দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আনমনা হয়ে দেখছিলাম, লতাহুর হাসির শব্দে ফিরে তাকালাম।

দেখছ বেলগাছটার কি অদ্ভুত ক্ষমতা। এই পাথরের টিলার ওপর দাঁড়িয়ে ইঙ্গিতে যেন জানিয়ে দিতে চাইছে মৃত্যুর মাঝ দিয়ে জীবনের সন্ধান। এই উন্মুক্ত প্রান্তরে সে দাঁড়িয়ে আছে জীবনের সব সম্পদ ভরা মাহুষের প্রতি কটাক্ষ করতে।

বললাম, বোধহয় সত্যি।

বোধহয় নয়, সত্য চিরকাল অহুমানের বাইরে। মীরকাশিমকে স্মরণ করবার মতো একটিও চিহ্ন ইংরেজ রেখে যায় নি। যদি কোন চিহ্ন থাকত

তাহলে বলতে পারতাম, জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানটায় কতটা ব্যবধান। বাংলার ভাগ্য নিদ্ধারিত হয়েছিল এই প্রান্তরে অথচ ইতিহাস উধুয়াকে বিশেষ কোন স্থান দিতে চায়নি।

বাংলা বিহারের সন্ধিস্থলে বাংলার ভাগ্য চিরকাল নির্ণীত হয়েছে। এই পথেই বক্তিয়ার এসেছিল, এই পথে শেরশাহ এসেছিল, এই পথেই এসেছিল মানসিংহ, তোডরমল, এই ভূমির পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে ভাগ্য স্থির হয়েছিল আলিবর্দীর, শওকতের, মীরণের, মীরকাশিমের, অথচ এটা বাংলা নয়। এখানকার মানুষ বাংলায় কথা বলে, বাংলায় লেখাপড়া করে, বাংলার কৃষ্টি বহন করে, অথচ এদের বাঙ্গালী বলে এদেশের শাসকরা স্বীকার করেনি। যারা এই অদ্ভুদ যুক্তিহীন কাজ করে মসনদ তৈরী করেছে, কেউ তাদের একাজের প্রতিবাদ জানায় নি। একদিন এখানেই এই যুক্তিহীন অবিবেচক শাসকদের ভাগ্য স্থির হতেও পারে। স্বদেশের ক্লীব শাসন ব্যবস্থা এই অন্যায়কে মেনে নিয়েছে কেবল প্রভু তোষণের যুক্তিতে।

লতাম্বু হাসল, বলল, আমরা যেন রাজনীতিতে মাথা গলাচ্ছি। আমাদের হিসাবের খাতায় রাজনীতির কথা লেখা হয়নি।

রাজনীতির যুপকাষ্ঠে নিজেদের বলী দিয়ে এসেছি, রাজনীতির অপজাত সন্তান আমরা, আমরা রাজনীতি বাদ দিয়ে চলতে পারি কি? যেদিন রাজনীতি সমাজ ও অর্থসম্পদকে নিয়ন্ত্রণ করবে, সেদিন মানুষ হবে সত্যকার স্বাধীন মানুষ। আর যতদিন সমাজ ও অর্থসম্পদ নিয়ন্ত্রণ করবে রাজনীতিকে, ততদিন মানুষ থাকবে ক্রীতদাসের পর্যায়ে। আমাদের দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থের প্রাচুর্য তাই এই অন্যায় ঘটেছে, আমরাও সেই অন্যায়কে মাথা পেতে নিতে বাধ্য হয়েছি। বিক্ষোভদানা বেঁধে উঠলেও প্রতিক্রিয়াশীলদের আঘাতে সে বিক্ষোভ প্রকাশ হবার পথ পাচ্ছে না। অসহনীয় এই অবস্থা।

লতাম্বু কোন জবাব না দিয়ে হাত ধরে টানতে টানতে নীচে নেমে এল। দ্বিতীয় তোপখানায় খাঁজকাটা তোপঘরগুলো এখনও 'হাঁ' করে রয়েছে শত্রুকে গ্রাস করতে।

ধীরে ধীরে উধুয়া গ্রামে এসে দাঁড়ালাম। বিরাট বটগাছের তলায় ভাঙ্গা সেতুটা মীরকাশিমকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আজও। সেতুর পাশ দিয়ে নালার আধ শুকনো বুকে এসে দাঁড়ালাম।

লতায় সেতুটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে বলল, যারা এই সেতু পাঁচইঞ্চি মাটির ইঁট দিয়ে তৈরী করেছিল তাদের স্থপতিবিদ্যা আজকের স্থপতিদের যোগ্যতার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। সেদিন সিমেণ্ট ছিল না, কেবলমাত্র চুণ শুরকি দিয়ে গেঁথে তুলেছিল এই সেতু। আজও চূণশুরকির পলেস্তারা অনেক জায়গাতেই অক্ষত হয়ে রয়েছে। কয়েকশত বৎসরে এর কোন পরিবর্তন হয় নি। পদ্মের পাঁপড়ির মতো নক্সা আঁকা রয়েছে সেতুর রেলিং-এ। কয়েকশত বৎসরের প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ সহ্য করেও দাঁড়িয়ে আছে এইটি। মনে হয় হিন্দু স্থপতিদের তৈরি এই সেতু। হিন্দু ভাস্কর্যের চিহ্ন রয়েছে এতে।

উত্তর না দিয়ে আমিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম বিরাট বটগাছ, ছায়াশীতল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে সে সেতুর মাথায়। বাসস্থান হয়েছে হরেক জাতের পাখীর। সুখের নীড় বেঁধে বাস করছে ওরা।

মীরকাশিম যখন পেছন থেকে আক্রান্ত হন, এই সেতুপথেই পালাতে হয়েছিল তাকে। ইংরেজ গোলন্দাজরা গোলা মেরে সেতু ভেঙ্গে দিয়েছিল। এই সেতুমুখে চৌদ্দশত বীর বাঙ্গালী দুপাশ থেকে আক্রান্ত হয়ে ইংরেজের সাথে লড়াই করতে করতে প্রাণ দিয়েছিল দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য।

উধুয়া থেকে ফিরে এসে আজ সিংহীদালানে বসে মীরকাশিমের কথা ভাবছিলাম। পলাশীর দাঙ্গায় সিরাজকে পরাজিত করে বাংলার স্বাধীনতা লোপ পায়নি। যে টুকু ক্ষমতা ইংরেজ পেয়েছিল তা চুর্ণ বিচুর্ণ হত যদি উধুয়াতে বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে মীরকাশিম পরাজিত না হত। বাংলার স্বাধীনতা সূর্যের অস্তগমনের সূচনা হয়েছিল পলাশীতে, বাস্তবত অস্ত গিয়েছিল উধুয়াতে। দেশপ্রেমিক বাঙ্গালীর পক্ষে উধুয়া হোল মহাতীর্থ।

আশ্রয়হীন মীরকাশিম ছুটে চলল আশ্রয়ের আশায়। রাজধানী মুঙ্গেরে নয়, রাজধানী ছেড়ে অনেকদূরে অযোধ্যায়। বাংলার গৌরব কাহিনী যবনিকার অন্তরালে লুকিয়ে গেল।

সিংহীদালানে আশ্রয় নিয়ে রাত শেষ হল।

আবার সকাল হল।

মীরকাশিম স্মৃতির অতলে ডুবে গেল।

কোথায় যাব ঠিক নেই।

টমটমওলাকে বললাম, চলো তালঝারি।

দুচাকার ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়া উদ্দাম বেগে ছুটছে আর হোঁচট খাচ্ছে। কাঁচা রাস্তা, রাঙ্গামাটির ধুলোতে ভর্তি বাদশাহী শড়ক, দুপাশে ধ্বংসস্তূপ রয়েছে, বাদশাহী শাসনের অবসান ঘোষনা করতে।

একশত সত্তর মাইলের খাম্বার কাছে এসে টমটমওলা গাড়ি থামালো। বলল, মীরণের কবর।

লতাহু মুখ ফিরিয়ে বসল।

নারকোল বাগানের মাঝে একশত সত্তর মাইলের খাম্বার পেছনে দুটো জরাজীর্ণ ইঁটের ভাঙ্গা কবরের চিহ্ন দেখিয়ে গাড়োয়ান বলল, এই হল মীরণের কবর।

বিশ্বাস হল না।' জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন করে তুমি জানলে ?

টমটমওয়ালা বলল, আমি জানি, আমার বাবা জানতো, আমার ঠাকুরদা জানতো। এইভাবেই জেনে এসেছি।

তা বটে, মীরজাফর বেঁচে থাকতেই মীরণের মৃত্যু হয়েছিল। তখনও মীরজাফরের পতন হয়নি, অথচ একখানা পাথর দিয়ে মীরণের কবর বাঁধাবার ব্যবস্থা হয়নি এই পাথরের দেশে, আশ্চর্য।

গাড়োয়ান উত্তর খুঁজে না পেয়ে বলল, তা তো ঠিক।

লতাহু এ প্রশ্নের মীমাংসা করল।

বলল, মীরণের মৃত্যু নয়, তার মৃত্যুর পেছনে ছিল চক্রান্ত। ইংরেজ জানতো, মীরজাফরের সকল শক্তির উৎস মীরণ। মীরণ তখন সিপাহীসালার। কুষ্ঠরোগগ্রস্থ মীরজাফরের অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসলেও ছোট নবাব মীরণ ভবিষ্যতে ইংরেজকে মাথা তুলে দাঁড়াতে বাধা দেবে এ ভয় ছিল। তাই মীরণের মৃত্যু এল প্রত্যাশিতভাবে অথচ অস্বাভাবিকতার মাঝ দিয়ে।

দিল্লির রোশনাই তখন কমেনি।

ফরমান দেবার ক্ষমতা ছিল বাদশাহ শাহআলমের। বাদশাহী পাবার লড়াই চলছে পুরাদমে। ভাগ্যান্বেষী আলিগোহর এসে তাঁবু খাটিয়েছিল তালঝারির মাঠে। হঠাৎ সংবাদ এল আলিগোহর দিল্লির বাদশাহী পেয়ে শাহআলম হয়েছে, মীরজাফর দেখল মহা সুযোগ, বাদশাহী ফরমান পাবার

এই হল উপযুক্ত সময়। পাটনা থেকে লড়াই ফতে করে মীরণ ফিরছিল রাজমহলে, তাকে ফরমান আনতে পাঠাল মীরজাফর।

বর্ষাকাল মীরণ চলল বাদশাহের শিবিরে। সাথে চলল কয়েকজন দেহরক্ষী।

ইতিমধ্যে ইংরেজ মীরকাশিমকে কব্জায় এনেছে। মসনদে বসবার লোভ দেখিয়েছে। মীরণ বেঁচে থাকতে মীরকাশিমের মসনদ পাবার কোন আশাই নেই। ষড়যন্ত্র হল, স্থির হল মীরণকে ধরাধাম থেকে বিদায় দেবার।

কিন্তু কাজটা সহজ নয়।

মীরকাশিম বিশ্বস্ত কজন জহ্লাদকে ভর্তি করে দিল মীরণের দেহরক্ষীর দলে।

মীরণ চলেছে বাদশাহের শিবিরে। সাথে চলেছে মীরকাশিমের ভাড়াটিয়া জহ্লাদ আত্মগোপন করে।

বৃষ্টি এল ঝমাঝম। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মাঝে মাঝেই মেঘের ডাক। মীরণ বিরাট শালগাছের তলায় ঘোড়া দাঁড় করিয়ে বিশ্রাম নিতে লাগল। অন্যমনা হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল বৃষ্টি থামবার।

তারপরের ইতিহাস অজ্ঞাত। পেছন থেকে ফাঁস জড়িয়ে দিল জহ্লাদরা। শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গেল মীরণ। ইংরেজ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, মীরকাশিমের মসনদের রাস্তা উন্মুক্ত হল।

সংবাদ রটানো হল মীরণের মৃত্যু হয়েছে বজ্রপাতে। যেখানে মীরণের মৃত্যু হয়েছিল সেখানেই সাত তাড়াতাড়ি কবর খুঁড়ে মীরণকে শুইয়ে দিল মীরকাশিমের অনুচররা।

সংবাদ পৌছালো মুর্শিদাবাদে। অক্ষম মীরজাফরের করবার কিছুই নেই। যাওবা ভরসা ছিল তাও শেষ হয়ে গেছে ওলন্দাজদের সাথে চক্রান্ত করে। ক্লাইভের চোখকে ফাঁকি দেবার সাধ্য ছিল না মীরজাফরের, বেগতিক দেখে মদ-ভাঙ্গ আর মেয়েমানুষ নিয়ে মীরজাফর শেষের দিনগুলোকে রঙীন করে তোলবার চেষ্টা করল। ক্লাইভ তার এই গাধাটিকে কৃপা করত, তাই অঘটন তখনও ঘটেনি। ক্লাইভ গেল পিতৃভূমিতে ফিরে, গদীতে বসল ভান্সিসৃটার্ট। সে এসেই মীরজাফরকে বিতাড়িত করে মীরকাশিমকে তক্ত-এ বসাবার ব্যবস্থা শেষ করল। ইতিমধ্যে ইংরেজদের ফৌজ এসে প্রাসাদ ঘেরাও করে মীরজাফরকে টেনে নামালো মসনদ থেকে। হতভাগ্য

মীরজাফরের জন্য অশ্রুপাত করবার কেউ ছিল না, মীরণের জন্য অশ্রুপাত তো অলীক ঘটনা।

মীরণ অজ্ঞাত হয়ে রয়ে গেল রাজমহলের এই নির্জন নারিকেলকুঞ্জে।

ঘটনাগুলো নিপুনভাবে বলে লতাহ্ চুপ করে গেল।

গাড়ি এল মঙ্গলহাটে। পাহাড়ের উপর বিরাট মসজিদ। মসজিদ নয় দুর্গ। লোকে বলে মানসিংহের মসজিদ।

মানসিংহ সুবেদার। লোক প্রবাদ, মানসিংহের আশা ছিল বাংলাকে দিল্লির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করবার। সেই কারনেই বাংলার প্রবেশ পথে রাজমহলের প্রবেশ মুখে তৈরী করেছিল এই দুর্গ।

সংবাদ যথা সময়ে আকবর বাদশাহের কানে পৌছালো। আকবর ফৌজ নিয়ে ছুটে আসলো বাংলায়। যথাসময়ে এই সংবাদও পেল মানসিংহ। সেও রাতারাতি দুর্গকে মসজিদে পরিণত করে দিল।

আকবর সতেরদিন বাস করেছিল বাংলায়। সতের দিনেই গঙ্গার তীরে বিরাট বাদশাহী মসজিদ তৈরী করালেন। সেই মসজিদে নমাজ পড়ে আকবর ফিরে গেল দিল্লিতে।

ইতিহাসের কোন পৃষ্ঠায় এসব কাহিনী লেখা আছে কিনা জানি না, কিন্তু মানসিংহের মসজিদের খ্যাতি আজও আছে।

গাড়ি এগিয়ে চলল। বাঁদিকে মোড় ঘুরতেই বললাম, সোজা বাদশাহী শরক বরাবর চল।

মঙ্গলহাট।

হাট পেরিয়ে বাদশাহী সেতু। সেতুর সাথে প্রকাণ্ড চবুতরা। গাড়ি থেকে নেমে এসে বসলাম ঐ চবুতরায়।

এই সেতুর কিনারায় দিল্লি থেকে বাদশাহ এসে তাঁবু খাঁটিয়েছিলেন। মীরণ এই অখ্যাত স্থানেই আসছিল ফরমান নিতে।

এখানেই বেগমদের বনাত ঢাকা হারেম তৈরী হয়েছিল একসময়। এখানেই যুবতী নর্তকীর নুপুরধ্বনি শোনা গেছে একসময়, এখানেই মদিরার প্লাবন হয়ত বয়ে গেছে, এখানেই সারেঙ্গের মধুর আলাপ শোনা গেছে। নাই, কিছু নাই আজ। একটি চিহ্নও কেউ রেখে যায় নি।

বাদশাহ ফিরে গিয়েছিলেন।

মীরজাফরের গদীও তখন ধুলিস্যাৎ হবার উপক্রম।

ইতিহাসের নতুন পৃষ্ঠায় আরেকটি কলঙ্ক কাহিনীর অধ্যায় লিপিবদ্ধ হতে থাকল সবার অজানায়।

ভাবতে ভাবতে ঝিমিয়ে গেছি। তারপর এসে বসলাম গাড়িতে। গাড়ি আবার ছুটল।

ঘণ্টায় পাঁচ সাত মাইল এগোচ্ছি।

কানাই নাটশালের পাহাড়ে আসতেই লতান্থ বলল, এখানে মহাপ্রভু এসেছিলেন। তার পায়ের চিহ্ন রয়েছে এখানে। চলো দেখে আসি।

গঙ্গার বুক ভেদ করে উঠেছে শক্ত পাথরের ছোট টিলা তার উপর রয়েছে কানাইয়ের মন্দির। মহাপ্রভুর পায়ের ছাপ বলে যা দেখান হয় তাতে বাস্তবের চেয়ে কল্পনা অনেক বেশি, বাস্তবতা ও সৌন্দর্যের চেয়ে ভক্তির প্রাধান্য অত্যধিক।

নদীর কিনারায় বুনো গাছের ঝোপ। ঝোপ নেমে গেছে নদীর কিনারায়। গাঁয়ের মেয়েরা কলসী ভর্তি করে জল নিয়ে আসছে ঝোপের মাঝ দিয়ে দোপায়া পথ ধরে।

দুপুর গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। দুজনে এসে বসলাম একটা বড় পাথরের ওপর। বিকেলের মিঠে বাতাস বইতে শুরু করেছে। গঙ্গার বুকে ছোট ছোট ঢেউ একে অপরের গায়ে আছড়ে পড়ছে। ঝোপ থেকে ডেকে উঠল, কুহু।

লতান্থ সচকিতভাবে বলল, চলো ফিরে যাই।

ফিরে এলাম সিংহী দালানে।

সকাল বেলায় নদী পেরিয়ে এলাম মানিকচকে।

দুদিন কেটে গেল পথে। একদিন রইলাম শহরে।

'ক্ষীণকায় চালক ও ক্ষীণতর অশ্বতর নয়নানন্দকর না হলেও তারাই এগিয়ে নিয়ে চলল গৌড়ে। শহর ছেড়েই ইঁটের রাস্তায় লাফাতে লাফাতে গাড়ি

ধীর মন্থর গতিতে চলেছে। কিছু দূর এগিয়ে রাস্তা দুভাগ হয়েছে, বাঁ দিকের রাস্তা বরাবর গাড়ি ছুটছে।

লতাহুকে বিশেষ চিন্তিত মনে হল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ভাবছ?

ভাবছি গঙ্গার এপার আর ওপার। দুপারেই বাংলার রাজধানী গড়ে উঠেছিল নদীরূপী জননীর স্তন্য পান করে, আবার ধ্বংস হয়ে গেছে দুপারের এই ইতিহাসখ্যাত রাজধানী। অতীত যেন বলতে চাইছে, নতুনের করুণ পরিণতির কথা।

এতো চিরকালের সত্য।

এরই পাশাপাশি তীর্থভূমি নবদ্বীপের কথাটা ভেবে দেখ, মানুষের ভক্তিকে কি নির্মমভাবে অর্থকরী খাতে বইয়ে দিয়েছে সেখানকার লোভী মানুষের দল। গৌরাঙ্গ বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন বহু শতাব্দী থেকে। মহাকালের গতি বন্ধ হয়নি, ভাঙ্গাগড়ার শেষ নেই, কিন্তু মানুষের মন যে কোনরূপ পরিবর্তন স্বীকার করেছে তা মনে হয় না ঐ নবদ্বীপের ভূমিতে পা দিলে। গৌরাঙ্গ হয়েছেন ব্যবসায়ের মূলধন। ব্যবসায়কে পুণ্যকার্য বলে প্রচার করবার জন্য স্থান মাহাত্ম্য ঘোষণা করছে ওরাই। তাই প্রভুর চরণ দর্শনের পূর্বে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে।

হেসে বললাম, এতে অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই বেশি। যদি ট্যাক্স না নিত তাহলে প্রভুর চরণ দর্শন সম্ভব হত না। ট্যাক্স দিতে যারা পারে না তারাও ভীড় করত প্রভুর মন্দিরে। সেই ভীড়ে প্রভুকে দেখতে পেত না যারা প্রভুর চরণ দর্শনপ্রার্থী বিত্তবানের দল। শুধু তাই নয়, এই মন্দির-গুলোর ব্যয় সঙ্কুলান করবার পথও থাকতো না। যত্ন নেবার লোকের অভাবে এগুলো ধ্বংস হয়ে যেত। এর চেয়ে ট্যাক্স অনেক ভাল নয় কি?

লতাহু হাসল।

বললাম, হাসছ কেন?

ধর্মকে ব্যবসারূপে যারা রূপান্তরিত করেছে তারা হল ধার্মিক, এই সুচতুর ধর্মধ্বজীরদল ধর্ম বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে যা সঞ্চয় করছে, তার চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশি হারাচ্ছে মানুষ সমাজ। বিশ্বাসের মূলে আপনা থেকেই ঘুণ ধরেছে, একদল মানুষ ঘৃণা করতে শিখেছে এই সব পাষণ্ডদের।

সমাজ বিরোধী এই অর্থগৃধ্নুরা নিজেরা লাভ করছে ঘৃণা, আর ধর্মব্যবস্থা হারাচ্ছে মানুষের আস্থা। এই অনাকাঙ্খিত অবস্থা যে কেউ দেখতে পায়, অথচ সমাজের ঐ সব পাপী নিজেদের সংযত করে না। তাই হাসছি, অবশ্য এ হাসি সুখের নয়, দুখের নয়, অনুকম্পার। এর চেয়ে ভাঙ্গা মন্দির আর মসজিদগুলো বেশি শ্রদ্ধা পাচ্ছে মানুষের কাছে। দেশদেশান্তরের মানুষ ছুটে আসছে এগুলো দেখতে, এখান থেকে জীবনের শিক্ষা গ্রহণ করতে, আর ঐ ব্যবসায়ীর দলকে উৎখাত করতে আরেক দল মানুষ তৈরী হচ্ছে নবজীবনের বাণী বহন করে সবার অজ্ঞাতে।

আবেগের কম্পন দেখা দিল লতানুর সর্বাঙ্গে। কথা শেষ করে চুপ করে গেল সে।

গাড়ি তখনও চলছে, হোঁচট খেয়ে খেয়ে এগোচ্ছে।

গৌড়দুর্গের প্রাচীর আরম্ভ হয়েছে। মাটীর উচু বাঁধ দিয়ে ঘেরা ছিল গৌড়। গাড়ি যতই এগোতে থাকে ততই ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়তে থাকে।

গাড়োয়ান গাড়ি দাঁড় করালো পিয়াসবাড়িতে। সামনেই ডাকবাংলো, বাংলোর দরজাতে ধাক্কা দিতেই মালী ছুটে এল। বললাম, আজ থাকব এখানে, দেখব গৌড়। খাবার ব্যবস্থা কর।

মালী বেরিয়ে যেতেই লতানু বলল, বেশভুষা বদলাবার সাথে সাথেই মেজাজ বদলেছে দেখছি।

স্বাভাবিক, যাত্রার দলের রাজারা আসরে নেমে নিজেকে যদি রাজা মনে করতে না পারে তা হলে অভিনয় কখনই সফল অভিনয় হয় না।

লতানু আমার কথার সাথে যোগ না দিয়ে বলল, আজ বিশ্রাম। গাড়ি ছেড়ে দাও। কাল গৌড় দেখতে যাব, প্রয়োজন হলে গাড়ি খুঁজে নেব।

প্রস্তাব মন্দ লাগল না।

গৃহীর সাজ গ্রহণের সাথে সাথেই লটবহর বৃদ্ধি করে ফেলেছিলাম। সেগুলি যত্ন করে রাখবার প্রয়োজন বেশি। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর যা প্রয়োজন হয় না, তা প্রয়োজন হয় সাধারণ সংসারীদের। অতি সহজভাবেই কতকগুলি জিনিষ ক্রয় করতে হয়েছে। চলবার পথে লিভিং লগেজ এবং

ডেড লগেজ কোনটা থেকেই নিষ্কৃতি পাইনি। গাড়িটা বহন করবার একমাত্র বাহক, তাই গাড়ি ছেড়ে দেবার ইচ্ছা ছিল না, তবুও ছাড়তে হল।

লতাহু স্নান করতে গেল।

বিছানা পেতে নিলাম।.

নিজেও গামছা হাতে করে স্নানে বের হলাম। স্নান করে এসে দেখি লতাহু বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে। দু বছব পেবিয়ে গেছে, বিছানা পেতে শোবার সৌভাগ্য হয়নি। নতুন তুলতুলে তোষক ঢাকা রয়েছে রঙীন চাদব দিয়ে। প্রলোভন জাগল গা এলিয়ে দেবার। উপায় নেই, লতাহু আমার জন্য স্থান বাখেনি। লতাহুকে শুতে দেখে সরকারের অযত্ন রক্ষিত খাটে গা এলিয়ে দিলাম। ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন দুজনেই, কিছুক্ষণেব মধ্যেই ঘুমিযে পডলাম।

মালী না ডাকলে ঘুম ভাঙতো না কারুবই।

খেতে দিচ্ছিল মালা। তাকে জিজ্ঞাসা কবলাম, গৌড় দেখিযে আনতে পারবে।

না বাবু, বাংলো ছেড়ে যেতে পাবব না। জানাশোনা লোক আছে। যদি হুকুম হয তাকে ডেকে দিতে পাবি।

বেশ তাই দিও।

কিন্তু বাবু হেঁটে এত পথ একদিনে ঘুরে আসা সম্ভব হবে না।

যদি না পাবি তা হলে গাডি নেব। আগে পা দুটোকে ভরসা করেই বওনা দেব।

বিকেল বেলায় লতাহুকে ডাকলাম। বললাম, চলো দুজনে দিঘীর কিনারায গিয়ে বসি।

লতাহু বলল, আজ নয়।

কবে?

তা জানি না।

চুপ করে বসে বইলাম। লতাহু আমাব মুখের ওপর পরীক্ষকের মতো দৃষ্টি স্থাপন করে বলল, রাগ করলে?

না।

এও রাগের কথা। বেশ চলো।

বললাম, অনিচ্ছুক সহযাত্রী সুখকর নয়।

লতাম্বু প্রশ্ন করল, তুমিই বা দিঘীর কিনারায় যেতে চাইছ কেন?

কেন, সে কথা তুমি বুঝবে না।

নিশ্চয়ই বুঝব। বল।

মনে কর ঐ দিঘীর কিনারায় বসে থাকতে থাকতে আমি টুপ করে জলে পড়ে গেলাম। আর উঠতে পারলাম না। নিয়তি নিজ নিকেতনে আশ্রয় দিল।

ওটাতো কল্পনা।

কল্পনার মাধুর্য বাস্তবের চেয়ে বেশি আনন্দ সৃষ্টি করে। কল্পনাকে সাময়িক ভাবে সত্য বলে মেনে নাও। মনে কর, তুমি আমার পাশে বসে রয়েছ, বিকেলের পড়ন্ত রোদের আভা এসে পড়েছে তোমার মুখে, বাতাসে বয়েছে ঘুমপাড়াণী মদিরা, আমের ঝোপে ইসারা জানাচ্ছে কুহুধ্বনি। এমন সময় আমার মৃত্যু এল আকস্মিকভাবে। এইরূপ একটি মুহূর্ত্ত চিন্তা কর। আমার আক্ষেপ থাকবে না, হৃদয় দিয়ে তোমাকে বুঝবার চেষ্টা করব, হৃদয় দিয়ে তুমিও অনুভব করবে। একদিন তো যেতেই হবে পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে। সেদিন বিদায় আসবে অলক্ষ্যে, দেহ হবে শীর্ণ, মন হবে আঘাত জর্জ্জরিত। সেদিন সেই বিদায় হবে আক্ষেপভরা কিন্তু আজকের বিদায় হবে না আক্ষেপভরা। এটুকু শুধু কল্পনায় উপভোগ করতে চাই। বাস্তব মৃত্যু, মৃত্যুর সৌন্দর্য্য, গভীরতা, গাম্ভীর্য্যকে উপভোগ করবার অবসর দেয় না, কল্পনায় সেগুলো প্রাণের সাথে উপলব্ধি করতে চাই। যাবে লতাম্বু?

লতাম্বু স্তম্ভিতভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে বসে ছিল। আমার সাদর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারল না, তার হৃদয়-দুর্ব্বলতার সূক্ষ্মকোণে আঘাত করল আমার আমন্ত্রণ, সেখানে বোধহয় লহরী উঠেছিল নতুন জীবনের। লতাম্বু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো।

দুজনে এসে বসলাম দিঘীর ঘাটে। পেছনে রয়েছে পিয়াসবাড়ির দুটি প্রস্তরস্তম্ভ। কেউ বলে ওটা ছিল বধ্যভূমি, কেউ বলে ওটা ছিল সব চেয়ে বড় ওমরাহের প্রাসাদের স্তম্ভ। যে যাই বলুক, বধ্যভূমির জন্য অতো সুন্দর

কারুকার্যমণ্ডিত স্তম্ভের প্রয়োজন মোটেই ছিল না কোন কালে। ধনীর বিলাস ব্যসনের প্রতীক বলেই মনে হল।

কেন যে পিয়াসবাড়ি নাম হল এমন স্বচ্ছ সলিলা দিঘীর কিনারা তা কে জানে। পিয়াস মেটাবার জন্যই দিঘীর সৃষ্টি কিনা কে জানে। সুলতানী আস্তাবল ছিল এর কিনারায়, চলতি পথের পথিক এসে বিশ্রাম নিত সেই ঘাটে, আরও কত কী ঘটেছে এখানে কে জানে, রয়েছে দিঘী আর তার নাম।

দিঘীর পাশে বসলাম। দিঘীর স্বচ্ছজলে রোদের আভা এসে পড়েছে, সেই রোদে রাঙ্গা হযেছে লতানুর মুখ। মুখের কালো খামচানো দাগগুলো তখনও ব্যঙ্গ করছে তার রূপকে। দিঘীর জলে বাতাসের ঢেউ উঠেছে। ছলাত ছলাত করে ঢেউ আছড়ে পড়ছে কিনারায। আমাদের পাযে আঘাত দিয়ে শিহরণ জাগাচ্ছে দেহে ও মনে।

লতানু বলে উঠল, মৃত্যু তোমার আসবে না, আসলেও এত সহজে আসবে না। কল্পনার মৃত্যু সাহচর্যের সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হোক।

আমি কোন উত্তর না দিয়ে যেমন জলে পা ডুবিযে বসেছিলাম তেমনি বসে রইলাম।

লতানু বলল, এটা হল, সুলতান বেগমদের দেশ। তোমার সুলতানী মেজাজ থাকলে বিপদগ্রস্থ হব আমি। সুলতানী কেতাবে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেই সুলতানী অতীতকে বাদ দিযে বর্তমানকে কেন্দ্র করে বাস্তবকে বিচার কর। ভাঙ্গা ইমারত মেরামত করে বর্তমানকে ব্যঙ্গ করবার অক্ষম প্রয়াসকে প্রশংসা করা বাতুলতা, তেমনি সুলতানের দেশে এসে সুলতানের মন নিয়ে কল্পনায মৃত্যুকে ডেকে আনলে আনন্দ সৃষ্টি হবে কি, মোটেই নয়। এও এক রকম ব্যঙ্গ।

হঠাৎ জিজ্ঞাস করলাম, লতানু তুমি কাউকে ভালবেসেছ।

এ প্রশ্ন কেন!

মাঝে মাঝেই মনে হয়, তোমার সম্বন্ধে আমি আঁধারে বাস করছি। শুধু শুনেছি পরপীড়ণের হাত থেকে বেঁচে এসেছো, আসবার সময় অত্যাচারীর পীড়ণ ব্যবস্থাকে নিশ্চুপ করে দিয়ে এসেছো। অনেকদিন ভেবেছি, তুমি সেই লতানু কিনা। যে লতানু মানুষের গলায় অস্ত্রের আঘাত হানতে পারে,

যে লতাস্থ পাশবিকতার চিহ্ন মুছে ফেলতে সন্তানের শ্বাস রোধ করতে পারে, এ সেই লতাস্থ কিনা! সর্বক্ষেত্রেই লতাস্থর পরিচয় পেয়েছি হৃদয়হীনারূপে, তাই জানতে ইচ্ছে হয়েছে, তুমি কি, কে ও কেমন?

মুহূর্তে লতাস্থর মুখের চেহারা বদলে গেল। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসছে, সেই আঁধারে তার মুখখানা ভয়ঙ্কর মনে হতে লাগল।

বলল, আমিও জানতে চেয়েছি, তুমি কি, কে ও কেমন? জানাজানি কারুরই হয় নি। অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমানকে নিয়ে যদি অগ্রসর হতে না পারি তা হলে অতীত পরিচয়ের প্রাচীর ব্যবধান সৃষ্টি করবে, সে ব্যবধান থেকে মুক্তি পাবার আশা কম রইবে। জানবার ইচ্ছে স্বাভাবিক, অনেক ক্ষেত্রে জানবার ইচ্ছা স্বাভাবিক নাও হতে পারে। তবে মনে হয় তোমার মনে যে প্রশ্ন জেগেছে সে প্রশ্নের জবাব না পেলে মনের কোণায় যে মেঘ উঠেছে সে মেঘ থেকেই যাবে।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে দিঘীর শেষ কোণায় চোখ রেখে বলল, চলো ডাক বাংলোয় সেখানে বসে গল্প করব।

বারান্দায় দুখানা চেয়ার টেনে সামনাসামনি বসলাম। মালী আলো জ্বেলে দিয়ে গেল। যাবার সময় বলল, একটু সাবধানে থাকবেন, বাঘের উৎপাত হয়েছে। সাড়াশব্দ না দিয়ে বাইরে বের হবেন না।

মালী চলে যাবার পর লতাস্থ বলল, এতদিনে মাঠে ঘাটে জঙ্গলে ঘুরেছি, কোন সময়ের জন্য বাঘের কথা ভাবিনি। সেদিন বন ছিল আমাদের ঘর তাই বন্য জীবনের স্বাভাবিক ভীতির কথা ভাবতে হয় নি। এখন সভ্যতার মুখোস পরেছি তাই সভ্য জগতের বাইরে যারা বাস করে তাদের ভয় করতে হয়। যারা ভয় করে না তারা আমার মতো ছন্নছাড়া জীবনের মাঝে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হয়।

লতাস্থ নিজের মনেই বলল, ঢাকায় ছিলাম। পিতামাতার অর্থের অভাব ছিল না, ছিল না অন্য কোন অভাব। শিক্ষায় দীক্ষায় আমরা ছিলাম এগিয়ে। একটি মাত্র ত্রুটি ছিল আমাদের পরিবেশে। যারা আমাদের প্রতিবেশী তারা বেশির ভাগই সধর্মী নয়। দাঙ্গা লাগল, সবাই বলল, পালিয়ে যাও। বাবা বললেন, কেন পালাব। যারা আমাদের পাশে রয়েছে তারা আমাদের স্বজন।

সত্যই তারা স্বজন তবে সজ্জন নয়। একদিন ওরাই হামলা করল আমাদের ওপর। বাবা মাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলল আমার সামনে। অজ্ঞান হযে মাটিতে পড়ে গিযেছিলাম। যখন জ্ঞান হল তখন দেখলাম, আমি কয়েদী। বহু পুরুষের ভোগ্য একটি যন্ত্র। আমাব শিক্ষা, দীক্ষা, সমাজ, সম্ভ্রম কিছুরই দাম নেই ওদের কাছে। করুণা পাবাব কোন সম্ভাবনা নেই।

মনস্থির করে ফেললাম। আতঙ্কের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছি তখন। প্রস্তুত হলাম দ্বিতীয অধ্যাযের জন্য। শোধ নিযেছি। এমন শোধ নিয়েছি যা যুগ যুগ ধরে ওরা মনে রাখবে। অসহায় দুর্বলের ওপর যারা অত্যাচার করে তাদের প্রতি অনুকম্পা থাকা উচিত নয়। আমারও ছিল না। ক্ষমার কৃতিত্ব রয়েছে, সে কৃতিত্বের দাবীদার সক্ষম, যে অক্ষম, ক্ষমা তার ধর্ম নয়, পাপ। অক্ষমতাকে ক্ষমার আভরণ যারা পরিয়ে দেয় তারা বঞ্চক। তাই ক্ষমা করতে পারিনি। ক্ষমা না করাই দুর্বলের অস্ত্র। সেই ক্ষমাহীন নির্মমতাকেই ধর্ম বলে মেনে নিয়েছিলাম।

বাধা দিযে বললাম, অনেক প্রশ্নের উত্তর পেযেছি, একটি প্রশ্নের উত্তব দাও নি। তুমি কাউকে কখনও ভালবেসেছ কি ?

তার আগে আমাব প্রশ্নেব জবাব দাও. তুমি কি শেফালি বউদিকে ভালবাসতে না ?

এ প্রশ্নের উত্তব আমি আজও খুঁজে পাইনি।

স্বাভাবিক। শেফালি বউদিব সাথে তোমার সমস্বার্থ স্থির করে দিযে-ছিল অভিভাবকরা তাই সে অপবিত্যাজ্য ছিল। অপরিচিতা একটি যুবতীকে সঙ্গী পেয়েই তাব কাছে দাসখত লিখে দেওয়া যায না যে আমি তোমাকে ভালবাসি, তেমনি অপরিচিত যুবককেও দাসখত দিতে পারে না কোন নারী। ভাগ্যের বন্ধন অথবা ভগবানের দান বলে মেনে নিয়ে ওরা ভালবাসার ট্রেনিং নেয় সারাজীবন অথবা ভালবাসার অভিনয় করে তারা। আমার মনে হয় এই কারণেই শেফালি বউদিকে তুমি ভালবাসতে পার নি কোনদিন।

কি বলছ লতানু ?

যা বলছি তা মিথ্যে নয়। কন্যার পিতা বহু মূল্যে পাত্র ক্রয় করে—অন্তত আমাদের সমাজে। ক্রীত মানুষকে কেউ কখনও ভালবাসে না, অনুকম্পা

করে, সহানুভূতি দেখায়। মেয়েরা তাদের পিতৃকুলকে ভালবাসে না এতো নয়। তাই নিগৃহীত পিতামাতার দৈন্যদশা যখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন যাকে কেন্দ্র করে এত ঘটনা ঘটে তাকে মনের সাথে মেয়েরা গ্রহণ করতে পারে না, কেবলমাত্র জৈবিক প্রয়োজনে পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্য কামনা করে। নির্মম পশুজাতের সাথে তাদের পার্থক্য থাকে শুধু বাহ্যিক ভঙ্গীতে।

এত তুমি জান?

জানি না। জানবার প্রয়োজনে জানতে চেষ্টা করছি। যদি শেফালি বউদিকে আপনি ভালবাসতেন তাহলে সময়ের চক্রে তাকে পিষে ফেলতে পারতেন কি? তাই আমার ক্ষেত্রেও ভালবাসাটা যাচাই করবার প্রয়োজন রয়েছে। ভালবাসা একমুখী নয়। এ হল সেতারের তার, বাজিয়ের স্পর্শ তার বুকে মূর্চ্ছনা জাগায়। বাজিয়ে যদি অক্ষম অশক্ত হয় মূর্চ্ছনা কখনও জাগে না। ভালবাসা নীড় রচনা করতে পারে নি আমার মনে কেননা আমার সেতার সেই বাজিয়ের সামর্থ্যপূর্ণ স্পর্শ পাবার আশায় উন্মুখ, কিন্তু তেমন বাজিয়ে পাই নি। কাকে ভালবাসি তা বুঝবার সময় হয়নি, বুঝিয়ে বলবার মতো সুযোগও হয় নি।

নীরবে উঠে গিয়ে নিজের বিছানায় চুপ করে শুয়ে রইলাম। আমার প্রশ্নের জবাব পেয়েছি, লতানু আগের মতোই ঘোলাটে হয়ে রইল। প্রশ্ন করবার ইচ্ছা আপনা থেকেই লোপ পেয়ে গেল। লতানু তেমনি ভাবেই চেয়ারে বসে রইল। কোথায় ঝড় উঠেছে, ঝড়ের প্রচণ্ড আঘাত মাঝে মাঝে কুঞ্চিত ভ্রুভঙ্গীতে ফুটে উঠছিল।

সকাল বেলায় প্রস্তুত হয়ে নিয়েছি গৌড় বেড়াতে যেতে। একখানা জিপ এসে দাঁড়াল ডাকবাংলোর সামনে। গাড়ি থেকে লটবহর নিয়ে নামলেন একজন ইঙ্গ-পোষাকধারী বাঙ্গালী ভদ্রলোক, পেছনে নামলেন সন্তান কোলে নিয়ে তার স্ত্রী।

লতানু উঁকি দিয়ে ফিরে গেল।

সামনে ছিলাম, আমাকেই জিজ্ঞাসা করল, মালী কোথায় জানেন?

ঐদিকের রান্না ঘরে।

জায়গা হবে এখানে?

একখানা ঘব খালি আছে, হওয়াতো উচিত।

আপনারা বুঝি গৌড় দেখতে এসেছেন?

আজ্ঞে হাঁ।

আমরাও। আপনাদেব দেখা হযে গেছে কি?

আজ্ঞে না। এই মাত্র যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম।

চলুন একসঙ্গেই যাব। বাস্তায সঙ্গী পেলে নিশ্চয়ই সময় ভাল কাটবে।

তা বটে কিন্তু শ্রীমতীকে না জিজ্ঞেস কবে বলতে পাবছি না।

ভদ্রলোক হাসলেন। তাব স্ত্রীব মুখখানা বাঙা হযে উঠল।

লতাহু এসে দাঁড়িয়েছিল পেছনে। আমাব কথাব সাথে কথা জুড়ে দিযে বলল, শ্রীমতীব জন্য অতো ব্যস্ত কেন!

লতাহুব কথায জবাব না দিযে ভদ্রলোককে লক্ষ্য কবে বলনাম, এবাব আপনারাই ঠিক কবে নিতে পাববেন।

মালী এসে জানাল, গৌড় দেখাবাব মতো লোক এসেছে।

নতুন অতিথিব মালপত্র তুলে নিল খালি ঘবখানায।

ভদ্রলোক বললেন, আমাদেব সামান্য একটু দেবী হবে। তবে বেড়াতে যেতে কোন অসুবিধা হবে না। গাড়িতে কবেই সবাই যাব।

জিনিষপত্র গুছিয়ে কোলেব শিশুকে খাইযে নিযে সস্ত্রীক ভদ্রলোক জীপে উঠে আমাদেব বসবাব ব্যবস্থা কবে দিলেন।

গাড়ি ছুটল।

ডান দিকে বাঁক ফিবে গাড়ি এসে দাঁড়াল বামকেলিতে। সামনে রূপ-সনাতনেব দিঘী।

সামনেব কেলিকদম্ব বৃক্ষমূলে মহাপ্রভুর পদচিহ্ন আঁকা বযেছে কালো পাথরে। কানাই নাটশালেব মতো অস্বাভাবিক নয এ-পদচিহ্ন। মানুষেব পায়েব ছাপ নিযে পাথবে খোদাই কবা হয়েছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসেব সংক্রান্তিতে মহাপ্রভু ভক্ত রূপ-সনাতনেব সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। এই কদম্ববৃক্ষ-তলে প্রভু বিশ্রাম নিযেছিলেন। তারই স্মারক তাঁব পদচিহ্ন।

প্রভুর আগমনকে স্মরণ করতে দেশের মানুষ আজও সমবেত হয

রামকেলিতে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে। মদনমোহনদেবের মন্দিরে উৎসব হয়, অজস্র বৈষ্ণবের ভীড় জমে রামকেলিতে।

সুলতান হোসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন রূপ ও সনাতন। মাধাইপুরের ভগ্ন কুটীর ছেড়ে দুই ভাই এসেছিল গৌড়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতে। ভাগ্যপরীক্ষায় জয়লাভ করেছিল উভয়েই, ভাগ্যের চরম বিকাশ হয়েছিল প্রভুর কৃপালাভ করে। শ্রীচৈতন্য ভক্তের আমন্ত্রণে এসেছিলেন, তাই আজও এই পুণ্যভূমিকে গুপ্ত বৃন্দাবন বলে থাকে ভক্তজনেরা।

কিছুটা এগিয়েই বড় সোনা মসজিদ। কেউ কেউ বলে বারদুয়ারী। অবশ্য দুয়ারের সংখ্যা বারো নয় এগারো। হয়ত কোন কালে বারদুয়ারী ছিল, আজ আর নেই। এগারো'টি গম্বুজ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বার-দুয়ারী। বোধ হয় বাংলার স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই মসজিদ। আলাউদ্দিন হোসেন শাহ আর নাশিরুদ্দিন নশরৎশাহ দুই পিতাপুত্রে তৈরী করিয়েছিলেন এই মসজিদ।

লতাসু অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে থাকতে বলল, আশ্চর্য। আজকের দিনে এটা সম্ভব হত না।

কি সম্ভব হত না।

পাশাপাশি মন্দির আর মসজিদের সহাবস্থান। মদনমোহন মন্দিরের দেবপূজার বাদ্য নিশ্চয়ই শোনা যেত এই মসজিদে। কিন্তু ইতিহাস বলে যায় নি এই বাদ্যধ্বনি শুনে আজকের মত মুসলমানরা ছুটে এসেছিল হিন্দুর মাথা কাটতে।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে লতাসুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, কি বলছেন।

বুঝতে পারলেন না?

পেরেছি। কিন্তু বক্তব্য এত গুরুত্বপূর্ণ যে সে বক্তব্য আপনার কাছ থেকে আশা করি নি।

লতাসু কোন উত্তর না দিয়ে হাসল।

পাথরের স্তূপে গিয়ে চুপ করে বসে রইল। আমাদের সাথে ঘুরে ঘুরে দেখতে গেল না। আমরা ফিরে আসতেই বলল, এত পাথর কোথায় পেল? আশে পাশে তো কোন পাহাড় নেই। আছে রাজমহলে। এত

পাথব আনতে হয়েছে নৌকা বোঝাই দিয়ে। সেগুলো খোদাই কবতে হয়েছে। তাবপব সেগুলো সাজিযে নিয়ে গডতে হযেছে এই সব অট্টালিকা। বাংলাব স্থপতিদের এই বিবাট গৌবব কেউ লিখে বেখে যায় নি। লিখে বেখে গেছে শুধু সুলতানদেব নাম। স্থপতি স্থান পায় নি, স্থাপক পেয়েছে স্থান।

বললাম, স্থপতি স্থান পায় নি, স্থান পেযেছে লুণ্ঠক। এগুলো হিন্দুব মন্দির ভেঙ্গে গডা হযেছে।

ভদ্রলোক প্রতিবাদ না করে শুধু বিস্মিত ভাবে আমাদেব মুখেব দিকে তাকিযে বইলেন। ভদ্রমহিলা আমাদেব কথায় বিব্রত বোধ করছিলেন।

উভয়ে লতামুকে কিছু বলবাব জন্য প্রস্তুত হতেই আমি বললাম, আমাদেব বক্তব্যগুলো ভাল লাগছে না বুঝি।

খুব ভাল লাগছে। আপনাদের দেখে যা মনে হযেছিল এখন দেখছি তা নয।

কি ভেবেছিলেন।

ভেবেছিলাম অতি সাধাবণ দর্শক। এখন মনে হচ্ছে দর্শকেব পশ্চাতে দর্শন কববাব আসল মন বযেছে আপনাদেব আব বযেছে দ্রষ্টব্য বস্তুকে বিশ্লেষণ কববাব অদ্ভুত আগ্রহ।

লতামু খিল খিল কবে হেসে উঠল।

এগিযে চললাম।

দাখিল-দবওযাজাব সামনে এসে বসলাম। গৌড দুর্গেব উত্তব প্রবেশ-দ্বাব এই দাখিল-দবওযাজা। সামনে ছিল গঙ্গা। সে গঙ্গা আজ অনেক দূব। বয়েছে শুধু শুষ্কপ্রায ক্ষীণতোয়া একটি নালা, লোকে বলে ভাগীবথী।

এই দাখিল-দবওয়াজায নজবানা দিযে তবেই আসতে হোত গৌডে। প্রবেশমূল্য কত ছিল জানা নেই, কিন্তু তাব গুরুত্ব ছিল। আজও দাখিল-দরওয়াজা দাঁড়িয়ে রযেছে, দাখিলকাবক কেউ নেই।

নির্মাণ পদ্ধতিব সাথে হিন্দুদেব খোদাই পাথবের পদ্মফুল দেখলে স্বভাবতই মনে হয় যে এটা হিন্দু বাজত্ব কালেই নির্মিত হযেছিল, অথবা হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে পাথব সংগ্রহ করে নির্মাণ কবা হয়েছিল।

দাখিল-দরওয়াজার কাছেই ভেঙ্গে পডে বযেছে সুলতানী আর হিন্দু

আমলের রাজগৃহ। এই স্তূপ থেকে পাথর আর ইঁট সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিলেন নবাব সিরাজদ্দৌলা। নির্মাণ করিয়েছিলেন তার সাধের ইমামবাড়া।

লতাহু গাড়িতে উঠেই বলল, গৌড় অন্ধকার, মুর্শিদাবাদে ক্ষীণ চেরাগ কিন্তু ফলাফল সমান। বাংলার দুইটি অশ্রুবিন্দু।

সবাই মন্তব্যটুকু শুনে হজম করল কেউ কোন জবাব দিল না। লতাহু গভীরভাবে কি যেন ভাবতে লাগল।

গাড়ি এসে দাঁড়াল ফিরোজ মিনারের সামনে। পাঁচতলা মিনারের তেয়াত্তরটি সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলাম।

ভদ্রমহিলা হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। উপরে উঠেই চুপ করে বসে রইলেন। দূরে রাজমহলের পাহাড়, গঙ্গার বালুচর। সামনে অশ্বত্থ গাছ, মিঠে বাতাস বইছে, সুন্দর পরিবেশ। কেন যে এই মিনার তৈরী হয়েছিল তা কেউ জানে না, কেউ বলে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করতে তৈরী করা হয়েছিল এই মিনার গঙ্গাতীরে। কেউ কেউ বলে ফিরোজের কীর্তি ঘোষণা করার জন্যই এই মিনার তৈরী করা হয়েছিল। গঙ্গা এখন বহুত দুর।

হাবসী রাজা সৈফুদ্দিন ফিরোজশাহের কীর্তি বলেই সবাই মেনে নিয়েছে এই মিনারকে। সেই ফিরোজের নাম থেকেই হয়েছে ফিরোজমিনার। গৌড় রক্ষার দুইটি দরওয়াজা, একটি গঙ্গার কুলে গৌড়ে, অপরটি মহানন্দার আর কালিন্দীর সঙ্গমস্থলে নিমাসরাইতে। আলোর নিশানা দিতে দুইটি মিনারের মাথায় রাতদিন পাহারা দিত তীরন্দাজের দল।

মিনার থেকে নেমে এসে ফুরফুরে বাতাসে অশ্বত্থগাছ তলায় সবুজ ঘাসের উপর বসলাম।

মাটির ইঁটের গায়ে এত কারুকার্য দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না এই শিল্প-সৃষ্টি সম্ভব কি না। বাংলার মানুষ তৈরী করেছিল ওই ইঁট! সেই শিল্পীরা ধ্বংস হয়ে গেছে, আজ তাদের একটি বংশধরও বেঁচে নেই। গৌরব করবার রয়েছে, গৌরব বহন করবার মানুষের কোন চিহ্ন নেই।

আবার যাত্রা হোল শুরু।

সামনেই চিকা মসজিদ। হোসেনশাহের সময় এটা ছিল কয়েদখানা, হিন্দুর

মন্দির ভেঙ্গে তৈরী হয়েছিল এই মসজিদ। এর বিরাট গম্বুজ যারা তৈরী করেছিল তাদের পরিচয় আজকের মানুষ ভুলে গেছে, তারা যে নমস্যজন একথা হলফ করে বলা যায়। পাঁচইঞ্চি মাপের ইঁট দিয়ে তৈরী এই বিরাট গম্বুজ অবলম্বনহীন অবস্থায় ধারণ করিয়ে রাখবার বিজ্ঞান যে আবিষ্কার করেছিল সে বিজ্ঞানের সূত্র তারা লিখে রেখে যায় নি। বাংলার অন্ধকারময় ইতিহাসের দাপশলাকা জ্বলছে এই বিজ্ঞানীদের অপূর্ব স্থপতি বিদ্যায়।

সামনেই সুজা-দরওয়াজা।

সবাই বসলাম দরওয়াজার সামনে। সহচর ভদ্রমহিলা খাবার বের করলেন। শিশুকে দুধ খাওয়ালেন, আমাদের হাতে তুলে দিলেন খাবার।

সামনে পানীয় জলের কূপ। জল তুলে আনলাম।

সুজা-দরওয়াজা।

বেগমদের সাথে লুকোচুরি খেলতেন সুবেদার শাহজাদা সুজা। লুকোচুরি নামটা আজও থেকে গেছে, লুকোচুরি খেলবার লোক নেই আজ।

হতভাগ্য সুজা লুকোচুরি খেলা অসমাপ্ত রেখে ছুটে গিয়েছিল ময়ূর সিংহাসন পাবার আশায়। নৈরাশ্য তাকে বিড়ম্বিত করেছে। প্রাণের দায়ে ছুটে পালিয়েছিল মগের দেশে, সেখানেও প্রাণরক্ষা করতে পারেনি শাহানশাহের দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ সুজা।

ওপাশে কদম রসুল। সঙ্গী মুসলমান পথ প্রদর্শক বলল, বাদশাহ নশরৎশাহ গিয়েছিলেন মক্কায় হজ করতে, যাবার সময় প্রজাদের বলেছিলেন, তোমাদের জন্য কি আনব।

প্রজারা বলেছিল, রসুলের পায়ের ছাপ।

নসরৎশাহ মক্কা থেকে আসবার সময় সেই পবিত্র পায়ের ছাপ এঁকে এনেছিলেন পাথরে। আজও সেই পবিত্র চিহ্ন রক্ষা করছে মহোদিপুরের খাদেমরা। রসুলের পায়ের ছাপ দেখে মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম সেই বিরাট অট্টালিকাকে যেখানে এই পদচিহ্ন রাখা হয়। এত বড়, এত সুন্দর গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ তৈরী মানুষের পক্ষে সম্ভব কিনা তাই ভাবছিলাম।

খাদেম প্রার্থনা জানালো নজরানার। মনে মনে হাসলাম। নবদ্বীপের ট্যাক্স গৌড়ের ট্যাক্সের চেয়েও কঠিন ও কঠোর হলেও, ধর্ম এবং ধর্মবিশ্বাস এদুটোই মানুষের জীবিকার্জ্জনের যে সহজ উপায়, একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি

করলাম। এ বিষয়ে নবদ্বীপ অথবা গৌড় সমপর্যায়ের, পার্থক্য অতি সামান্য, একটি স্থানে বাধ্যতামূলক ট্যাক্স দিতে হয়। আরেকটি স্থানে দানের মহিমায় ট্যাক্স দিতে হয়। পকেটের সবকটা ভাঙানি পয়সা দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

লতাহু হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল পাশের দোচালা বাংলো ধরণের অট্টালিকায়।

সুজাকে যারা সাহায্য করেছিল দিল্লির সিংহাসন পেতে, তাদের সায়েস্তা করতে এসেছিল দিলির খাঁর সুপুত্র ফতেখাঁ। আলমগীর বাদশাহের হুকুম তামিল করতে এসে ফতেখাঁ যেদিন গৌড়ের জমিতে পা দিয়েছিল সেইদিনই রক্তবমন করতে করতে এই কদম রসুলে দেহত্যাগ করে। সেই মৃতদেহ সমাহিত করা হয় এই বাংলোতে। বাংলো ঘরখানার গঠনরীতি দেখে মনে হল, এই ভাস্কর্য মুসলমান রাজাদের কীর্তি নয়, হিন্দুর মন্দিরকে কবরখানায় রূপান্তরিত করেছিল মুসলমান শাসকদল।

লতাহু বলল, সেদিনকার মানুষ আর আজকের মানুষের কত পার্থক্য। সেদিন ছিল ধ্বংস দিয়ে অপরকে বিব্রত রাখা আর আজ রয়েছে ধ্বংসের স্মৃতিকে বজায় রেখে অপরকে জানতে দেবার অদম্য স্পৃহা।

লতাহু কাঁঠাল গাছতলায় বসে রইল।

বললাম, চলো।

কোথায়? সুজা-দরওয়াজা?

ওসব দেখা তো শেষ হয়েছে।

কিন্তু দেখবার মতো স্মৃতিমন্দির হল গুমটি দরওয়াজা। মীনা করা ইঁটের তৈরী। এখানে গোপন পথ করে রেখেছিল কোন্ সুলতান তা জানি না, কিন্তু গৌড় যে একটি গোলকধাঁধা তা ঐ গুমটিদরজা দেখলে বেশ বোঝা যায়। সুজা-দরওয়াজায় আজ সুজা নেই, বেগমরা নেই, আছে শুধু বেগমদের লুকোচুরি খেলার ভগ্নকক্ষ। ওতে দেখবার কিছু নেই, বরং দুঃখ পাবার রয়েছে যথেষ্ট। ভালবাসার উন্মুক্ত অঙ্গনে গোপন কলাকুশলীরা যেন ফুঁপিয়ে কাঁদছে এই সুজা দরওয়াজার ভগ্ন কক্ষে।

তবুও ওগুলো ভাল করে দেখা উচিত।

জীবনে যারা লুকোচুরি খেলে জিততে চায় তাদের কথা ভেবে দেখ।

সহজ সরল যারা তারা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর রেখে গেল। সুজা পারেনি কেননা লুকোচুরি খেলা ছিল তার জীবনধর্ম। তাই সত্যকার পরাজয় ঘটেছিল তার।

গৌড় দুর্গের এ হল পূর্ব দরওয়াজা। দুধারে পাহারাদারদের গৃহ, মাঝ দিয়ে রাস্তা নেমে গেছে ঢালে। ইঁটের রাস্তা এসে মাটির রাস্তায় মিলেছে, সেই রাস্তা শেষ হয়েছে মহোদিপুরে যাবার রাস্তায়। গৌড় দুর্গের দ্বিতীয় প্রাচীরের গায়ে কোতোয়ালী দরওয়াজা। সেখানেই পশ্চিমের পথ শেষ, সুলতানী আমলের গৌড়ের চৌহদ্দিও শেষ।

কোতোয়ালী দরজা পৌঁছাবার আগেই বাঁদিকে লোটন মসজিদ। জিপ থেকে নেমে এসে উঠলাম মসজিদে।

সহচর ভদ্রলোক বললেন, মসজিদের প্যাটার্ণে তৈরী যদি না হত তা হলে এ হর্ম্যকে যে কোন বিলাস ভবনের চেয়েও বেশি বিলাসবহুল মনে করবার কারণ থাকত।

লতাহু স্মারক ফলক পড়ে বলল, সুলতান ইসুফ শাহের সময় এক বাঈজি তৈরী করেছিল এই মসজিদ। বাঈজির বৈভব ঢেলে তার বিলাসময় জীবনের পরিচয় রেখে গেছে এই মসজিদে। ভূমি থেকে শীর্ষ অবধি আগাগোড়া মীনা করা ইঁটের তৈরী এই মসজিদ বোধ হয় যে কোন মসজিদকে চ্যালেঞ্জ দিতে পারে। তাজমহলের গরিমা প্রকাশের মানুষের অভাব নেই, কিন্তু লোটন মসজিদের গরিমা বলবার লোক নেই বলেই অখ্যাত রয়েছে এর সৌন্দর্য্য।

ভদ্রমহিলা বললেন, রাতের বেলায় ছোট্ট প্রদীপ জ্বাললেও গোটা মসজিদের অভ্যন্তর আলোয় আলোময় হয়ে উঠবে। আমরা দিল্লির রঙ্-মহলে এই রকম দেখেছি। পাথরে তৈরী সে বাড়ির স্থায়িত্ব ইঁটের তৈরী এ বাড়ির স্থায়িত্বের চেয়ে অনেক বেশি! তবু সারা বাংলায় এমন সুন্দর হর্ম্য আর তো দেখেছি বলে মনে হয় না।

লতাহু বলল, এই মসজিদ তৈরীর প্রায় দুইশত বৎসর পর দিল্লির রঙ-মহল তৈরী হয়েছিল। রঙমহলের দুশোবছর আগে ইঁটের গায়ে মীনা করার যে অপূর্ব নিদর্শন রেখে গেছে লোটন বাঈজি তৎকালের দিল্লির অধীশ্বরদেরও তা ছিল অজানা। বিজ্ঞানের যে প্রভূত উন্নতি হয়েছিল সে কালে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হয়ত আজকের মতো তার ধারাবাহিকতা ছিল না।

হয়ত সে বিজ্ঞানসম্মত সূত্রকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা ছিল না, তবুও বলতে হবে, অপূর্ব, অশ্রুত এই কীর্তি। পৃথিবীর কোথাও যে এমন হালকা গাঁথুনির ইটের মসজিদ বা মন্দির বা গির্জ্জা আছে এমন কথা আজও কোন ঐতিহাসিক বলে যায় নি! তবুও বাঈজির মসজিদ বলেই বোধ হয় এটা উপেক্ষিত থেকে গেছে।

লোটন মসজিদ দেখতে অনেক সময় কেটে গেল। এগিয়ে চললাম কোতোয়ালী দরওয়াজার দিকে।

কোতোয়ালী দরওয়াজা পেরিয়ে কয়েক কদম এগোলেই লোহার সাঁকো, সাঁকোর অপর তীর থেকে চিৎকার শোনা গেল, হল্ট।

হক চকিয়ে গেলাম। ওদিকে কয়েকখানা টিনের ঘর। সেই টিনের ঘরের মাথায় পূবিয়া ঝাণ্ডা উড়ছে। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তোমাদের যাত্রাপথ বন্ধ।

এপারে খড়ের দোচালার সামনে ছোট্ট বাগান। নানারকম রঙ্গীন ফুল ফুটে রয়েছে, ফুলগাছের এক কোণায় দাঁড়িয়ে রয়েছে নিরস্ত্র পাহারাদার। শীর্ণকায় কতকগুলো লোকের ওপর সীমানা পাহারা দেবার দায়িত্ব যারা দিয়েছে তাদের বৈষয়িক বুদ্ধিকে প্রশংসা করতে পারিনি। ওরা মিট মিট করে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

ওদেশের মানুষ হাঁক দিয়ে সঙ্গীন উঁচিয়ে পথ বন্ধ করল।

বুঝলাম, ওদেশের আমরা কেউ নই।

কোতোয়ালী দরজার প্রাচীরে হেলান দিয়ে বসলাম। গাড়ি থেকে আহার্য পানীয় নামিয়ে আনলেন ভদ্রমহিলা। অতিথি সেবার কোথাও কোন ত্রুটি ছিল না ওঁর।

শিশুকে দুধ খাওয়ালেন। আবার সব কিছু তুলে দিলেন গাড়িতে।

আমি বসে বসে ভাবছিলাম।

কে যেন পাশার দান ফেলেছে। হেরে গেছে পাণ্ডব, শকুনি উল্লাসে ধেই-ধেই করে নাচছে। মুখ নীচু করে পরাজিত পাণ্ডব হস্তিনাপুর পরিত্যাগ করে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। কুরুকুল হেসেই বাঁচে না।

এপারের ছিন্নমূল আশ্রয়প্রার্থী মানুষদের দেখে ওপারের মানুষগুলো

যেন ব্যঙ্গ হাসি হাসছে। পাশার দানে ওদের জিত হয়েছে, দেয়নি কিছুই পেয়েছে অনেক। বুদ্ধির যুদ্ধে হার হয়েছে এপারের মানুষদের।

দুর্গ পরিখাকে বেষ্ঠন করে রয়েছে আমবাগান, সেই আমবাগানের দিকে হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ও বাগানের মালিকানা কাদের?

আমাদের, কিন্তু ফল ভোগ করবার অধিকার ওদের। ওখানে এপারের শান্ত শিষ্ট মানুষদের দল পা বাড়াতে ভয় পায়।

এই যে খাম্বা, এগুলো সীমানা মেপে দিয়ে রেখেছে। ওপারের মানুষ এপারে আসছে, এপারের মানুষ ওপারে যাচ্ছে, কত সন্ত্রস্থ ওরা, কত ভীতি ওদের চোখে।

ক বছর আগেও ওরা আসত যেত নিরাপদে। এই সাঁকোতে এসে থমকে দাঁড়াত না 'হল্ট' চিৎকার শুনে। রাতের বেলায় হয়ত থমকে দাঁড়াত বন্যজন্তুর ভয়ে। আজ মানুষ আর বন্যজন্তুর পার্থক্য হ্রাস পেয়েছে, আজ ভীতির ক্ষেত্রও কারণ হয়েছে মানুষ।

নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে অনেক কাল যেদিন বাংলার মানুষ পরস্পরকে ভালবাসতে ভুলে গিয়েছে।

ভদ্রলোক গম্ভীর ভাবে বললেন, হুঁ।

এসে উঠলাম জিপে। গাড়ি মোড় ফিরিয়ে এগিয়ে চলল চামকাটি মসজিদের দিকে।

চামকাটি মসজিদে পৌঁছাবার আগেই সূর্য ঢাকা পড়েছে উঁচু উঁচু আমগাছের পেছনে।

চর্মব্যবসায়ী বিদেশী মুসলমানরা এই মসজিদ তৈরী করেছিল স্বশ্রেণীয়দের উপাসনার জন্য।

এগিয়ে চললাম তাঁতিপাড়া মসজিদে। তাঁতিপাড়ায় আসতে না আসতেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। স্মৃতিফলকে উমর কাজির নাম পড়ে ফিরে এলাম। সেদিনের কোন এক সুখ্যাত উমর কাজি আজ অখ্যাত হয়ে ফলক চিহ্নের গৌরব বৃদ্ধি করছে, আর তার মসজিদ আস্তানা হয়েছে সরীসৃপের। যা ছিল নিরাপদ ধর্মস্থান তা হয়েছে পরিত্যক্ত ভীতিস্থান।

গাড়ি আবার ছুটল। ফিরে এসে বসলাম ডাক বাংলোর বারান্দায়। মালী লণ্ঠন জেলে খাবার নিয়ে এল।

কয়েকখানা চেয়ার পেতে টেবিল ঘিরে বসলাম।

লোটন মসজিদ ছেড়ে আসার পর লতাসু আর কোন কথা বলেনি, বাংলোর বারান্দায় চেয়ার টেনে বসে সে মুখর হয়ে উঠল।

বলল, গৌড় ছিল স্বপ্নের নগর। আজকের কথা নয়। এক সময় এই নগরের মানুষ ছিল লগুড় যুদ্ধে পারদর্শী, তাই নাম রাখা হয়েছিল গৌড়। লোক বলে লগুড় শব্দের অপভ্রংশই গৌড়।

অনেককাল আগে গৌড় ছিল ঈশান বর্মার রাজ্য। বৌদ্ধদের তখন ছিল প্রাধান্য। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড মগধ অধিকার করেও গৌড়ের দিকে এগিয়ে আসতে সাহস পায় নি। গৌড়েশ্বরের সাথে সন্ধি করে ফিরে গিয়েছিল। ইতিহাসের ঝাপসা পৃষ্ঠা থেকে এই টুকুই জানা গেছে।

ললিতাদিত্য উত্তরাধিকারী রেখে গেলেন বিনয়াদিত্য জয়াপীড়কে। বিনয়াদিত্য মাতুলের চক্রান্তে রাজ্যছাড়া হয়ে আশ্রয় নিল গৌড়ের সামন্ত রাজা জয়ন্তের গৃহে। জয়ন্তের কন্যা কল্যাণীকে বিয়ে করে জয়াপীড় সমগ্র গৌড়ভূমি জয় করে জয়ন্তকে করল একছত্রাধিপতি।

এই জয়ন্তই পরবর্তীকালে আদিশূর বলে পরিচিত হয়েছিলেন।

শূর বংশীয়দের বিতাড়িত করে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালবংশীয়রা দখল করল বাংলার সিংহাসন। দেশের জনসাধারণ পালবংশীয় গোপালকে বসালো সিংহাসনে। গণতন্ত্রের প্রথম বিকাশ ঘটল বাংলায়। এর পরও জনমতের প্রাধান্য দেখা গেছে আলাউদ্দিন হোসেনশাহের সময়। বাংলার হাবসী সুলতানদের উৎপীড়ন সহ্য করতে না পেরে দেশের লোক হোসেনশাহকে সিংহাসনে বসিয়েছিল। আরও একবার কৈবর্ত্তরাজ দিব্যককে জনসাধারণ বসিয়েছিল বাংলার সিংহাসনে, অরাজকতার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে।

পাল রাজাদের বিক্রম ছিল না, তাদের ছিল মানব হিতৈষণার প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা। অস্ত্রের চেয়ে হৃদয় ছিল তাদের মুখ্য পরিচয়।

বিগ্রহপাল তখন গৌড়পতি। চেদিরাজ কর্মদেব গৌড় আক্রমণ করল। অসমানের যুদ্ধে কর্মদেব পরাজিত ও বন্দী হল। সন্ধি স্বীকার করে কর্মদেব ফিরে গেল স্বদেশে। যাবার সময় কন্যা যৌবনশ্রীকে সম্প্রদান করে গেল বিগ্রহপালকে।

দ্বিতীয় মহীপাল বসল সিংহাসনে। পূর্বপুরুষদের মহান ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে মহীপাল বিলাসে নিজেকে ভাসিয়ে দিল। রাজার অত্যাচারে উৎপীড়িত জনসমাজ দিব্যকের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করল। দ্বিতীয় মহীপাল পরাজিত হয়ে রাজ্য ছেড়ে পালাল। দিব্যক বসল গৌড়-বরেন্দ্রের সিংহাসনে।

বাংলার ইতিহাস নতুন করে লেখা হল বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেনের রাজত্ব কালে। বাংলার গৌরব যুগ হল লক্ষণ সেনের রাজত্ব কালে। জ্ঞান-অনুশীলনে, জ্যোতিষে, শিল্পে বাংলা তখন গৌরবের উচ্চ শিখরে। লক্ষণ সেনের বাংলাকেই আজও আমরা সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করি।

রাজা তখন বৃদ্ধ। পুত্ররা বঙ্গশাসনে ব্যস্ত। মগধের পথে প্রবেশ করল অগণ্য মুসলমান। গোপন পথে বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায় মুসলমান দখল করল গৌড়। হিন্দু বাংলার ইতিহাসে যবনিকা পাত হল।

লতাম্বু একটানা এই কাহিনী বলা শেষ করল।

ভদ্রলোক বিস্মিত ভাবে বললেন, এত সংবাদ কোথায় পেলেন?

ইতিহাসে। ধারাবাহিক ইতিহাস তো বাংলায় লেখা হয় নি, বাংলায় কেন, সমগ্র ভারতেও লেখা হয়নি। যদি সত্যকার ইতিহাস লেখবার কোন চেষ্টা থাকতো তা হলে আরও কতো তথ্য আমরা জানতে পারতাম। আষাঢ়ে গল্পের উপখ্যানকে স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিরা ইতিহাস বলে চালিয়ে দিল, মিনহাজের মিথ্যা ইতিহাস পাঠ করে আমরা শিখলাম আঠার জন মুসলমান অশ্বারোহী দখল করেছিল বাংলা দেশ। এত বড় ব্যঙ্গপূর্ণ মিথ্যাকে ইতিহাসের সারবস্তু মনে করে যে দেশের লোক, সে দেশের কপালে বহু দুর্ভাগ্যের পঙ্কতিলক আঁকা থাকবে এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে!

ভদ্রমহিলা বোধহয় লতাম্বুর কথা শুনে খুশী হতে পারেন নি। অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস করছিলেন উঠবার জন্য। ছেলেকে শুইয়ে দেবার ওজুহাতে উঠে গেলেন।

লতাম্বু সে দিকে লক্ষ্য না করে বলল, মুসলমান শাসন কাল থেকে বাংলার কিছু কিছু ইতিহাস তৈরী হয়েছে; অবশ্য রাজপরিচয় ভিন্ন অন্য পরিচয় তাতে লেখা হয় নি। এ পরিচয় ইতিহাস পরিচয় নয়, তবুও এ থেকে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করতে পারা যায়।

বললাম, সেকালের ইতিহাস রচনা হয়েছিল রাজারাজরার কীর্তি কলাপ বিবৃত করতে, রাজ কবিরা রাজারই স্তুতিগান করেছে। আসলে যে মানুষ নিয়ে রাজ্য গড়ে উঠেছে, সে মানুষের কথা কেউ বলেনি।

লতাহু বাধা দিয়ে বলল, সেদিনকার রাজারা সাধারণ মানুষের সাথে মোটেই পরিচিত ছিল না। গৌড়ের সিংহাসনে কে বসল আর কে না বসল তা নিয়ে কারুরই শিরপীড়া ঘটত না। রাজার প্রাপ্য মিটিয়ে নিশ্চিন্তে বাস করা ছিল তাদের কাজ। রাজারা তাদের প্রাপ্য পেলে সাধারণ মানুষকেও সহজে বিব্রত করত না। মানুষ যদি শান্তিতে থাকতে পায় তা হলে কে গেল আর রইল তা নিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় না। প্রাত্যহিক দুঃখ দুর্দ্দশা যা ছিল তা ভাগ্য বলে মেনে নিয়ে নির্বিবাদে দিন কাটাতো। সেদিন যার যোগ্যতা ছিল রাজাকে হত্যা করবার সেই পরিবর্তী রাজা বলে পরিচিত হত। বাংলার ইলিয়াশাহী বংশের পতন ঘটল হাবসীদের হাতে। ইলিযাসশাহী জালালুদ্দিনকে হত্যা করে রাজা হল হাবসী বরবাকশাহ। বরবাককে হত্যা করে ওমরাহ আদিল সিংহাসনে বসালো জালালুদ্দিনের শিশুপুত্রকে। রাজমাতার চেযে রাজার প্রণযিনী হওয়া অনেক শ্রেযঃ। জালালুদ্দিনের বেগম স্বীয পুত্রকে হত্যা করিয়ে প্রণয়ী মালিক আদিলকে বসালো সিংহাসনে। নিজে হল খাস সুলতানা। মালিক আদিল পরিচিত হল ফিরোজশাহ নামে, যার মিনার আজ আমরা দেখে এলাম। ফিরোজের মৃত্যুর পর আরম্ভ হল মৎস্যন্যায়। রাজার ছেলে রাজা হয় না, রাজা হয় রাজঘাতক ক্রীতদাসের দল। এই মৎস্যন্যায়ে অতিষ্ঠ হয়ে আমীর ওমরাহের দল হোসেনশাহকে ডেকে এনে সিংহাসনে বসালো। যে যুগে নরহত্যা ছিল রাজসিংহাসন নিয়ে নিত্যকার কার্যক্রম সে যুগে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কত দুঃখজনক ছিল তা সহজেই অনুমেয়। এই দুরবস্থার সাময়িক বিরতি ঘটল শেরশাহের আগমনে। মধ্যবর্তীকালে বাংলার গৌরব করবার মতো আর কিছু ছিল না। হিন্দু রাজত্বকালে যেমন লক্ষ্মণ সেন বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করেছিল, মুসলমান রাজত্বকালে তেমনি গৌরব বৃদ্ধি করেছিল হোসেন-শাহ আর তার পুত্র নসরৎশাহ। তারপর সব অন্ধকার।

মালী এসে তাগাদা না দিলে কাহিনীর আরও হয়ত ডালপালা গজাতো। খাবার প্রস্তুত করে মালী জানিয়ে গেল, তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া

শেষ করে ঘরে যাওয়া উচিত, কেন না গত রাতে বাঘে এক জোড়া বাছুর মেরেছে দিঘীর অপর কিনারায়। রাতের বেলায় বাঘ জল খেতে আসে দিঘীতে, তাই দরজা জানালা ভালকরে বন্ধ করে যেন আমরা শুই, সেকথাও স্মরণ করিয়ে দিল।

নবাগত ভদ্রলোক বাঘের কথা শুনে উঠবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে ভদ্রলোক শুভরাত্রি জানিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। লতাহ্ন বাইরের বারান্দায় বসে রইল।

আমি খাটে এসে শুয়েছিলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাঝ রাতে ঘুম ভাঙ্গলেই দেখি বারান্দায় লণ্ঠন জ্বলছে, লতাহ্নর বিছানা খালি। ঘুমের আবেশেই ডাকলাম, লতাহ্ন।

উত্তর এল বারান্দা থেকে, কেন ?

তুমি শোওনি।

না। ঘুম আসছে না।

অনেক রাত হয়েছে, বারান্দায় কেন বসে রয়েছ। আর কিছু না হোক বাঘের ভয়ও তো রয়েছে।

লতাহ্ন খিল খিল করে হেসে উঠল। বলল, আমার নাম তুমিই দিয়েছ। লতিকার লতা আর হাসনুর অহ্ন। সংমিশ্রণে লতাহ্নর জন্ম, সে লতাহ্ন ভয় পাবার মেয়ে নয়, বুঝলে ? তুমি ঘুমোও।

পাশের ঘরে শিশু কেঁদে উঠল।

আমিও চুপ করে শুয়ে রইলাম। ঘুমে চোখ ধরে আসছে। লতাহ্ন লণ্ঠন হাতে করে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। চুপি চুপি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, ঘুমিয়েছো ?

না।

অতো ভয় কেন ? লতাহ্ন বিশ্বের, লতাহ্ন তোমারও নয়, তার নিজেরও নয়। ভয় পাবার কিছু নেই। লতাহ্ন পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে একটিও লোক নেই যে 'আহা' বলবে।

বললাম, এবার ঘুমোও। অনর্থক কেন অপরকে আঘাত করতে চাও।

আমার বক্তব্যের গভীরতা বোধহয় লতাহ্নর হৃদয়ের কোন সূক্ষ্ম বস্তুতে কঠিন আঘাত করল। মুহূর্তে কলকাকলি থেমে গেল। লণ্ঠনের ক্ষীণ

আলোতে তার গম্ভীর মুখখানা চোখে পড়তেই বুঝলাম, কথাটা বলে ভাল করিনি। নিঃশব্দে লতাম্নু নিজের বিছানায় উঠে বসল। রাতের নিস্তব্ধতার চেয়েও ভয়ঙ্কর তার মুখের চেহারা।

ডাকলাম, লতাম্নু।

বলুন।

চমকে উঠলাম। তবুও বললাম, রাগ করেছ?

মানুষ রাগ করতে পারে না, এমন বিধানতো কোন শাস্ত্রকার দিয়ে যাযনি। অপ্রীতিকর কিছু ঘটলে মস্তিষ্কের অংশ বিশেষে আলোড়ন ঘটবেই।

এটাতো সবার পক্ষেই সম্ভব।

সম্ভব বলেই যাতে অপ্রীতি না ঘটে তাই করা উচিত।

উচিত, কিন্তু একসাথে বসবাস করতে হলে কথান্তর ঘটে, হযত অপ্রীতিকর মন্তব্যও কেউ কেউ করে।

বসবাস করলে অধিকার সাব্যস্ত হয কি? আর যদি হয়ও তাহলে সে অধিকার নিশ্চযই একপক্ষীয় হয় না।

বুঝলাম, অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছি।

লতাম্নু আত্মপক্ষ সমর্থন করে অনেক কিছু বলে চলল, তার কোন কথাই আমার কানে প্রবেশ করল না। আমি তন্ময় হযে অধিকারের প্রশ্ন ব্যাখ্যা করতে করতে ঘুমিয়ে পডলাম। যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন অনেক বেলা। উঠেই দেখি লতাম্নুর বিছানা খালি। সে সন্তর্পনে উঠে গেছে।

বাহিরে তখন মজলিস বসেছে।

নবাগত ভদ্রলোক আর স্ত্রীর সাথে বসে আসর জমিয়ে নিয়েছে লতাম্নু। দু একটা কথা কানে আসতে লাগল।

লতাম্নু বলল, বেশতো চলুন না সবাই মিলে আদিনা দেখে আসি। আপনার যখন ছুটি আছে আর আমাদের রয়েছে সীমাহীন অবসর তখন বাধা কোথায়। গাড়িটাও আপনার নিজস্ব, অন্যের ভরসা করে চলতেও হবে না।

ভদ্রমহিলা সানন্দে লতাম্নুর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। বললেন, আপনার কর্তার অভিমতটা শুনে নিন।

লতাসু আবেগের সাথে বলল, উনি প্রতিবন্ধক নন। উনি যদি না যান থাকুন এখানে, আমরাই যাব।

সহজ সরল বক্তব্যে কোন সঙ্কোচ নেই।

আমার পক্ষে এর বেশি শোনা উচিত নয় মনে করে পেছনের দরজা দিয়ে ধীরে এসে দাঁড়ালাম দিঘীর পারে।

দাঁতন ভেঙ্গে নিয়ে চুপ করে বসে ছিলাম।

লতাসু নিঃশব্দে পেছনে এসে বলল, আদিনা যাবার প্রোগ্রাম করলাম।

বললাম, হুঁ।

যাবে তো।

হুঁ।

এবার বুঝি তোমার পালা।

ওটা তো কারও কায়েমী সম্পদ নয়।

তাহলে তুমিও রাগ করতে জানো। তাকাও, তাকাও এদিকে। আমার মুখের ওপর চোখ দুটো রেখে দেখোতো, মায়া হয় কিনা। রাগ করবার পথ আছে কিনা?

লতাসুর বলবার ভঙ্গীতে হেসে ফেললাম। বললাম, মুখ না দেখেই রাগ করব।

লতাসু হাসতে হাসতে ফিরে গেল।

লতাসুর অব্যক্ত মনোভাবের একটি সুতো বোধহয় খুঁজে পেলাম।

সকালের চা-খাবার খেয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম।

গাড়ি ছাড়বার আগে বললাম, একসাথে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটালাম কিন্তু আপনার পরিচয় জানতে পারিনি।

গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়ে ভদ্রলোক হেসে বললেন, আপনারাও। বর্তমান সভ্য ব্যবস্থায় পরিচয় জিজ্ঞাসা অভদ্রতা। কথার ফাঁকে পরিচয় জানতে হয় অথবা পরিচয় খুঁজে নিতে হয়।

সভ্যতাই বোধহয় অপরিচয়ের অভদ্রতা সৃষ্টি করেছে। অবশ্য নিজের কথা বলতে পারি, তাতে মনে হয় পরিচয় দেবার আগ্রহ আমাদের কারও আছে বলে মনে হচ্ছে না।

আমারও তাই। পরিচয় দেবার মতো কোন কৃতিত্ব আমাদের নেই।

নহাত মামুলি মানুষ, মামুলি চিন্তার পোষাক। তাই আমাদের দিক .থকেও পরিচয় দেবার আগ্রহ দেখা যায় নি।

কথাগুলো লতানুর কানে পৌঁছেছিল। সে যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল। ইসারায় আমাকে থামতে বলেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু ডাক্‌ট্যেলজির জ্ঞান কম থাকলে যা হয় আমারও হয়েছিল তাই। লতানুর সাবধানী ইঙ্গিত লক্ষ্য না করে কথার পিঠে কথা বলে চলছিলাম, লতানু আর সহ্য করতে পারল না। বোধহয় আমার বিদ্যাবুদ্ধির ওপর তার কোন আস্থা ছিল না তাই প্রত্যক্ষভাবে রণাঙ্গনে নামল, বলল, পরিচয় সর্বক্ষেত্রে কি প্রয়োজন হয়। রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, গাড়িতে বসেই হৃদ্যতা জন্মায়। প্লাট-ফরমে পা দিলে সবাই ভুলে যায় পথের সাথীকে। তাই পরিচয়পত্র নিয়ে নিরর্থক কাড়াকাড়ি করে কোন বাস্তব লাভ হয় না।

লতানুর কথা বুঝলাম। থেমে গেলাম।

ভদ্রলোক নিজেকে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর মর্যাদা দিতে বোধহয় রাজি নন। বললেন, সামান্য পরিচয় অনেক সময় মনের কোনে এমন স্থায়ী দাগ কেটে বসে তখন মনে হয় না পথের পরিচয় পথেই শেষ।

লতানু প্রতিবাদ করল না, বলল, পরিচয় মানুষের, তার আসনের নয়। অর্থের নয়। সেই পরিচয়টুকু অক্ষয় হলেই যথেষ্ট।

গাড়ি এল ইংরেজবাজারে।

ইংরেজবাজার নাম মিলিয়ে গেছে, মালদহ হল আসল পরিচয়।

ভদ্রলোক গাড়িতে তেল নিলেন। আহার্য সংগ্রহ করলেন, আমরাও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নিলাম।

বিশ্রাম ও আহার পর্ব শেষ করে আবার উঠলাম চক্রযানে।

নদী পেরিয়ে নতুন সড়ক ধরে গাড়ি এগোতে লাগল। সন্ধ্যার আগেই এলাম আদিনা ডাকবাংলোতে।

বাংলোর সামনেই আদিনা মসজিদ। ঘুরে দেখে এলাম।

রাতের বেলায় আদিনার ডাকবাংলোতে চেয়ার পেতে মুখোমুখি বসলাম। মালী এসে লণ্ঠন জ্বেলে দিয়ে গেল। চায়ের বন্দোবস্তও সে করল।

চা খাবার পর লতানু হঠাৎ বলে উঠল, আমি যেন স্বপ্ন দেখছি!

সবাই জিজ্ঞাসা করল, স্বপ্ন ? মানে ?

মানে ? তবে শুনুন সবাই।

লতানু স্বপ্নের কাহিনী শোনালো।

আদিনা নামটাই অদ্ভুদ্। মহেশ্বর আদিনাথের শিবলিঙ্গ ছিল যে মন্দিরে তারই সুলতানী সংস্করণ এই আদিনা মসজিদ। যে বেদিটা দেখে এলাম, ওটাই হয়ত ছিল বিগ্রহের আসন। বিগ্রহকে ভেঙ্গে সিঁড়ির তলায় হযত গেঁথে রেখেছিল মসজিদ নির্মাতারা।

বাদশাহী তখত্ রয়েছে আজও। বেগমরা আসত, নমাজ পড়ত। তাই দ্বিতলের সাথে সামনের সিঁড়িকে গেঁথে তোলা হযেছে। মসজিদের গঠন, ভাস্কর্য যেদিকেই দেখুন না কেন তাতেই মনে হবে এটা ছিল হিন্দুর মন্দির। মন্দির ভেঙ্গে তৈরী করা হযেছিল মসজিদ।

গিযাসুদ্দিন আজম শাহ বাংলার সুলতান। সুলতানের অত্যাচারে হিন্দুদের জীবন সম্ভ্রম সম্পদ বিপন্ন। এমন সময় দেখা দিল উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত রাজা গণেশ ভাদুড়ি, ভাতুরিয়ার সামান্য জমিদার। বাংলার অন্ত্যজজাতি নিযে গড়ে তুলল বিরাট ফৌজ।

এই ফৌজ নিয়ে গণেশ আক্রমণ করল পাণ্ডুয়া। প্রচণ্ড সংগ্রামের পর গিয়াসুদ্দিন নিহত হল, তার পুত্র-পৌত্রাদি নিহত হল। বেঁচে রইল তার কন্যা আসমানতারা। গণেশ গৌড়পতি হল। বিপন্ন বিব্রত অত্যাচারিত হিন্দুরা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

প্রতিশোধ কামী মুসলমানরা হিন্দুরাজত্বের অবসান ঘটাতে চাইলো। ষড়যন্ত্রের জাল ছড়িয়ে দেওয়া হল। পরধর্ম অসহিষ্ণু পাণ্ডুয়ার পীর ডেকে আনল জৌনপুরের সুলতানকে। বাংলার বুকে নেমে এল অশান্তির ঢেউ, যারা নিশ্চিন্ত মনে সুখের স্বপ্ন দেখছিল তাদের সামনে নেমে এল রক্তের বিভীষিকা।

গণেশ বাধা দিল প্রচণ্ড বিক্রমে। কিন্তু সবই বৃথা। দুর্গের মুসলমান অধিবাসীরা গোপন পথে জোনপুরী ফৌজকে দুর্গে প্রবেশ করবার গোপন পথ দেখিয়ে দিল। গণেশ বাধ্য হয়ে সন্ধিভিক্ষা করল।

সন্ধির সর্ত ?

গণেশের পুত্র যদুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হতে হবে।

নিরুপায় গণেশ মেনে নিল সেই সর্ত।

যদু মুসলমান হয়ে নাম গ্রহণ করল জালালুদ্দিন।

জৌনপুরের সুলতান ফিরে গেল।

গণেশ সহস্র সুবর্ণ ব্রত করে জালালুদ্দিনকে আবার যদুত্ব দান করল।

এই উদ্ভট ইতিহাস কিন্তু জৌনপুরের ইতিকাররা লিখে যায় নি। জৌনপুরের সাথে রাজা গণেশের যে কোন যুদ্ধ হয়েছিল একথাও সে ইতিহাসে নেই। যারা এই ইতিহাস রচনা করেছে তারা পরধর্মের শাসককে সহ্য করতে না পেরেই বিকৃত ইতিহাস রচনা করে গেছে। ঘটনাটা ঘটেছিল অন্যরূপ।

গণেশের মৃত্যুর পর যদু বসল গৌড়ের সিংহাসনে।

প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে ছিল নতুন রাজা। সামনে যাচ্ছিলো তাঞ্জাম। যদুর আদেশে থামানো হল তাঞ্জাম। প্রাসাদে এনে তাঞ্জামের ঢাকনা খোলা হল। বেরিয়ে এল এক অপরূপা নারী।

কে তুমি?

আমি ফিরোজা।

কার মেয়ে?

সুলতান গিয়াসুদ্দিনের।

তুমি ফিরোজা নও। আমার হৃদয় আসমানের তুমি তারা। আমার মহলে তোমার স্থান। তাঞ্জাম ফিরিয়ে দাও।

তুমি বিধর্মী।

সধর্মী হতে বিলম্ব নেই।

সুলতান কন্যাকে বিবাহ করে যদু স্থাপন করল প্রেমের অম্লান ইতিহাস। যদু আবার জালালুদ্দিন হল। গণেশের প্রতিষ্ঠিত একলক্ষী মন্দিরকে রূপান্তরিত করা হল মসজিদে। সেই মসজিদে জালালুদ্দিন বিয়ে করল আসমানতারাকে। বাংলার ইতিহাসের ধারা বদলে গেল। বছরের পর বছর পেরিয়ে যায়, অস্তিমদশা নেমে এল আসমানতারার জীবনে, জালালুদ্দিনও বিদায় নিল ধরাধাম থেকে।

মসজিদের পুণ্যক্ষেত্রে মৃত্যুর পর আশ্রয় নিল জালালুদ্দিন। পাশেই স্থান

কবে নিল আসমানতারা, প্রাণের দুলাল শামশুদ্দিনও পিতামাতার পদমূলে শেষ শয্যা বিছিয়ে নিল।

শাহজাহানের প্রেম অবিনশ্বর। জালালুদ্দিনের প্রেম অমর অক্ষয়। বাংলার মানুষ প্রেমের দ্যুতি দেখতে যায় আগ্রায়। বাংলার আগ্রায় একলাখী মসজিদে কেউ একবার ভ্রমেও পদক্ষেপ করে না।

মানুষের বিশ্বাস আর বাস্তব অবস্থার কত পার্থক্য। আজ স্বপ্নের মতো মনে হয় সেই গিয়াসুদ্দিনকে যিনি ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন বাংলায়।

ঘটনাটি অদ্ভুদ।

সুলতান তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। তাঁর লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর একটি বালকের বক্ষে বিদ্ধ হয়। বালক প্রাণত্যাগ করে।

বালকের মাতা এল কাজির কাছে বিচারপ্রার্থী হয়ে।

কাজি পরোযানা পাঠাল সুলতানের কাছে।

হরকরা সুলতানের কাছে যাবার সাহস পেল না। পরোযানা জারীর পথ না পেয়ে হরকরা অসময়ে মসজিদে গিয়ে আজান দিল। অসময়ে আজান দেবার কারণ জানতে এল সুলতান স্বয়ং।

আভূমি সেলাম করে হরকরা নিবেদন করল কাজির আদেশ।

সুলতান মনোযোগ সহকারে কাজির আদেশ শুনল। কোন প্রতিবাদ না জানিয়ে সুলতান বস্ত্র মধ্যে তরবারি লুকিয়ে কাজির দরবারে হাজির হল।

কাজি সিরাজুদ্দিনও কম নয়। বস্ত্র মধ্যে একখণ্ড বেত লুকিয়ে রেখে বসল বিচারকের আসনে।

যথারীতি বিচার হল। সুলতানকে ক্ষতিপূরণ করবার আদেশ দিল কাজি।

সুলতান ক্ষতিপূরণ দিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় বলল, সিরাজুদ্দিন, তুমি যদি সুলতানকে ন্যায়বিচার থেকে রেহাই দিতে তা হলে এই তরবারি দিয়ে তোমার মাথা কেটে ফেলতাম।

কাজি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আর আপনি যদি কাজির বিচার না মানতেন তা হলে আমার এই চাবুক আপনার পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত করত।

এই হল ন্যায় বিচার।

সেদিনকার বাস্তব আজ স্বপ্ন মনে হয়।

লতাহু মোহাবিষ্টের মতো বসে রইল।

রাতের বেলায় লতাহু কখন যে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে তা টের পাইনি। পাশের ঘর থেকে এসে দেখি লতাহু নিদ্রিত। আমিও নিজের বিছানা পেতে নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

আমের মুকুলের গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। প্রথম রাতের জ্যোৎস্না ম্লান হয়ে এসেছে। আকাশ পরিষ্কার। খোলা জানালা দিয়ে বাহিরের পৃথিবী দেখা যাচ্ছে।

জন কোলাহল মুখরিত একটি ঐতিহ্যময় নগরের কঙ্কাল সামনে শুয়ে আছে। কোথাও কোন প্রাণের স্পন্দন নেই। এত ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা সহ্য করতে পারছিলাম না।

পরের দিন সকালে পাণ্ডুয়া বেরিয়ে এসে পরবর্তী প্রোগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম।

মালী বারান্দায় টেবিল চেয়ার পেতে খাবার দিয়ে গেল। আজ কেন বা লতাহুকে গম্ভীর মনে হল। সাহস করে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না, লতাহু নিজের চিন্তায় বিভোর।

গাড়িতে ওঠা পর্য্যন্ত হাঁ-হুঁ ভিন্ন আর কিছুই লতাহু বলে নি। গাড়িতে উঠেই বলল, পাণ্ডুয়া বাংলার রাজধানী ছিল। যতদিন পাণ্ডুয়া রাজধানী ছিল। ততদিন দিল্লীর অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি। গৌড়ে রাজধানী উঠিয়ে আনবার পর আরম্ভ হল দিল্লির হামলা। এল পাঠান, এল মুঘল, বাংলার স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হল চিরকালের জন্য। আজও স্বাতন্ত্র্যহীন বাংলা দিল্লির খেয়াল-খেয়ালে উঠছে আর বসছে। প্রায় পাঁচশ বছর ধরে বাংলা হয়ে রয়েছে দিল্লীর হুকুমবরদার। উত্তর ভারত পূর্ব ভারতকে শাসন করবে এই বোধ হয় ছিল বিধিলিপি তার ব্যতিক্রম আজও হয়নি।

শেষ চেষ্টা করেছেন দাউদ। দাউদ হয়ত সাফল্যলাভ করত, পারল না শুধু তার জনবলের অভাবে। উত্তর ভারতীয় ফৌজদের মত কষ্ট সহিষ্ণু বোধহয় ছিল না বাংলার ফৌজ। দাউদ মুঘলকে বাধা দিয়েছিল রাজমহলে। রাজমহলের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র পেরিয়ে আসবার ক্ষমতা ছিল না মানসিংহের কিন্তু তাও সম্ভব হয়েছিল, দাযুদের জনবল ছিল সামান্য। বিপুল মোগল-

বাহিনীর সামনে দাউদ দাঁড়াতে পারল না। দাউদের মৃত্যুর পর গৌড় ধ্বংস হয়েছে। পাণ্ডুয়ার নাম ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেছে।

সুলতানী আমল শেষ হয়েছে, সুলতানরা ছায়াছবির মতো এসেছে গেছে। কিন্তু যাবার সময় ধ্বংস করে গেছে পূর্ববর্তীদের কীর্তিস্তম্ভ। আছে কতকগুলি মসজিদ আর সমাধি। রাজচিহ্নও কোথাও রেখে যায় নি। মসজিদ আর সমাধি রেখে জানিয়ে গেছে তাদের পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা আর সধর্মের প্রতি বিচারহীন আকর্ষণ। যে আকর্ষণে মানুষের কোন স্থান নেই, নেই কোন ব্যক্তিত্বের ছাপ।

এবিষয়ে কৃতিত্ব দাবী করতে পারে হোসেনশাহ আর তার পুত্র নসরৎখান। বাংলার গৌরব বৃদ্ধির জন্য তারা যা করে গেছে তা কোন মুসলমান সুলতান করেনি। তাই কাব্যের ছন্দেও তারা বেঁচে রয়েছে :

শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরৎখান।
রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান ॥

এ পাঁচালি হল মহাভারত। কাশীরাম দাসেরও আগে কবীন্দ্র পরমেশ্বর এই মহাভারত রচনা করেছিলেন বাংলা ভাষায়, আর তা সম্ভব হয়েছিল নসরৎখানের উদার সহায়তায়।

শ্রীকর নন্দীও মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন হোসেনশাহের আনুকূল্যে। কবি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রচনা করেছিলেন :

শ্রীযুত হোসেন জগৎভূষণ, সেহ এ রস জানে।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগপুরন্দর ভনে যশোরাজখানে ॥

বাংলার মানুষ তাই আজও হোসেনশাহ আর নশরৎখানকে ভুলতে পারেনি। মানুষের হৃদয়ে তারা অমর প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বলল, বাংলার কীর্তি বাংলা ছেড়েও অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

হয়েছিল কিন্তু আজ তার স্বীকৃতি নেই।

বোধহয় তাই। এবার কোনদিকে যাবেন?

বললাম, পথতো নির্দ্দিষ্ট নেই।

তাহলে উত্তরেই চলুন।

কোথায়?

শিলিগুড়ি অবধি আমরা যাব। আপনারাও যেতে পারবেন, অবশ্য যদি অতদূর যেতে আপনাদের আপত্তি না থাকে।

লতানু বলল, মন্দ কি।

বললাম, এত দ্রুত চললে পথ যে ফুরিয়ে যাবে। দেখার ও দেখাবার কিছুই থাকবে না।

লতানু কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল, পথের যে শেষ নেই গো। দ্রুত যেতে পারলে অনেক দেখার সামান্য কিছুও দেখা হবে।

বুনিয়াদপুর এসে গাড়ি দাঁড়াল।

ভদ্রলোক গেলেন পেট্রল আনতে।

নিরিবিলি লতানুকে বললাম, লতানু, তুমি আমার কে?

লতানু খিল খিল করে হেসে উঠল, বলল, ভ্রমরের ভাষায় বলব, যতদিন পায়ে রাখো ততদিন দাসী, নহিলে কেহ নই।

হেসে বললাম, উল্টো বললেই বোধহয় ভালো হত।

কিযে বল, পুরুষ চিরকাল স্বামী, স্বামী মানে সার্বভৌম অধিকারের একচেটিয়া দাবীদার, আর নারী হল ভার্যা। ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর স্কন্ধে চাপিয়ে নারী নিশ্চিন্ত।

বললাম, এ চলার শেষ কবে হবে?

কোনদিন নয়!

ঘড়ার জল ফুরোবে, তখন কি হবে?

তার রিহার্সেল দিয়ে নিয়েছি। আর ভয় ভাবনা নেই। নতুন করে গুপীযন্ত্র আর খঞ্জনী কিনতে হবে, এই টুকুর অপেক্ষা।

তার প্রয়োজন হবে কি? তুমিও স্কুল কলেজ ঘুরে এসেছ, আমিও। দুজনে দুটো কাজ খুঁজে নিতে পারলে এই চলার শেষ হতেও তো পারে।

তুমি সহ্য করতে পারছ না। স্বাভাবিক হত, যদি আমি একথা বলতাম।

চলাব শেষ হতে পাবে যেদিন চলতে চলতে ক্লান্তিতে চোখেব পাতা জডিয়ে আসবে, পদ যুগল বিদ্রোহ কববে।

আমাদেব কথাব মাঝে ভদ্রমহিলা এসে বাধা দিয়ে বুলল, আপনাবা প্রস্তুত হয়ে নিন।

আমবা বেজিমেণ্টেব ফিল্ড সার্ভিসে বযেছি। অলওযেজ বেডি। ষ্ট্রাইক দি টেণ্ট আদেশ হবাব অপেক্ষায বযেছি।

গাডিতে উঠতেই ভদ্রলোকেব বাঁযে মোড নিল।

বললাম, এদিকে তো বালুবঘাট।

বালুবঘাট যাব না। সামনেই টাঙ্গন নদী। নদীব কিনাবায গাডি বেখে স্নান কবে নেব। জাযগা দেখে বান্না খাওযা শেষ কবে আবাব বওনা হব।

টাঙ্গন নদীব সাঁকোটা সবে তৈবী শেষ হযেছে। সাঁকোব পাশ কাটিযে বাঁদিকে নদীব কিনাবায গাডি থামল।

লতাহু আব ভদ্রমহিলাকে দেখবাব অবসব পেলাম। ধুলি ধুসবিত দুইটি মহিলাকে চিনতে পাবছিলাম না।

তাবাও নিজেদেব চেহাবাব কথা মনে কবে সঙ্কুচিত ভাবে আচল দিযে মুখ মুছে নিচ্ছিলো।

শিশু সন্তানটিকে নিযেই ভদ্রমহিলা বেশি ব্যস্ত। লতাহু সাহায্য কবতে এগিয়ে এল।

স্নানে নামল মেয়েবা।

তাবা ফিবে আসতেই আমবাও নেমে পডলাম নদীতে।

লতাহু স্টোভ জেলে ততক্ষণ ভাত চডিয়ে দিযেছে। ভদ্রমহিলা শিশুকে দুধ খাওয়াতে বসেছে।

আমবা ফিবে এসে সতবঞ্চি পেতে বিশ্রাম কববাব জায়গা করে নিলাম।

৫

কালিযাগঞ্জ এসে ভদ্রলোক বললেন, আজ এখানে বিশ্রাম।

কোথায যাবেন?

কেন ডাক বাংলোতে।

পথের ধারেই ডাক বাংলো। স্থান সেখানে যথেষ্ট নয। দুইটি পরিবার থাকবার মতো স্থান নেই। সরকারের পোষ্যপুত্রের দল আগেই দখল করে রেখেছে বেশি অংশটুকু।

স্থির হল মেয়েরা থাকবেন ঘরে, আর পুরুষরা থাকবেন বারান্দায়। আর গাড়ি থাকবে সামনের মাঠে।

ব্যবস্থাটা মৌখিক কিন্তু সবসম্মত নয়। মর্যাদার প্রশ্নে লতাহু যে প্রতিবাদ করবে তা জানতাম। শেষ অবধি ভদ্রলোক সস্ত্রীক রইলেন ঘরে, আর আমরা দুজন বিছানা পেতে নিলাম পেছনের বারান্দায়। অবশ্য পরস্পরের সান্নিধ্য বাঁচিয়ে অনেকটা দূরে। সারাদিনের ক্লান্তিতে চোখ জুড়ে আসছিল, অথচ মনটা ছিল জেগে। দেহ আর মনের দ্বন্দ্ব চলছে তাই ঘুমও আসছে না।

লতাহু শুযে পড়েছে। খেযে উঠে অন্তত আধ ঘণ্টা গল্প না করে কোন দিনই সে বিছানায় গা এলায না, আজ ঘটল ব্যতিক্রম। বুঝলাম, লতাহু খুবই ক্লান্ত। তার নড়ন চড়ন নেই। বোধহয ঘুমিযে পড়েছে। দেখবার মতো শারীরিক অবস্থা আমারও নয। চোখ বুঁজেই অনুভব করতে চেষ্টা করছিলাম।

মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ।

পাশ ফিরে শোবার খসখসানি।

আবার নিস্তব্ধতা। দূরে গাছের মাথায় একদল পেঁচা ডেকে উঠল।

বাদুড়ের দল ঝট্পট্ করছে কোন ফলন্ত গাছের মাথায়। আবার নিস্তব্ধতা।

শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম। আমাদের চাল চুলো নেই, পরিচয় নেই। আমাদের পক্ষে যা সম্ভব ও স্বাভাবিক সঙ্গী দম্পতির পক্ষে তা মোটেই সম্ভব বা স্বাভাবিক নয়। পরিব্রজনের নেশায় ওরা এসেছে, আর আমরা এসেছি অজ্ঞাত বিধিলিপির নির্দ্দেশে। বিধি বিধান দিয়েছেন, পথ তোদের ঘর, তাই সে ঘরের মায়া ছাড়তে পারছিনা।

ভদ্রমহিলা স্বল্পভাষী। যাকে মিশুকে বলে তা নয়। অথচ দৃষ্টি তার কম প্রসারিত নয়। লতানু যখন বলছিল পাণ্ডুয়ার কথা তখন তিনি অভিনিবেশ সহকারে শুনে চলছিলেন। মনে হচ্ছিল লতানুর কথাগুলো যেন গ্রাস করছিলেন। লতানুর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ হোক আর অন্য কোন কারণেই হোক কোন প্রশ্ন করেন নি, প্রতিবাদ করেন নি, মন্তব্য করেন নি, নীরব শ্রোতার ভুমিকাই গ্রহণ করেছিলেন আগাগোড়া।

ভদ্রলোকও অনুসন্ধিৎসু কিন্তু তার্কিক নন। তাই আগাগোড়া আলোচনাই হয়েছে, সমালোচনা হয নি। তর্কের ঝড ওঠেনি। অজ্ঞাত কুলশীল দুজনকে সাথে করে চলার যে বিপদ তা অগ্রাহ্য করে তিনি যে মহত্ব দেখিয়েছেন তাতে মুগ্ধ না হযে পারিনি।

পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়েই এতটা পথ এসেছি, বাকি পথটুকু এই শ্রদ্ধা বজায় রেখে যদি চলতে পারি তা হলেই যথেষ্ট।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম না বলে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব বলতে পারি। সুকোমল হস্ত স্পর্শে চোখ মেলে তাকাতে হল।

মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, কে?

আমি গো আমি।

যা কখনও ঘটেনি তাই ঘটল। লতানু মাথার কাছে বসে বলল, ঘুম আসছে না। উঠে এসে দেখি তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছ। হিংসা হল। বুঝলে?

লতানু আমার মাথার চুলে আঙ্গুল দিয়ে বিলি কাটতে লাগল।

আজ অবধি কোন দিনই লতানু রাতের বেলায় আমার বিছানায় এমন

সপ্রতিভভাবে এসে বসেনি। রাতের অন্ধকার নেমে এলে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করেই চলেছে সে। আজ সেই চিরাচরিত রীতি ভঙ্গ করে লতামু কেবলমাত্র আমার বিছানায় এসে বসেনি, তার সাথে উপরি লাভ হল মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া, এ যেন অদ্ভুত মনে হল।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার এ ভাবান্তর কেন?

কিসের ভাবান্তর?

যা কোনদিন করনি তাই করছ।

যেমন?

আজ অবধি কোনদিন রাতের বেলায় আমার বিছানায় এসে নিঃসঙ্কোচে বসনি, হঠাৎ আজ কি মনে করে এসে বসলে!

তুমি কেমন করে জানলে আমি কখনও আসিনি। তুমি হয়ত সে সময় বেঘোরে ঘুমিয়েছ, টের পাওনি।

অস্বাভাবিক হলেও তা হতে পারে। উদ্দেশ্যটা কি?

শুয়ে শুয়ে একটা কথা মনে হয়েছে, তারই সমাধান খুঁজতে এসেছি।

আমি সত্যদ্রষ্টা ঋষি নই।

তা নও, কিন্তু শুভ বুদ্ধির ধারক বলে বিশ্বাস করি। তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

মন্দ কি, বলতে থাকো।

তোমার আমার সম্পর্কটা যত ঘোলাটে, সাহচর্য তত ঘোলাটে নয়।

তা জানি।

এর পরিণতি কি?

পরিণতি অশুভ নয়। আদিম যুগের মা-বাবার সম্পর্কটা আমাদের মতই ঘোলাটে ছিল। সমাজের স্বীকৃতি ছিল যে যুগে অজ্ঞাত; কেন না সমাজের বাস্তবস্থিতি ছিল না, সমস্বার্থের বন্ধন ছিল না বলেই সেদিনের পিতামাতা পরস্পরের স্বীকৃতির মাঝ দিয়ে বেঁচে থাকত, সামাজিক স্বীকৃতির কোন প্রয়োজন ছিল না। তারই পরিণতিতে সৃষ্টি হয়েজিল বিরাট মনুষ্য-জাতি, সৃষ্টি হয়েছিল তাদের সমাজ, রাষ্ট্র এবং সভ্যতা। আজ সেই পরিচয়কে সুস্থ মন নিয়ে চিন্তা করতে পারি না, কেন না আমরা বিধি নিষেধের অক্টোপাশের নির্দ্দয় আশ্রয়ে বাস করি। আদিমযুগকে অসভ্য

যুগ মনে করি, অতীতের পিতামাতাকে উপহাস করি। আদিকে বাদ দিয়ে অন্তকে আশ্রয় করতে চাই।

লতাহ্ দৃঢ়ভাবে বলল, কারণ আমরা সে যুগে বাস করছি না।

সেইটে কিন্তু প্রচণ্ড বাধা নয়। যুদ্ধ বিদ্ধস্ত দেশেও বর্তমান কালে নতুন সমাজ গঠনের তাগিদে মানুষকে বহু দুর্ভাগ্য মেনে নিতে হয়েছে। আমাদের দেশে যুদ্ধজনিত কোন ভাঙ্গাগড়ার পেষণ সহ্য করতে হয়নি, তাই স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ককে তুলসী ধোয়া জল দিয়ে শুচিময় করতে চেয়েছি, মনে করেছি সেটুকুই বুঝি সর্বস্ব।

বাহ্যত তাই, আজ কিন্তু ভাঙ্গনের মুখে আমরা দাঁড়িয়ে। এই ভাঙ্গনকে অস্বীকার করে যারা জোর করে আঁকড়ে ধরতে চায় অতীতের ব্যবস্থা তারা নিরাশ হবে, তাদের এই ব্যর্থ প্রচেষ্টার অতি নিকটবর্তী ফল হবে সমাজ-ভেঙ্গে পড়া।

তাও মিথ্যা নয়। দেশ বিভাগের মাঝ দিয়েই যেন শুভ ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ নূতন উপনিবেশ গড়বে, নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, তাতে পুরাতনের মর্যাদা হয়ত রক্ষা হবে না। কিন্তু মানুষ নৈকট্য বোধ করবে। ভূমির গণ্ডীতে যারা আপন হয়েও পর হয়ে থাকতো তারা নতুন সমাজ ব্যবস্থায় আপন হয়ে উঠবে। আমাদের সাহচর্য আজ মনে প্রাণে গ্রহণ করতে বাধছে, যেদিন নতুন উপনিবেশে নতুন একটি সমাজব্যবস্থা স্থান গাড়বে সেদিন কিন্তু একটি নারী ও একটি পুরুষের পরস্পর সান্নিধ্যকে আইন স্বীকৃতি দেবে, কেননা যারা বসবাস করবে তাদের বোঝাপড়াই হবে সমাজ ব্যবস্থার মূল।

লতাহ্ প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বলল, সেই নতুন পরিবেশে ধর্ম ও রাষ্ট্রের অনুশাসন মানবার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।

হেসে বললাম, সমাজের জন্যই ধর্ম ও রাষ্ট্র। মনোজগতে এর প্রয়োজন ফুরোয় নি। এখনও ধর্ম ও রাষ্ট্রের অনুশাসনকে সমাজ স্বীকার করে এবং মর্যাদা দেয়। মনোজগতে কোন বিপ্লব ঘটেনি বলেই ঘটনাটা উল্টো হয়েছে। সমাজ সৃষ্টি করেছে ধর্ম ব্যবস্থা। সমাজ যা মেনে নেয় তা যদি রাষ্ট্র এবং ধর্ম ব্যবস্থা মেনে নিত তা হলে বেশি শৃঙ্খলা দেখা দিত। তা হয়নি, আমরা সৃষ্টিকে স্রষ্টা বলে মেনে নিয়ে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে

ক্ষমতা দিয়েছি সমাজকে চাবুক মেরে পরিচালনা করতে। য়্যালিসের গল্পের নাইটের মতো আমাদের এই সমাজের অবস্থা। আমরা সহজ পথটাকে উল্টে নিতেই বেশি অভ্যস্ত। স্ত্রী-পুরুষ যদি পরস্পর বোঝাপড়া করে নিয়ে স্বামী ও স্ত্রী হবার দাবী নিয়ে দাঁড়াত তা হলে কারও কিছু বলবার থাকত না। তা পারি না, কেননা পুরাতন মন নতুনকে কখনও সাদর সম্ভাষণ জানায় না। মানুষের শুভ রুচি তাই সামাজিক মর্যাদা লাভ করতে পারে নি, সে পথে বিঘ্নরূপে দেখা দিয়েছে পুরাতন অনুশাসন।

কিন্তু এ বোঝা-পড়ার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকেই বিশ্বাসী নয়। আজ যা মনে হয় চিরস্থায়ী, তার পেছনে রয়েছে দেহের আকর্ষণ। অতি শীঘ্রই উভয়ের স্তিমিত প্রায় আকাঙ্ক্ষা উভয়কে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় ভিন্ন মুখে। পুরুষ ছুটতে চায়, নারী বন্ধন দেয়। তখন বোঝাপড়ার মর্যাদা বোধ থাকে না, থাকে কেবল মাত্র লেনদেনের সম্পর্ক। স্বার্থ কেন্দ্রীভূত হয় সন্তানের মাধ্যমে। তবুও ধর্ম এবং রাষ্ট্র অনুশাসন দেয়, কেননা ব্যক্তি স্বার্থকে বাঁচাতে হলে অনুশাসন অভিভাবকত্ব না করে পারে না। অনুশাসন না থাকলে সুস্থ গৃহধর্ম যেমন অসম্ভব হত, তেমনি বিশৃঙ্খল হয়ে উঠত মনুষ্য সমাজ।

বললাম, যদি পরস্পরের ভালবাসা ও বোঝাপড়া না থাকে তা হলে বসবাস করাটা হয় যান্ত্রিক। এই যান্ত্রিক অবস্থা চলে এসেছে এতকাল, এখনও চলছে অথচ সমাজ বেদনা বোধ করে এই যান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল দেখে কিন্তু সচেতন হয় না এই যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে। সমাজ তার নিজের অক্ষমতাকে বোঝাপড়ার কাল্পনিক অভাবের ওপর ছেড়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে চায়। এই হল যুগধর্মের বৈপরীত্য এবং অবাঞ্ছনীয় প্রতিফলক।

লতানু চুপ করে বসে রইল। তার নিঃশ্বাসের শব্দ ভিন্ন কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। মনে করেছিলাম লতানু কিছু বলবে কিন্তু সে মৌনতা অবলম্বন করাতে আমিই আবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ এ কথা মনে হল কেন?

মনে কর, আমরা সমাজের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, আমরা স্বামী-স্ত্রী। এতে কোন অসুবিধা আছে কি?

বলাটাই বড় দাবী নয়। আচার ব্যবহার দিয়েই সমাজ এই সম্পর্ক বিচার করবে। সমাজের কোন অসুবিধা নেই, অসুবিধা রয়েছে আমাদের। যেদিন বোঝাপড়ার মাঝে প্রাচীর উঠবে মতানৈক্যের সেদিন আমাদের সুপ্ত পুরাতন মনটা জিজ্ঞাসা করবে, কি অধিকার রযেছে তোমার, সেদিন এই ভঙ্গুর সমাজের বুকে বসেই আমরাই বলব, "আমি তোমার স্ত্রী নই, আমি তোমার স্বামী নই"। আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, অনুষ্ঠানের মূল্য নেই, কিন্তু সেদিন এই অনুষ্ঠান প্রাধান্য লাভ করবে। ব্যক্তি স্বার্থকে বৃহতের মাঝে বিলিয়ে দিতে না পারলে এই দৃঢ় দাবী অদূর ভবিষ্যতে লাঞ্ছনার ক্ষেত্র হয়ে উঠবে। আমার তোমার পরিচয় উপহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়াবে।

বাঁধন দেবার জন্যই অনুষ্ঠান। যেদিন অধিকার অস্বীকার করবার সময আসবে, সেদিন অনুষ্ঠানের বন্ধন হবে বেদনাদাযক ব্যঙ্গ। বিচ্ছেদের প্রযোজন হবে অনিবার্য। যাতে মানুষ সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে তার জন্য আইন, সে আইন যদি মনোজগতে পরিবর্তন আনতে না পারে তা হলে আইন দিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা মুর্খতার নামান্তর। মতানৈক্যই যদি শুভবুদ্ধি হন্তারক হয়, তাহলে অনুশাসনের সাধ্য নেই মতৈক্য সৃষ্টি করবার।

তোমার কথায় মনুষ্যত্ব বোধের দাবী রযেছে। জানি, প্রীতি ভালবাসা যেখানে নেই সেখানে বন্ধন দেবার রজ্জু শ্লথ হয় আপনা থেকেই। তবুও আমরা চেষ্টা করি যতটা সম্ভব পরস্পরের জীবনকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে। এ চেষ্টা হল শুভ ইচ্ছার বাহক, এতে আপত্তি কোথায়?

ওতে যদি আপত্তি করবার না থাকে, তাহলে পরস্পরকে প্রীতি ভালবাসায় আপন করে নিতেও আপত্তি থাকা উচিত নয়। পরস্পর বিরোধী তো এর নয়।

তা নয়, কিন্তু অভিজ্ঞ মানুষ নারী পুরুষের প্রেম-প্রীতি এবং যৌন জীবনকে গৃহধর্মের গ্যারান্টি বলে মনে করে না, গ্যারান্টি খোঁজে অনুশাসনের মাঝ দিয়ে।

যে মানুষ বাঁচবার গ্যারান্টি দিতে পারে না, জন্মাবার গ্যারান্টি দিতে পারে না, সেই মানুষ জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানটার সাময়িক অবলম্বনের সময়

খোঁজে গ্যারান্টি। মনে হয় এর চেয়ে অদ্ভুদ চিন্তা আর কিছুই থাকতে পারে না। ভাগ্য, নিয়তি আর ভগবান বিনা আর কোন পথ এরা দেখতে পায় না বলেই গ্যারান্টি দিতে চায় অথচ গ্যারান্টির মর্যাদা দিতে পারে না।

বলতে বলতে লতান্থ উঠে গিযে নিজের বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

মৃত্নস্বরে ডাকলাম, লতান্থ।

লতান্থ উত্তর দিল, উঁ।

আমার কথা তোমার মনঃপূত হয়নি। কেমন?

আমাব কথা কিন্তু তা নয়। প্রেম-প্রীতি-ভালবাসাকে আভিধানিক শব্দ মনে করবার কারণ আছে কি?

তা যেমন নেই তেমনি অনুশাসনকেও তো বাদ দিতে পার না।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে ওরা চিরকালই বাদ থাকবে। যারা ব্যক্তি-ধর্মে ওদের অপরিহার্য মনে করে তারা কখনই স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে না।

বুঝলাম, যুক্তি অচল, কেন না লতান্থ নিজের কথা থেকে এক ইঞ্চিও এদিক ওদিক যেতে রাজি নয়। এ সংঘর্ষ নতুন নয়, অনাদিকাল থেকেই এই জিজ্ঞাসা রযেছে মানুষের সমাজে।

চুপ করে শুযে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে গেছি।

সকালবেলায আবার যাত্রা হল শুরু।

গাডি এসে দাঁডাল বাঙ্গালবাডি।

সামনেই কেল্লা।

কেল্লা।

হাঁ কেল্লা। রাজা মহেশচন্দ্রের কেল্লা ছিল এখানে। এখন তার চিহ্নও নেই, রয়েছে সুলতান হোসেনশাহের বিজয়স্তম্ভ।

কেল্লায় পৌঁছাবার আগেই সমাধি মন্দির চোখে পড়ল।

গ্রাম্য ত্ব-চারজন ছিল সেখানে। জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কার সমাধি?

পীর বদরুদ্দিনের।

মনের পাতায় পীরকে খুঁজতে লাগলাম। বড়ই ঝাপসা এই পীরের স্মৃতি। হোসেনশাহের ধর্মগুরু ছিলেন এই পীর বদরুদ্দিন। সুলতানের সাথেই এসেছিলেন মহেশচন্দ্রকে শায়েস্তা করতে। তারপর হতেই থেকে গেছেন

হেমতাবাদের মাঠে। উদেশ্য ছিল ধর্ম প্রচার, কেউ বলে অপরের ধর্ম নষ্ট করবার প্রতিশ্রুতি নিয়েই পীর থেকে গিয়েছিলেন এই হেমতাবাদের মাঠে।

লতাগুকে ঘটনাটা বলতেই গম্ভীর ভাবে বলল, একজনের ধর্ম নষ্ট না করে অপরজন ধর্মের ধ্বজা ওড়াতে পারে না। প্রচারের বিপরীত শব্দ হল নাশ।

সমাধিটা ঘুরে ফিরে দেখে লতাগু বলল, এটা কোন কালেই সমাধি ছিল না। ছিল হিন্দুর মন্দির। সেই মন্দিরের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের নিদর্শন আজও রয়েছে। বিজেতা বিজিতের ধন-ধর্ম সব কিছু নিয়েও খুশী হয়নি। ধর্মের উৎকট গোঁড়ামিতে শিল্পকেও ধ্বংস করেছে। ঢাকার তাঁতিদের আঙ্গুল কেটে দিয়ে মসলিনের উদপাদন বন্ধ করেছিল বলে আমরা ইংরেজকে শাপ-শাপান্ত করি, কিন্তু ইতিহাস বিজয়ীদের জন্য বিজিতের সর্বাঙ্গীন সর্বনাশেরই সাক্ষ্যদান করছে, কোথাও কোন ব্যতিক্রম নেই। এরা মানুষ হিসাবে আসে না, এরা আসে রক্তপিপাসু ঘাতকরূপে। ঘাতকবৃত্তি মানবধর্মের সামান্যতম প্রসাদবঞ্চিত থাকে এই ধ্বংস কোন জাতি বা ধর্মের বিভীষিকা নয়, বরং বলা যায় বিজয়ীর লালসা কাতর পক্ষাঘাত গ্রস্থ মনের বাস্তব চিত্র। ইংরেজও ছিল বিজয়ী। বিজিতের ওপর কেউ কম নিষ্ঠুর ছিল না। ধর্মটা হল নিছক ছলনা, আসল উদ্দেশ্য দুবলকে উৎপীড়ন করা, তা সবাই সমান ভাবে করেছে ও করছে। ইংরেজ ধ্বংস করেছে শিল্পীকে, তার পূর্ববর্তী শাসকরা ধ্বংস করেছে শিল্পকে।

যুক্তির দিক থেকে লতাগু অকাট্য কথা বলেছে, তবুও বিজয়ীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন এতেই যেন শেষ হয়নি।

এগিয়ে চললাম, হোসেনশাহের বিজয়স্তম্ভ দেখতে।

হোসেনশাহের মত ন্যায়পরায়ণ নৃপতির নাম এই মহেশচন্দ্রের সাথে যুক্ত রয়েছে বলে ব্যথা অনুভব করলাম।

মহেশচন্দ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের স্বাধীন নৃপতি। তরাইয়ের বনভাগেই তার রাজ্য। বাঙ্গালবাড়ি থেকে উত্তরে ষাট সত্তর মাইল, দক্ষিণে বিশ পঁচিশ মাইল এ রাজ্যের দৈর্ঘ। প্রস্থ ছিল মহানন্দা নদী থেকে টাঙ্গন নদী অবধি। মহেশচন্দ্রের পূর্বপুরুষ সুলতান সরকারের রাজস্ব আদায় দিয়ে এসেছে। মহেশচন্দ্র রাজস্ব বন্ধ করে দেন। বাংলায় যখন মৎস্যন্যায় তখন মহেশচন্দ্র

অনাচারের হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিল তার প্রজাকুলকে। হোসেনশাহ সিংহাসনে বসবার আগে মহেশচন্দ্র শান্তি স্থাপন করছিলেন স্বরাজ্যে। কিন্তু প্রবল দুর্বলের সমৃদ্ধি সহ্য করে না, হোসেনশাহও করেননি।

হোসেনশাহ সিংহাসনে বসেই মহেশচন্দ্রের কাছে রাজস্বের দাবী জানালেন।

মহেশচন্দ্র রাজস্ব দিতে অনভ্যস্ত।

অস্বীকার করলেন মহেশচন্দ্র।

সুলতানী ফৌজ এগিয়ে এল।

মহেশচন্দ্র বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে। স্বাধীনতা রক্ষাকামী বীরত্বের মুখে সুলতানী ফৌজ লড়াই ছেড়ে দিলে চোঁচা দৌড়। লুণ্ঠক পরাজয় স্বীকার করলেও তার প্রতিহিংসার নিবৃত্তি হয় না। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।

যথাসময়ে সংবাদ পৌঁছালো সুলতানী দরবারে।

হোসেনশাহ গৌড়ের সমগ্র শক্তি নিয়ে হাজির হলেন বাঙ্গালবাড়ির উর্ব্বর ময়দানে। শুরু হল ঘোরতর যুদ্ধ।

মহেশচন্দ্র অস্ত্র সজ্জিত হয়ে বিদায় নিতে গেছেন অন্তঃপুরে। মহেশচন্দ্রের রাণীরা তিলক এঁকে দিল তার কপালে। বিদায় চুম্বন এঁকে দিল অধরে।

রাজা চললেন যুদ্ধে।

মহেশচন্দ্র রাজা ঘোড়ায় চড়ে যান।
পায়ের চাপে মাটি ফেটে হয় খানখান।

হেমতাবাদের ময়দানে ভীষণ যুদ্ধ। মানুষের মাথা ছিল উঁচুতে, গড়িয়ে পড়ল নীচুতে।

'কজন মরল কজন বাঁচল কে করে ব্যাখান॥'

খবর এল মহেশচন্দ্র ভূমিশয্যা নিয়েছেন।

রাণীরা চিতা সাজিয়ে সবাই এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল আগুনে।

সুলতানী ফৌজ দখল করল দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, কোষাগার। তখন সব শূন্য। বিজয়ীকে ব্যঙ্গ করে চিতার ধুঁয়ো তখনও আকাশের কোলে কুণ্ডলী পাকাচ্ছিল।

ধ্বংসস্তূপ দাঁড়িয়ে রয়েছে আজও, রয়েছে চতুষ্কোণ উচ্চভূমি যেখান থেকে রাণীরা লক্ষ্য করছিল যুদ্ধের গতি। সেই চতুষ্কোণ ভূমিতেই হোসেনশাহের জয়স্তম্ভ। ওই ভূমিকেই লোকে বলে হোসেনশাহের বিজয় কীর্তি।

হোসেন শাহ ফিরে গেলেন।

রয়ে গেলেন পীর বদরুদ্দিন। তাঁর কাজ হল হিন্দুদের মন্দির প্রাসাদ ভেঙ্গে মুসলমানী ছাপমারা। নিজেও মৃত্যুর সময় নির্দ্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন হিন্দুর মন্দিরে সমাধি দেবার। বোধহয় ঈশ্বর এবং আল্লা দুজনেরই আশীর্ব্বাদ পাবার আশা ছিল তার। সেদিনকার সেই পীর যদি বুঝতেন ঈশ্বর এবং আল্লার কোন প্রভেদ নেই, প্রভেদ রয়েছে অনুষ্ঠানের, তাহলে যুক্তিহীন ভাবে অপরের স্কন্ধে অত্যাচারের ঝাণ্ডা গেঁথে বসিয়ে ধর্মের নামে অধর্ম করে যেতে পারতেন না।

গাড়িতে এসে উঠলাম।

গাড়ি ছুটল।

বাঁ দিক রায়গঞ্জকে রেখে গাড়ি এসে দাঁড়াল নাগর নদীর কিনারায়।

ভদ্রলোক বললেন, নদী পার হলেই বিহার।

সেদিন যাবার পথে যে অংশকে বিহার দেখেছি আসবার পথে সেটাই দেখেছি বাংলা। অবশ্য সে অংশে একজনও বিহারী কোন দিন ছিল না. আজও নেই, তবুও প্রভু কৃপায় বাংলাকে বিহার করে রাখবার অপচেষ্টায় আমরা হাত তুলে সম্মতি জানিয়ে এসেছি। কেন না, প্রভুভক্তির জন্য আমাদের খ্যাতি রয়েছে।

নৌকা করে নদী পেরিয়ে এলাম। আবার উঠলাম গাড়িতে।

গাড়ি ছুটেছে দুর্জ্জয় বেগে। জনহীন রাস্তা, কচিৎ কোথাও মানুষ দেখা যাচ্ছে, কখনও দেখা যাচ্ছে দু একখানা গাড়ি।

গাড়ি আটক করল কর্ণদিঘীতে। বিহারী পুলিশ, মাথায় টোপর, ভাষা কর্কশ, চেহারা যমদূতের নিকৃষ্ট কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

পোর্‌মাট ?

ভদ্রলোক পারমিট বের করলেন।

বিহারের প্রতিভূবিদ্যাক্ষেত্রে বেশ মাটো। পাঠ উদ্ধার করতে না পেরে থানাদারের কাছে গেল। আমরা বসেই রইলাম গাড়িতে।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে, না আসছে সেপাই, না আসছে থানাদার। মনে মনে পারমিটের ভাগ্য চিন্তা করছি। রাস্তা থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম থানার ভেতরটা। থানাদারের সামনে পারমিটখানা হাতে নিয়ে সেপাই দাঁড়িয়ে রয়েছে, থানাদার দেখবার সময় পান নি। পদার্থ বিশেষের সাথে পদার্থ বিশেষ মিশ্রিত করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চাপ দিচ্ছেন হাতের তেলোতে। ভোজ্য ব্যবস্থার মাঝখানটায় পারমিট নামক বস্তুটির যে কোন স্থান নেই তা বুঝতে বিলম্ব হল না। কিন্তু হঠাৎ চাকা উল্টো দিকে ঘুরতে লাগল। পারমিট শ্রীহস্তে ধারণ করে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসল থানাদার। যাদুর খেলা দেখলাম।

জিপের সামনে এসে দু পায়ের গোড়ালিতে জুতোর আওয়াজ করে একেবারে মিলিটারী কায়দায় স্যালুট্।

একি শুনি মন্থরার মুখে। থুক্কুরি, একি দেখি পাপ চক্ষে।

থানাদার রাষ্ট্রভাষায় যা বলল, তার সহজ সরল অর্থ, বোকা সেপাই না জেনেই হুজুরকে তকলিফ্ দিয়েছে, মার্জনা করবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

খোলা পারমিট খানার ওপর চোখটা বুলিয়ে নিলাম।

ভদ্রলোক আবার গাড়ি স্টার্ট দিলেন।

আমি গম্ভীর ভাবে বসে রইলাম।

লতাহু ভদ্রলোকের পদ মর্যাদা বুঝলেন।

ভদ্রলোক একবার মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, কিছু বললেন না।

পরিচয় হঠাৎ জানা যায়, আমিই বললাম।

ভদ্রলোক হঠাৎ হাসলেন, বললেন, জেনেছেন।

জানলাম।

ক্ষুব্ধ হননি তো?

মোটেই নয়, তবে মর্যাদাদান করিনি বলে দুঃখিত।

দুঃখিত! কেন?

আগে জানলে উপকৃত হতাম।

এখন উপকারের আশা নেই।

তা নয়। মানুষের চেহারাটা তার পরিচয় নয়, তা জেনেই অনুসন্ধিৎসা জাগেনি শুধু পথের সাথী মনে করে।

এটা তো আপনাদের পক্ষেও প্রযোজ্য।

আংশিক।

আমরা কিন্তু বন্ধু। পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল না। বন্ধুত্বের পরিচয়ই যথেষ্ট। নির্দোষ বন্ধুত্বকে শ্রদ্ধা করেছি এই তো গৌরব।

চুপ করে গেলাম।

লতানু উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল। বলল, এমন তো হতে পারত বন্ধুত্বের তলায় বিষ তীর লুকানো রয়েছে।

আমাদের বর্মও কম শক্ত নয়। ভেদ করতে পারতেন কি।

লতানু জবাব দেবার আগেই ডালখোলার ক্রশিং-এ গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। গেট বন্ধ। ভদ্রলোক নেমে পেট্রোল মেপে নিয়ে আবার গাড়িতে এসে বসলেন।

বললেন, আজ কিষণগঞ্জে রাত্রিবাস।

বললাম, যা ভাল বোঝেন।

একখানা প্যাসেনজার ট্রেন পেরিয়ে গেল। গেটম্যান গেট খুলতেই আবার ছুটল গাড়ি। দুপাশে গাছের সারি, গাছের বয়স অনুমান করে বোঝা গেল রাস্তারও বয়স হয়েছে। যতই অগ্রসর হচ্ছি ততই যেন গাছের সংখ্যা ও নিবিড়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একপাশে নতুন রেল লাইন পাতা হয়েছে, তারই সমান্তরালে ছুটছে মোটরের রাস্তা। পাসেনজার ট্রেনটা ছেড়ে এসেছি অনেক দূরে। সেটা ধুঁকতে ধুঁকতে পেছন পেছন আসছে।

গাড়ি এসে দাঁড়াল কিষণগঞ্জের ডাক বাংলোতে।

ঘড়ির কাঁটায় দাগ উঠেছে দুটো।

আহার্য ব্যবস্থা হল, স্নানপর্ব শেষ হল।

বিকেলে আগের মতোই বারান্দায় টেবিল পেতে চেয়ারে মুখোমুখি বসলাম।

ভদ্রলোক বললেন, এতক্ষণ আপনারা বাংলার কাহিনী শুনিয়েছেন,

এবার আমি শোনাব বিহারের কাহিনী। বাঙ্গালী আমি কিন্তু বিহার প্রবাসী তারওপর সরকারী চাকুরিয়া, কিছু কিছু তথ্য আমার জানা রয়েছে এদেশের। কাগজে কলমে বিহার হলেও এটা হল আসলে বাংলাদেশ। শতকরা আশীজন বাংলায় কথা বলে কিন্তু বিহার সরকার এই এলাকার সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানদের উর্দু বুলি শেখাতে শুরু করে জাহির করেছে এই এলাকা বাংলা ভাষাভাষীদের আধিক্য নেই। হিন্দী চালু করবার পথ তাতেই সহজ হয়ে এসেছে। অবশ্য এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেননা মুসলমানকে একটা আলাদা জাত স্বীকার করেই দেশ বিভাগ করা হয়েছিল। নীতির দিক থেকে মুসলমাদের পক্ষে এদেশ বিদেশ হলেও আইন তা স্বীকার করেনি বরং ওরা বেশি সুবিধার দাবীদার।

ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন। আমরাও কোন মন্তব্য না করে চুপ করে বসে রইলাম। অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর আবার বললেন, বাংলাকে ভালবাসি তাই মাঝে মাঝে বাংলাকে দেখতে যাই। কাগজ কলমের বাংলাকে ছেড়ে এসে মনে হচ্ছে, বাংলাকে যেন কতদূরে রেখে এসেছি।

রেল ক্রশিং পেরিয়ে বাঁ হাতের ঐ রাস্তাটা গেছে খাগড়ায়। খাগড়া নামটা কেন হয়েছে জানি না, তবে খাগড়ার নবাবদের ঐতিহ্য রয়েছে। বংশ পরিচয়ে খাগড়ার এই নবাব বংশ বাংলা বিহারের সবচেয়ে পুরাতন নবাব বংশ। জাপানের মিকাডো বংশের মত পুরাতন না হলেও প্রায় পাঁচশ বছর এই পরিবারের জমিদারী ব্যবস্থা রয়েছে খাগডায়। হাত বদল হয়নি একবারের জন্যও।

বাদশাহ তখন হুমায়ুন। শেরশাহের সাথে যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত। হুমায়ুন পালিয়ে গিয়েছিলেন পারস্যে। চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুনকে যারা সাহায্য করেছিল হুমায়ুন তাদের ভুলতে পারেন নি। মশকওয়ালাকেও একদিন সিংহাসনে বসিয়ে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করেছিলেন। এই নবাবদের প্রথম পুরুষ সৈয়দ খাঁ দস্তুর হুমায়ুনের পাশে ছিলেন চৌসার যুদ্ধে।

হুমায়ুন রাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতার উপহার দিতে চাইলেন সৈয়দ খাঁকে। হুমায়ুনের পরাভব ঘটাবার পর সৈয়দ খাঁ আত্মগোপন করেছিল। আহার্য ও আশ্রয়ের আশায় পথে পথে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়েছিল সৈয়দ খাঁ। তখন থেকে সৈয়দ খাঁও ছিল নিপাত্তা, তাকে খুঁজে

বের করে হুমায়ুন তাকে জমিদারী দিলেন নেপালের সীমা থেকে কিষণ গঞ্জের সীমা অবধি।

জমিদারী খুব সুখের নয়। দস্তুরকে দস্তুরমতো লড়াই করতে হল নেপালীদের সাথে। নেপালী সৈন্যরা মাঝে মাঝেই হানা দিত দস্তুরের জায়গীরে। শুধু দস্তুর নয়, তার পরবর্তী বিশজন নবাবকে প্রচুর সৈন্য রাখতে হত নেপালীদের হানা রুখতে। ইংরেজ আসবার পর এই হানা-হানির বিরাম ঘটেছিল।

নবাবরা ছিলেন সৌখীন ও বিলাসী। চরিত্রগত দুর্বলতার কথা না বললেও চলে। সামন্ত চরিত্র সর্বত্র সমান। পরবর্তী কালে ইংরেজদের সাথে এল নতুন বিলাসের উপকরণ। নবাবরা দু হাতে সংগ্রহ করতে লাগল সে সব উপকরণ। কিন্তু অর্থবৃদ্ধি না হলে বিলাসের খাতে ব্যয় বৃদ্ধি সম্ভব হচ্ছে না দেখে নবাব আতাহুসেন খাগড়ায় মেলা বসালেন। তৎকালেও এই মেলার আয় ছিল তার জমিদারীর সমগ্র রাজস্বের এক অষ্টমাংশ। শীতকালে একমাস যাবত এই মেলা বসে। গরু, ঘোড়া, হাতী, উট থেকে আরম্ভ করে ঝুনঝুনি, আলতা, সিন্দুর সব কিছুই বিক্রি হয় মেলায়। আগে মেলায় বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল দেহ পণ্যের দোকান। মেলার আকর্ষণ সরল সহজ মানুষদের মনকে শুধু বিকৃত করত না দেহেও ছড়িয়ে দিত অশ্লীল রোগ বীজাণু। নবাবীর তক্ত শক্ত হয়েছে এই অপকর্মের ট্যাক্স আদায় করে। আজও এই ব্যবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নি।

গল্প শেষ করে বললেন, যাবেন নবাব বাড়ি বেড়াতে।

বললাম নবাব বাড়ি যাবার মতো বেশ ভূষা আমাদের নেই। বলতে কুণ্ঠা নেই এসব নবাব-বাদশা, রাজা-রাজরাদের কোন দিনই প্রাণের সাথে গ্রহণ করতে পারিনি, পারবও না। শৃঙ্গীর কাছ থেকে শত হস্ত দূরে থাকাই শ্রেয়।

ভদ্রলোক বললেন, নবাব দেখতেও যাব না, নবাবী করতেও যাব না। যেমন সাধারণ পথিক পথ চলতে হর্মের দিকে চেয়ে থাকে, তেমনি চেয়ে দেখেই চলে আসব।

লতানু বলল, এতে আপত্তি কি আছে।

ভদ্রমহিলা বললেন, খোকাটার শরীর ভাল নেই। আপনারা যান আমি আর যাব না।

অতএব যাওযাটা ইচ্ছামূলক হলেও শেষ অবধি কারও যাওয়া হলনা।

লতাহ্ন উঠে গেল শিশুর সেবা কবতে।

আমি চুপ করে বসে রইলাম। ভদ্রলোক সামনেব আঙ্গিনায পায়চারি করতে লাগলেন।

লতাহ্ন ফিরে এসে বলল, শিশুসেবা আমার কুষ্ঠিতে লেখা নেই।

মানে ?

নিজের সন্তানকে বাঁচাইনি, তোমাব সন্তানকে বাঁচাতে পারি নি। তাই ভয হচ্ছে, এদেব সন্তানকে সেবা করতে গিযে এদেবও কোন হানি না হয়।

শঙ্কিতভাবে বললাম, তোমার এই থিওরিতে আমার বিশ্বাস নেই। তবুও তোমার মন যদি না চায অনর্থক কলঙ্কের ভাগী যাতে হতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখ।

অবশ্য এমন কিছুই নয। খোকা কয়েকবার হেঁচেছে মাত্র। গরম তেল মালিশ করলেই সেরে যাবে। ওরা সাহেব মানুষ, তাই ওষুধটা আগে দরকার হয, আমাদেব মা ঠাকুমার টোটকা মানতে চায না।

লতাহ্ন হাসল।

লতাহ্নর এমন বিষণ্ণ হাসি কখনও দেখিনি।

তার মনের কথা যেন ফুটে উঠেছিল এই হাসিতে।

সকাল বেলায আবার রওনা হবার প্রস্তুতি শুরু হল।

গাড়ি ছুটল।

ছুটতে ছুটতে এলাম সোনাপুর ঘাটে।

ভদ্রলোক বললেন, ওপারেই বাংলা।

মহানন্দা শীর্ণকাযা খরস্রোতা।

কাঠের সাঁকো বাঁধা হয়েছে বাংলা বিহারকে যুক্ত করতে।

নদী পেরিয়েই আরম্ভ হল চা-বাগান।

দুপাশে চায়ের গাছ। কেয়ারীর মতো ছাঁটা। বড় বড় নাম-না-জানা

গাছ ছাতা ধরে আছে মাথায়। কালো পীচের রাস্তা নিঃশব্দে শুয়ে আছে পথিককে অভ্যর্থনা জানাতে।

গাড়ি ছুটছে।

সামনে নগাধিরাজ। লবনাম্বু তখন অনেক দূর।

শিলিগুড়ি এসে গাড়ি দাঁড়াল।

ভদ্রলোক বললেন, আমাদের যাত্রাপথের এখানেই সাময়িক যতি। এখান থেকে দার্জিলিং যাব। আপনাদেরও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। চলুন দার্জিলিং বেড়িয়ে আসবেন।

লতাম্বু হাত জোড় করে বলল, মার্জনা করুন। এখানেই আমাদের পথ হবে ভিন্নমুখী।

ভদ্রলোক বললেন, আপনারা বলেছিলেন বেড়াতে বেরিয়েছেন, তাতে দার্জিলিং না যাবার মতো মাথার দিব্যি তো থাকতে পারে না।

তা বটে। কিন্তু প্রশ্ন রয়েছে সামর্থ্যের। আমাদের মতো লোক যখন রাস্তায় বের হয় তখন দায়ে পড়েই বের হয়। আমাদের সামর্থ্য অতিক্রম করে তখনই চলতে বাধ্য হই যখন না চলে গতি থাকে না।

সেটাও বুঝেছি। একবার মনে হয়েছিল, জিজ্ঞাসা করি। পরে ভেবে দেখলাম, ওটা অনধিকার চর্চা। তাই চুপ করে থাকতে হয়েছে।

জানতে চাইলেও বলতে পারতাম না এতই করুণ এবং মর্মস্পর্শী সে কাহিনী যা অপরকে বলবার উপযুক্ত মানসিক শক্তি আমাদের নেই, অথচ সহ্য করতে হয়। উত্তাপে পাথর ফেটে যেতে পারে, জলস্রোতে বনানী ভেসে যেতে পারে কিন্তু আমাদের করুণ মর্মস্পর্শী কাহিনী বুকের মাঝে গুমরে উঠল, ফেটে পড়বার অথবা ভেসে যাবার কোন উপায় নেই। অথচ উত্তাপ ও স্রোত দুটাই আছে মনের কোনে। বাহিরে তার কোন পরিচয় নেই, এইটুকুই সান্ত্বনা।

শেষের কথাগুলো বলতে বলতে ভারাক্রান্ত হল লতাম্বুর কণ্ঠস্বর।

ভদ্রলোক বিচলিত হয়ে বললেন, থাক ওসব কথা। চলুন ছাড়াছাড়ি হবার আগে চা খেয়ে আসি।

স্টেশনের চায়ের দোকানে বসলাম চারজনে। এই আমাদের শেষ সম্মেলন।

চা খেয়ে ভদ্রলোক বললেন, এখন যদি রওনা হই তা হলে সন্ধ্যার আগেই দার্জিলিং পৌঁছে যাব। আপনারা কোন দিকে যাবেন।

ঠিক করিনি। জলপাইগুড়িও যেতে পারি আবার কোচবিহারেও। দু জায়গাতেই যাবার ইচ্ছে আছে। কোনটা আগে আর কোনটা পরে তা স্থির করিনি।

বললাম, কটা দিন মন্দ কাটল না।

ভদ্রলোকের মুখে ফুটে উঠল বিষণ্ণ হাসির রেখা।

ওপাশে লতানু আর ভদ্রমহিলা ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলাবলি করছিল। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়াতেই বক্তব্য অসমাপ্ত রেখে ওরাও উঠল।

জিপ থেকে আমাদের মালপত্র নামিয়ে নিলাম। ভদ্রলোক সস্ত্রীক গাড়িতে উঠলেন। ভদ্রমহিলার চোখ ছল্ ছলিয়ে উঠল, ভদ্রলোক হাত তুলে বিদায় জানিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। আমরাও হাত তুলে অভিনন্দন জানালাম।

গাড়ি ধীরে ধীরে কার্টরোড ধরে উত্তর দিকে রওনা হল। যতক্ষণ গাড়ি দেখা যাচ্ছিলো ততক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম সেদিকে। গাড়ি দৃষ্টির বাইরে যাবার পর ফিরে তাকালাম লতানুর দিকে। লতানুর চোখেও জল।

বললাম, তুমি কাঁদছ লতানু।

লতানু সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, ওদের ঠিকানা নিলে না।

নিয়েছি, ওরা নেয়নি।

লতানু কি যেন ভাবল।

বলল, পথে কত পরিচয় হয়, তাদের জন্য চোখের জল ফেলা নিরর্থক, যাদের জন্য মানুষ চোখের জল ফেলে তারা ভাগ্যবান।

বোধ হয় তাই।

এ পরিচয় অপরিচয়ের মাঝেই মিলিয়ে যাবে। আশ্চর্য, ভদ্রলোক একবারও জানতে দেননি যে তিনি উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী।

পুলিশের মাঝেও ব্যতিক্রম থাকে।

তাই দেখলাম। কোথায় ক্ষমতা জাহিরের বিড়ম্বনা থাকবে, তা নয় ক্ষমতা গোপনের কি কঠিন চেষ্টা। আশ্চর্য।

লটবহর নিয়ে স্টেশনের এক কোণায় এসে বসলাম। বললাম, জলপাইগুড়ি গেলে কেমন হয়!

লতাহু বলল, যা ভাল মনে কর তাই কর।

লতাহুকে মালপত্র দিয়ে টিকিট কিনতে গেলাম। ফিরে এসে দেখি লতাহু আহার্য সংগ্রহ সমাধান করেছে। সোরাবজির হোটেল থেকে খাবার আনিয়েছে।

খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম, দত্তগিন্নি তোমাকে কি বলল।

আমার কর্তাটির ওপর তার লোভ যেন বেশি মনে হল।

তোমার মুখে কিছুই বাধে না।

সত্যি। সে বলল, আপনার কর্তাটি বেশ ভাল লোক।

তুমি কি বললে।

বললাম, ভাল না কচু। আমি ঘর করি, আমি জানি ওর গুণপনা। আমার মতো মেয়ে বলে ওর ঘর করে। অন্য কেউ হলে মুখে নুড়ো জেলে দিয়ে চলে' যেত।

লতাহুর বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেললাম। সেও খিল খিল করে হেসে উঠল। বললাম, এতগুলো মিথ্যে কথা বললে কি করে?

মিথ্যে! কি বলছ! এ যে চন্দ্র সূর্যের চেয়েও সত্যি। সত্য যদি না হত বা হলেও দত্তসাহেব এত যত্ন করে আমাদের নিয়ে আসত কি?

তা সত্যি। বক্তব্যের মাঝ দিয়েই পরিচয়ের গভীরতা প্রকাশ হয়েছে।

নিশ্চয়ই। দুই শ্রেণীর লোক সব চেয়ে বেশি অসামাজিক। যারা নীচ স্বার্থপর তারা সমাজ বহির্ভূত। আর সমাজ বহির্ভূত লোক তারা যারা কবি অথবা সাহিত্যিক অথবা দার্শনিক। এরাই সমাজের শৃঙ্খলা মানতে চায় না। তুমিও সমাজ বহির্ভূত লোক, এখন ঠিক করে নাও তুমি কোন দলের।

যে জোর দিয়ে তুমি তথ্য পরিবেশন করলে তাতে মনে হচ্ছে বিজ্ঞানের কোন স্বতসিদ্ধ ধর্মকথা শোনালে। কোথাও যে কোন ব্যতিক্রম রয়েছে একথা বেমালুম তুমি ভুলে গিয়েছ। আমি নীচ স্বার্থপর কিনা তা তুমি জানো। তবে আমি যে কবি অথবা দার্শনিক নই সে কথা আমি হলপ করে বলতে পারি। তোমার তথ্যকথার কোন পর্যায়ে আমি রয়েছি তা তুমিই জান।

আমিও জানি না, তুমি কোন পর্যায়েরই নয়, তা জেনেও বলতে হয়েছে। তুমি কিছু না হলেও দত্তসাহেবের কাছে এই কথা প্রমাণ করতে হয়েছে, বিশেষ করে দত্তগিন্নির কাছে। যখন দত্তগিন্নি প্রশ্ন করল, আপনাদের ছুটো আলাদা বিছানা কেন? তখন বলতে বাধ্য হলাম, আমার বিয়ের সময় শ্বশুর মশায় ছুটো খাট চেয়েছিলেন। আমার বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, ছুটো কেন? শ্বশুর মশায় বলেছিলেন, অভিজাত পরিবারে এটাই ফ্যাশান, বিলেতে এই প্রথা রয়েছে। সব ফেলে আসতে হয়েছে পূবের দেশে, অভ্যাসটা তো ফেলে আসতে পারিনি।

লতাহ্নর কথা শুনে হাসব কি কাঁদব ভেবে পেলাম না। বললাম, হয়েছে থামো, মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করতে এত বেশি লজ্জাহীন না হলেও পারতে. তাতে বেদ অশুদ্ধ হত না।

লতাহ্ন থামল না, পূর্বের মতই সবেগে বাক্যস্রোত বহাতে লাগল। বলল, দত্তগিন্নি জিজ্ঞাসা করেছিল, ছেলেপুলে হয়নি! বলা শেষ হতেই কেঁদে ফেললাম. বললাম, সহ্য হয়নি। খোকন শুধু কাঁদাতে এসেছিল। ছ মাসও হয়নি। দত্তগিন্নি আর ও প্রসঙ্গ তোলেনি! বোধ হয় বুঝেছিল, শোকের প্রাবল্য এখনও কমে নি। এ সব কথায় মনোবেদনা বৃদ্ধি পাবে। মেয়েদের চোখ ফাঁকি দেওয়া কিন্তু অতো সহজ নয়। তাও ফাঁকি দিয়েছি। বুকের ছুধে যদি ব্লাউজ ভিজে না উঠত তা হলে বিশ্বাস করত না সত্যই আমি সন্তানহারা। তা যদি না বুঝত তা হলে প্রশ্নের শেষ হত না। এত বড় সার্টিফিকেট ছিল বলেই তোমাদের ভগবান আমাদের ছুজনকেই বাঁচিয়েছে।

লতাহ্ন একটু বিরাম দাও তোমার জিহ্বাকে। তোমার বুদ্ধি ও মেধার ওপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, তা বলে এতটা এগোবার প্রয়োজন ছিল না। একটু বেশী অশ্লীল মনে হচ্ছে না কি?

লতাহ্ন হাসল।

জলপাইগুড়ি যাবার গাড়ির ঘণ্টা শোনা গেল। ছুজনে লটবহর নিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। লতাহ্নর বাক্যস্রোত বন্ধ হল।

সন্ধ্যার আগেই এলাম জলপাইগুড়ি।

লতাহুকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাবে?

হোটেলে।

মালপত্র নিয়ে রিক্সায় উঠলাম। বললাম, ভালো হোটেলে চলো।

হোটেলের দোতালায় নিরিবিলি একখানা ঘর পেলাম। কিন্তু শোবার ব্যবস্থা মাত্র একজনের।

লতাহুকে বললাম, খাট যে একখানা।

মেঝে তো রয়েছে।

বিছানা পেতে গা এলিয়ে দিলাম। লতাহু গেল স্নানে।

লতাহুর এই সাময়িক অনুপস্থিতি অনেক কিছু চিন্তা করবার অবসর যেন দিল। বাজ্যের ভাবনার সাথে দ্বন্দ্ব আরম্ভ করে দিলাম।

লতাহুর পাশে শেফালিকে দাঁড় করিয়ে বিচার করতে চাইলাম, কে বেশি মনোরমা। উত্তর পেলাম না। শেফালিকে নিয়ে ঘর সাজানো যায়, লতাহুকে নিয়ে ঘর সাজানো যায় না। লতাহু হল ঝড়ো হাওয়া, বিদ্যুত আর বজ্রের সমাহার। শেফালি হল মৌসুমী মেঘ, আকাশ ছেয়ে থাকে মাঝে মাঝে গর্জে, বর্ষে আবার গুমোট হবে। লতাহু মাঝে মাঝে আকাশকে মুক্তি দেয়, আলো অন্ধকারের খেলা খেলে বেড়ায়। শেফালির দ্যুতি নেই, লতাহু দ্যুতির আধার।

কিন্তু!

লতাহু জড়িয়ে আছে মনের কোনায়, প্রতি পদক্ষেপে, প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে। কেমন যেন ধাঁধা সে সৃষ্টি করে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, জ্ঞানের গভীরতা, জীবন সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। মোহ সৃষ্টি হয়। লতাহুকে ভালবাসা যায়, শেফালিকে ভালবাসা যায় না। লতাহু সমব্যথী, শেফালি কেবলমাত্র ভার্যা। শেফালি ঘর চায়, বর চায় না, লতাহুর কাছে ঘর-বর দুই-ই সমান।

গামছা দিয়ে ভেজা মাথা মুছতে মুছতে লতাহু এসে দাঁড়াল। আমার চিন্তার গতি রুদ্ধ হল।

বলল, যাও, তুমিও স্নান করে এস। কদিন বিশ্রাম করতে হবে। এই নাও সাবান। যাও ওঠ, আর শুয়ে থেকো না।

লতাহুর তাগাদায় উঠতে হল।

স্নান শেষ করে এসে দেখি দ্বার রুদ্ধ। ধাক্কা দিতেই লতাহু বলল, একটু দাঁড়াও।

দাঁড়াতে বাধ্য হলাম। অবশ্য বেশিক্ষণ নয়। দরজা খুলে কে দাঁড়াল। তাকে লতাহু বলে চেনাই দুষ্কর। ফ্রকপরা লতাহুকে দেখেছি, বৈষ্ণবী লতাহুকে দেখেছি, পথের সাথী মেকি গৃহিণী লতাহুকে দেখেছি, এ সে লতাহু নয়। সদ্য বিবাহিতা কোন লাস্যময়ী যুবতী যেন দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে সামনে। অলঙ্কারের পারিপাট্য যেমন, তেমনি ড্রেস দিয়ে শাড়ি পড়ার ভঙ্গী, তেমনি সুন্দর করে খোঁপা বাঁধা। কপালে আর সিঁথিতে সিন্দুর টকটক করছে।

থমকে দাঁড়ালাম।

ধীরে ভেতরে এসে দাঁড়াতেই লতাহু ছিটকিনি তুলে দিয়ে বলল, কি দেখছ?

শুধু দেখছি না, ভাবছিও। তুমি কি সেই লতাহু।

সেই। বোধহয় তিন বছর পর লতাহু নিজেকে ফিরে পেয়েছে। উনিশ বছর বয়সে বাপমায়ের কোলে যে লতাহু হেসে খেলে বেড়াত, বাইশ বছর বয়সে সেই লতাহু নিজেকে খুঁজে পেয়েছে।

হঠাৎ বললাম, তুমি এত সুন্দর!

লতাহু রাঙা হয়ে উঠল না।

বেসরমে খিল খিল করে হেসে উঠল। প্রসাধন সুন্দর করে। নইলে আমিও যা ওবাড়ির পাঁচিঝিও তাই। সুন্দর হবার অনেক দুঃখ। এত দুঃখ শুধু সুন্দর হয়েছিলাম বলে। যদি রূপ না থাকতো তা হলে রূপার মূল্যে নিজেকে বাঁচাতে পারতাম। রূপ ছিল বলেই রূপ ও রূপা দুটোই হারাতে হয়েছে। বলতে বলতে তার গলা ধরে গেল। নির্মল নীল আকাশে যেন একখণ্ড কালো মেঘ ভেসে এল। আমি মুখ নীচু করে শুকনো কাপড়খানা টেনে নিলাম।

লতাহু খাটে বসল।

কাপড় জামা বদলে আমি বসলাম মেঝের বিছানাতে।

লতাহু বলল, বসলে যে বড়। ঘরে বসে থাকবার জন্য এ সাজ নয়। বেড়াতে যাব বলেই সেজেছি।

লোককে দেখাবে।

তাই।

তাতে লাভ ?

লাভ! লাভ নয়। প্রথম বয়সে মেয়েরা পরিপাটি করে সাজে লোকের চোখ ধাঁধাতে। আর শেষ বয়সে সাজে বয়সকে গোপন করতে। আমার বয়সের মেয়েদের সবাই দেখবে, আপশোষ করবে, আপশোষ নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে যাবে। এইতো আনন্দ, সেই আনন্দ উপভোগ করতে চল একটু বেড়িয়ে আসি।

নতুন জায়গা তায় সন্ধ্যাবেলা।

ভয় কি। রিক্সায় যাব। ঘণ্টা চুক্তি করে নাও। যে লতাহু সামাদের হাত থেকে বেঁচে এসেছে, সে লতাহু সাজসজ্জার তলায় মরেনি, বুঝলে।

লতাহুর আগ্রহে বের হতে হল। রিক্সায় পাশাপাশি বসে কেমন যেন অসোয়াস্তি অনুভব করছিলাম। অনভ্যাসের ত্রুটি লতাহুর দৃষ্টি এড়ায় নি।

ফিস ফিস করে বলল, তুমি যে ঘেমে উঠলে।

অভ্যাস নেই কিনা।

আমারও কি ছাই অভ্যাস আছে। অভ্যাস একদিনে হয় না বহুদিনে হয়। প্রথম প্রথম যে নিজের মনে অসোয়াস্তি তাকে দমন না করলে পরের মনেও অসোয়াস্তি দেখা দিতে পারে।

উত্তর দিলাম না।

রিক্সা ছুটছে।

লতাহু আবার কথার সূত্রপাত করল, বলল, জলপাইগুড়ির সাথে বাংলার ছেলে মেয়েদের বাল্যেই পরিচয় হয়।

বল্লাম কেন ? বাংলার আপামর জনসাধারণ চা খায় বলে।

সেও একটা কারণ। তার চেয়ে বড কারণ বঙ্কিমবাবুর বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল। এই জঙ্গল যে এই জেলায়। দেবীচৌধুরাণীর সাথে বৈকুণ্ঠপুরের নাম জড়িয়ে আছে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময় বৈকুণ্ঠপুরেই ইংরেজদের কাবু করেছিল সন্ন্যাসীরা। আজও সেই ত্রিস্রোতা বা তিস্তা নদী বৈকুণ্ঠপুরের কোল কেটে বেয়ে চলেছে! সন্ন্যাসীদের সাথে ছিল কৃষককুল। সেই কৃষকরাও এক সময় আশ্রয় নিয়েছিল এই জঙ্গলে। ইংরেজ দেওয়ানী পেয়েই

দেবীসিংহকে দিয়েছিল এই এলাকার ইজারা। দেবীসিংহের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল কৃষকরা। তারা এসে হাত মিলিয়েছিল সন্ন্যাসীদের সাথে।

সে বৈকুণ্ঠপুর আর নেই।

নেই, কেননা আজ বৈকুণ্ঠপুরের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। বৈকুণ্ঠপুরের অরণ্যে গড়ে উঠেছে চাযের আবাদ। চা-পায়ীরা কিন্তু বৈকুণ্ঠপুর কথা স্মরণ করেনা। তারা জানেও না, বৈকুণ্ঠপুরের সন্ন্যাসীদের কথা যেমন উত্তেজনা সৃষ্টি করে মনে, তেমনি বৈকুণ্ঠপুরের চা উত্তেজনা সৃষ্টি কবে চা-পাযীদের দেহে। বাংলাব মানুষ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ করেছিল এই বৈকুণ্ঠপুরে, সে কথা ঐতিহাসকাররাও লিখতে ভুলে যান মাঝে মাঝেই। অথচ বৈকুণ্ঠপুর ছিল এক সময় স্বাধীনতাকামীদের পীঠস্থান।

শহরের মাঝে কবলা নদী। কাঠের সেতু দুই তীরের বাসিন্দাদের এক করে রেখেছে। সেতু পেরিয়ে এলাম। এগোতে থাকি।

ত্রিস্রোতা নদীর কিনারায় এসে দাঁড়াল রিক্সা।

ত্রিস্রোতা শীর্ণকায়া, অনেক দুব। সামনে ঝাউযের বন। রিক্সা থেকে নেমে নদীব বালুচরে বসলাম দুজনে। দমকা হাওয়া ছুটছে, বাতাসের মিষ্টতা যেন অপূর্ব রোমাঞ্চ সৃষ্টি করতে থাকে মনে। কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না। লতাহুর ডাকে সম্বিত ফিরে পেলাম। বলল, চলো ফিরে যাই। রিক্সাওলা তাগাদা করছে।

কোন কথা না বলে রিক্সায় এসে বসলাম। লতাহু অকুন্ঠিত ভাবে এসে বসল পাশে।

ফিরে এলাম হোটেলে।

লতাহু বেশভূষা পাল্টে এসে বসল মেঝেতে। কারুর মুখে কোন কথা নেই।

আজ লতাহুকে খুব বেশি চিন্তিত মনে হল। লতাহুকে সব সময় দেখেছি আনন্দ উজ্জ্বল, কলকন্ঠি, অথচ আজ কেমন যেন ভাবান্তর দেখলাম। আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না।

রাতের খাওয়া শেষ হতেই লতাহু মেঝেতে শুয়ে পড়ল। আমিও আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম।

অনেক দিন পর আজ চোখ থেকে ঘুম কোথায় যেন পালিয়ে গেছে। ক্লান্তিতে চোখ ভেঙ্গে আসছে অথচ মন সুপ্তি চায় না।

দূরে কোথাও পেটা ঘড়িতে বারোটা বাজল।

একটা।

দুটো।

এ পাশ, ওপাশ করছি। লতাহ্ উঠে বসল, আলো জ্বাললো। আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার আলো নিভিয়ে শুয়ে পডল।

তিনটে।

লতাহ্ ডাকল, তুমিও কি ঘুমোও নি?

বললাম, না। তুমিও তো?

হাঁ।

আবার চুপচাপ।

লতাহ্ উঠে এসে খাটের পায়ের দিকে বসল। মৃদু স্পর্শ অনুভব করলাম।

একটা কথা বলব?

উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, কি?

না থাক।

তোমার কথা আমি বলতে পারি। বলব?

লতাহ্ হাসল, গম্ভীরভাবে বললো, বলো।

মেকিকে আসল করবার স্পৃহা জেগেছে।

যদি তাই হয়।

উত্তর দিতে পারলাম না।

উত্তর দাও।

ধীরে ধীরে বললাম, নদী যে উত্তাল তরঙ্গময়ী, এ নদীতে নৌকা কিনারায় কোনদিন ভিড়বে কি?

অসুবিধা কোথায়?

তোমাকে নিয়ে। লতাহ্ বিশ্বের। একদিন কোনো সুপ্রভাতে দেখব আমার লতাহ্ বিশ্বের মাঝে লীন হয়ে গেছে। সেদিনটা কল্পনাতেও সহ্য করতে রাজি নই। তার চেয়ে যেমন আছে তেমনি থাকুক। স্থিতাবস্থা চুক্তি মেনে চললেই কি ভাল হয় না।

লতাহু বাধা দিয়ে বলল, পুরুষদের হয়, মেয়েদের হয় না।

আমি এ কথা স্বীকার করি না, আমার বিশ্বাস, আসল ঘটনা ঠিক উল্টো।

তা হলে পেছপা হচ্ছে কেন?

কেন না তুমিই বলেছিলে তুমি বিশ্বের।

না। আমি বিশ্বের নই, আমি শুধু আমার নিজস্ব সম্পদ।

একথা তো কখনও বলনি।

যেন দেহের সমস্ত পেশীর ওপর কঠিন চাপ দিয়ে লতাহু বলল, লতাহু বিশ্বের নয়, লতাহু তার নিজস্ব সম্পদ, যাকে ইচ্ছে তাকে সে নিজস্ব সম্পদ দান করতে পারে এবং সে অধিকার তার নিজস্ব।

লতাহু মাথার কাছে এসে বসল।

তা হলে ভেকের আর প্রয়োজন নেই।

প্রয়োজন এখনও শেষ হয়নি।

আবছা অন্ধকারে তার মুখ দেখতে পেলাম না। মনে হল লতাহু উত্তেজিত ভাবে কি যেন বলতে চায়। তার হাতখানা হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম, তুমি যা চাও তাই হবে।

আবার দিনের আলো দেখা দিল।

লতাহু আজ যেন নতুন মানুষ। আমার দেহশ্রী কিসে বৃদ্ধি পায় সেদিকে তার নজর গিয়ে পড়ল।

জিজ্ঞাসা করলাম, এ আবার কি?

মানুষ মনের ঠাকুরকে সাজায়, পূজারী দেবতাকে সাজায়, বিলাসী স্বপ্নকে বাস্তব করতে চায়। সর্বত্রই সৌন্দর্য সৃষ্টির গোপন প্রয়াস। মানুষ সুন্দরকে ভালবাসে, তুমি কেন সেই সৌন্দর্যের অধিকারী হবে না।

মন্দ নয়। যা বলবে তাই হবে। কিন্তু সে সৌন্দর্য সইবে কি।

লতাহু জবাব দিল না, অথচ লতাহু যা বলে তাই মানতে হয়।

বিশ্রামের শেষ হল। হোটেল জীবনের প্রথম পর্যায় শেষ হল।

লতাহু বলল, বর্ষা এসে যাবে শিগ্‌গীর। এই সময় নদী পার হয়ে ওপারে যেতে চাই। তার ব্যবস্থা কর।

অতএব প্রস্তুত হতে হল।

ভ্রমণের নেশায় দুজনেই পাগল হয়ে উঠেছি। পথের শেষ দেখবার আকুল আগ্রহে এগিয়ে চলেছি। তিস্তার কিনারায় দাঁড়িয়ে দেখে নিলাম শুভ্রবসনা কাঞ্চনজঙ্ঘা। নদী পেরিয়ে এলাম বার্ণেসে। জিনিষপত্র জমা রাখলাম ষ্টেশনে। সংগ্রহ করলাম গোযান। বললাম, চলো জল্পেশ।

ময়নাগুড়ির পাকা রাস্তা তৈরী তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ছোট্ট বাজার, ছোট্ট সুন্দর তিস্তার সোতার গায়ে শ্রীমণ্ডিত গ্রাম। ময়নাগুড়ি পেরিয়ে গাড়ি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল জল্পেশের দিকে।

মধ্যাহ্ন সূর্য তখন মাথার ওপর।

এসে পৌঁছালাম জল্পেশ মন্দিরে।

দেউড়ির সামনে দুটো বিরাটকায় প্রস্তর নির্মিত হাতি। প্রাণহীন প্রাণী পাহারা দিচ্ছে প্রাণচঞ্চল মানুষদের। সেখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে এগিয়ে চললাম মন্দিরের দিকে। শীর্ণকায় একটি ব্যক্তি এসে বলল, বাবার পূজা দেবেন?

না, দেখতে এসেছি মন্দির।

চলুন দেখিয়ে আনছি।

লতান্ বলল, দেখালে আপত্তি নেই কিন্তু দক্ষিণাটা ঠিক করে নিন।

যা দেবেন তাই।

তবুও।

কেউ দেয় চার আনা, কেউ দেয় আট আনা, কেউ দেয় টাকা। আপনারাও ইচ্ছে মতো দেবেন।

বেশ চলুন।

মন্দির কি মসজিদ ঠিক বোঝা গেল না। যাই হোক হিন্দু ও মুসলমান রীতির সমন্বয় ঘটেছে এই মন্দির নির্মাণের ভাস্কর্যে। পুরাতন মন্দিরের মসজিদ ধরণের গম্বুজগুলো ঢাকা পড়েছে নতুন মন্দিরের গঠনে। নতুনের চেয়ে পুরাতনকেই পছন্দ হল বেশি। কথাটা মনে করিয়ে দিল লতান্।

শীর্ণকায় ব্যক্তিটি মন্দিরের রূপ ব্যাখান অথবা শিবলিঙ্গের প্রাচীনত্ব ও সৌন্দর্য বর্ণনার চেয়ে বেশি উৎসুক মন্দিরের ইতিহাস বলতে।

সে বলল, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ছিলেন জল্পেশ। এক রাতে রাজা

স্বপ্ন দেখলেন। স্বয়ং মহাদেব তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন, আমার বড় কষ্ট।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন প্রভু!

মাটির তলায় শুয়ে আছি লক্ষ বছর ধরে। শ্বাসরোধ হবার উপক্রম। আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যথাযথ স্থানে বসাও।

রাজা বিনীতভাবে বললেন, মানুষের সাধ্য কি দেবতাকে উঠিয়ে বসায়।

মাটির পৃথিবীতে দেবতার মহিমা থাকবে চিরকাল। দেবতা থাকবে প্রস্তর, কাষ্ঠ, মৃত্তিকার মূর্তি নিয়ে, তাকে উঠিয়ে বসাবার দায়িত্ব রইবে মানুষের।

কিন্তু কোথায় পাব সেই মূর্তি।

পশ্চিমে চলতে থাক। তিনরাত তিনদিন পায়ে হেঁটে চলবার পর তিস্রোতার তীরে যেখানে প্রথম ধ্রুব তারা দেখবে সেখানে মাটি খুঁড়লেই আমাকে পাবে।

মহাদেব ধীরে ধীরে ছায়ার মতো লুকিয়ে গেল।

রাজার ঘুম গেল ভেঙ্গে। তাকিয়ে দেখলেন মাথার দিকে। দেবতা তখন অনেক দূরে।

সকাল বেলায় মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। বললেন রাতের স্বপ্নের কথা। চারিদিকে সাজ সাজ রব উঠল। রাজা পদভ্রমণে বের হবেন তার প্রস্তুতি আরম্ভ হল।

পরের দিন সকালে রাজা পদব্রজে রওনা হলেন পশ্চিম দিকে। সঙ্গে চলল অনুচরের দল। তিন দিন তিনরাত্রি বিশ্রাম না নিয়ে এখানে এসে যখন দাঁড়ালেন তখন আকাশে ধ্রুবতারা উঠল। রাজার আজ্ঞায় সহচর খনকরা মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে এল জাগ্রত মহাদেবের এই প্রস্তর মূর্তি।

রাজা নিজের নামে নামকরণ করলেন শিবের। তৈরী করে দিলেন মন্দির। সে মন্দির আর নেই। এহল দু হাজার বছর আগের কথা। এর মধ্যে কত পরিবর্তন হয়েছে। দ্বিতীয় মন্দিরটি তৈরী করিয়েছিলেন কোচ-বিহার অধিপতি রাজা প্রাণনারায়ণ। সে মন্দিরের অবস্থা জীর্ণ হয়ে আসতেই নতুন মন্দির গড়েছে দেশের লোক।

কথা বলতে বলতে এলাম বাসুদেবের মন্দিরে। প্রদর্শক বাসুদেবের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ভগবান বাসুদেবকে পাওয়া গিয়েছিল ঐ সুন্দর জলাশয়ে।

কোচবিহার অধিপতি স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই জলাশয় খনন করিয়েছিলেন। খনন কালে পাওয়া গিয়েছিল বাসুদেবকে। বাসুদেবও জাগ্রত দেবতা। প্রত্যেক বৎসর বিরাট মেলা বসে জল্পেশে। শিবরাত্রির মেলায় বহুযাত্রী যেমন আসে তেমনি আসে পণ্যসম্ভাব। হাতি-ঘোড়া থেকে আরম্ভ করে ভুটিয়া কুকুর পর্যন্ত বিক্রী হয় এখানে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, সর্বপাপ বিমোচন সম্ভব একমাত্র এই জলাশয়ে স্নান করলে। তাই হাজার হাজার লোক আসে এই জলাশয়ে স্নান করতে।

শীর্ণকায় ব্যক্তিটির হাতে একটি মুদ্রা দিয়ে বললাম, কিছু খাবার পাওয়া যাবে এখানে?

একটু অপেক্ষা করুন। দেখি, প্রসাদ পাওয়া যায় কিনা। বলেই সে চলে গেল মন্দিরে। আমরা বসে রইলাম বাসুদেব মন্দিরের সিঁড়িতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে বলল, আসুন। পুরুতকে কিছু দক্ষিণা দিতে হবে।

মনে মনে বললাম, তথাস্তু।

প্রসাদ গ্রহণ করে পূজারীর হাতে একটি মুদ্রা দিয়ে এসে উঠলাম গাড়িতে। গাড়োয়ানও ভোজনপর্ব শেষ করে নিয়ে ছিল। সন্ধ্যার আগে বার্নেস পৌঁছাবার তাগাদায় গাড়ি ছেড়ে দিতে বললাম।

গাড়িতে উঠেই বিচালির ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

লতাহ্ চুপ করে বসে ছিল।

সন্ধ্যার আগেই ঘুম ভাঙ্গল। উঠে বসলাম। তখনও গাড়ি চলছেই।

আমাকে বসতে দেখে লতাহ্ হাসল। ঘুম সম্বন্ধে মন্তব্যটুকু রইল বাকি। প্রত্যাশা করছিলাম কিছু মন্তব্য করবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন লাগল?

কি? মন্দির। না পূজারী?

ওসব নয়। কদিন আগে হাত পেতে যে বোষ্টম বোষ্টমি দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করেছে তারা যখন অপরকে দক্ষিণা দিল, তখন কেমন লাগল?

লতাহ্ খিল খিল করে হেসে উঠল। এতো হাসির খোরাক কে জোটায় জানি না, হাসির শব্দে গাড়োয়ান ফিরে তাকাল।

লতাহ্ বলল, একটা গান শুনেছ বোধ হয়, 'আজকে যে গো রাজাধিরাজ কাল সে ভিক্ষা চায়।'

'চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়।' এই তো?

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল।

বার্নেস ষ্টেশনের অনেকটা দূরে থাকতেই শেষ ট্রেন চলে যাবার আওয়াজ পেলাম। যখন ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম, তখন ষ্টেশনে জীবিত প্রাণীর মধ্যে একটি মাত্র পোর্টার বাতি হাতে নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল। ষ্টেশনের অপরাপর কর্মচারীরা বাড়ি ফিরে গেছে। মাঝ রাস্তার ময়নাগুড়ি রোডেও থামতে পারতাম কিন্তু জিনিষপত্র বার্নেসে রেখে আসায় সেখানেই ফিরতে হল।

আমাদের কোনই অসুবিধা হোত না যদি বিছানাপত্র আমাদের সঙ্গে থাকত।

আমাদের দেখে পোর্টার নিজেই বলল, আজকের শেষগাড়ি চলে গেছে।

বললাম, তা না হয় গেল। রাতে থাকবার মতো একটু জায়গা পাওয়া যাবে কি বাপু।

মুশাফিরখানায় থাকতে হবে বাবু?

তাও ভাল, কিন্তু বিছানাপত্র সব তোমাদের আপিসে, সেগুলো কি করে পাব বল দেখি। তুমি দিতে পারবে?

না বাবু। ওসব রসিদি মাল। বড়বাবু না হলে দিতে পারব না।

বড়বাবুকে একটু খবর দিতে পার?

সে আসবে না। রাতের বেলায় কেউ-ই বাইরে আসতে চায় না।

বেশ আমাকেই নিয়ে চলো।

পোর্টার অনিচ্ছার সাথে চলল আমাদের সাথে। হাঁক ডাক করতেই ষ্টেশনে মাষ্টার বেরিয়ে এল। অল্প বয়সের উদারতা কিছু ছিল বলে কিছু ভরসা পেলাম। আমাদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক মনে করেই সাহায্য পাবার আশাটা যেন বৃদ্ধি পেল।

বলল, মুশাফিরখানা বিনা থাকবার মতো জায়গা দেখছি না। তবে যাও দেখি লগনা, গার্ডবাবুর বাড়িটা যদি খালি থাকে ওখানে থাকবার ব্যবস্থা করে এস।

লগনা চলে যেতেই স্টেশন মাষ্টার বলল, শীতটা কমেছে, মুশাফিরখানায়

থাকার অসুবিধা নেই কিন্তু কদিন থেকে বাঘের বড়ই উৎপাত হয়েছে। তাই ভাবছি, কোথায় আপনারা থাকতে পারেন।

লগনা এসে জানালো গার্ডবাবুর বাড়ি বন্ধ।

মুশাফিরখানা ভিন্ন উপায় রইল না।

স্টেশনে এসে বিছানাপত্র বের করে দিয়ে স্টেশন মাষ্টার স্বস্থানে ফিরে গেল। টিনের ছাউনি, তিন দিক খোলা, তার তলায় বিছানা পেতে নিয়ে বসলাম। লতাহু বলল, ভালোই হল, আজ বনের বাঘ দেখতে পাব।

আশা কম। কপালে থাকলে হয়ত বাঘ না হোক বেড়াল দেখতে পাবে।

বনের বেড়াল দেখাও জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা।

বললাম, রাজপুত্র আর কোটালপুত্রের গল্প জান নিশ্চয়ই। একজন পাহারা দেয় অপরজন ঘুমোয়।

লতাহু সস্মিত ভাবে বলল, তাহলে ঠিক কর কে পাহারা দেবে, কে ঘুমোবে।

প্রথম রাতে পাহারা দেবে তুমি, শেষ রাতে পাহারা দেব আমি।

তার চেয়ে দুজনে বসে গল্প করতে করতে রাত কাটিয়ে দেই, তাই হবে ভালো।

বললাম, লাভ কি?

লতাহু অভিমানের সুরে বলল, লাভ সব সময় হয় না, মানুষ লোকসান দিয়েও বাণিজ্য করে ভবিষ্যৎ লাভের আশায়। তোমার মতো বাস্তব বুদ্ধি নিয়ে সব সময় হিসাব করে চলা সম্ভব কি?

অন্ধকার রাত্রি।

জনমানবশূন্য স্টেশন।

সামনের বাড়িগুলো থেকে দু একবার আলোর রেখা দেখা গেছে প্রথম রাতে। তারপর সব অন্ধকার, সব নিস্তব্ধ।

নিস্তব্ধতা যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তা অনুভব করলাম তিস্তার চরে বসে। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে লতাহু বলল, একটা গল্প বল।

কিসের গল্প?

তোমার নিজের গল্প।

আমার কোন গল্প থাকতে পারে কি?

কেন পারবে না। তোমার ছোটবেলা. তোমার বাবা-মা, তোমার গ্রাম, আরও কত কি রয়েছে, সেই সব গল্প বল।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। লতাহ্নর মুখখানা দেখতে পাচ্ছিলাম না, তবুও মনে হল সে যেন উৎকর্ণ হয়ে বসে আছে আমার কথা শুনতে। লতাহ্ন যেমন জেদী আমার বিশ্বাস, আমার গল্প না শুনে ছাডবে না। কিছু না কিছু বলতেই হবে। মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছিলাম নিজের গল্প। কোথা থেকে আরম্ভ করব আর কোথায় শেষ করব তাই ভাবছিলাম। আমার নীরবতাকে সহ্য করতে পারলনা লতাহ্ন। বলল, চুপ করে বসে আছ কেন? বল।

বলব. ভেবে নিচ্ছি।

কি ভাবছ?

ভাবছি কোথা থেকে আরম্ভ করব আর কোথায় শেষ করব। গুছিয়ে উঠতে পারছি না।

না গুছিয়েই বল। খুচরো খুচরো কাহিনীর কুসুম রাজি দিয়ে বিনা সুতায় মালা গেঁথে আমার গলায় পরিয়ে দাও।

তা মন্দ নয়। গল্পের প্রারম্ভে জিজ্ঞাসা করছি, আমার পরিচয় না জেনে কি সাহসে আমার সাথে এলে।

মানুষ জাতটাকে কিছু কিছু চিনতে শিখেছি, অন্তত পুরুষদের। তাই পরিচয় জানবার বিশেষ দরকার হয় নি। তোমার দেওয়া মৌখিক পরিচয় আর আসল মানুষের মাঝে যদি ব্যবধান দেখতে পেতাম, তাহলে তোমার ওপর শ্রদ্ধা থাকত না, তার চেয়ে যেটা ফার্স্ট হ্যাণ্ড নলেজ তাকেই মূল্যবান মনে করেছি।

তা ভালোই। অভিযোগ থাকবে না। কিন্তু এতটা পথ এসে, পেলে কি? তাতো হিসাব করা হয় নি।

পেয়েছি কান্না আর ধ্বংস।

আমার কিন্তু উল্টোটা ঘটেছে। ধ্বংসের হাহাকারের প্রতিধ্বনি হল কান্না, সেই কান্না শুনেছি, কেননা অপরের ক্রন্দনকে আমি ভালবাসি, নিজে কাঁদতে জানি না, কাঁদতে শিখিনি, তাই অপরের কান্না আমাকে আনন্দ

দেয়। কান্না আর ধ্বংসের মাঝে পেয়েছি অজ্ঞাত আনন্দ। কান্না আর ধ্বংসের মাঝেই গঠনের স্বপ্ন দেখেছি।

কান্নাকে গোপন করবার এ আনন্দের তলায় আনন্দের উৎস নেই। কৃত্রিম এই আনন্দ।

হেসে বললাম, বেড়ালের কান টিপেছ কখনও। আমি টিপেছি। যন্ত্রণায় বেড়াল চিৎকার করে, আমি তাতেই আনন্দ পাই, আমি নয়, আমার মতো হাজার হাজার মানুষ এই আনন্দ পেতে চায়। মনে করতাম আমার যন্ত্রণায় সবাই দুঃখ পায়, শেষে দেখলাম এ যন্ত্রণাকে সবাই স্বীকার করে নিয়েছে সেজন্যই যন্ত্রণাকে আনন্দের চুম্বক মনে করে সবাই। হিসাবে ভুল হল, হঠাৎ একদিন মনে হল আমার জন্য কাঁদবার লোক চাই। পেলাম। পাওয়া বলতে পারি না, পিতাঠাকুর সংগ্রহ করে দিলেন। পেলাম সঙ্গিনী। সঙ্গিনী পেলেন সংসার। সংসার পেয়েই সংসারের সার পতিদেবতাকে মনে করলেন নিমিত্ত।

লতাহু বাধা দিয়ে বলল, এ হল সত্যের অপলাপ।

মোটেই নয়। সঙ্গিনী জননী হলেন। এইটেই ছিল তার জন্মগত কামনা, তারই নয়, মেয়ে মাত্রেরই সে কামনা। তাই সন্তান সম্বন্ধে আমাকেও কখন বিশ্বাস করতে পারেননি তিনি। বুঝলাম, কাঁদবার লোক যিনি তিনি ক্রন্দন করতে রাজি আছেন তবে আমার জন্য নয়। ক্রমশই বিরাগ জন্মাতে লাগল। বাড়ি ফিরতাম দেরী করে। সঙ্গিনী তখন গৃহিণী ও জননী, অতএব অধিকার তার সর্বাধিক। দশন দেখাতে লাগলেন। দংশন করেন নি। তবে সে চেষ্টাও কম ছিল না। পিতার দান বলেই মাথা পেতে নিয়েছিলাম, নইলে কি হত কে জানে।

বাধা দিয়ে লতাহু জিজ্ঞাসা করল, অর্থাৎ?

অর্থাৎ নেই। সহজ সরল কথা। অনেকদিন ভেবেছি শেফালি আমাকে ভালবাসে কি না? উত্তর খুঁজে হয়ত পেতাম কিন্তু আমার চরিত্র সম্বন্ধে তার বিরূপ মনোভাব তাকে জানবার অবসর দেয় নি। কেমন যেন যান্ত্রিক জীবন যাপন করতে বাধ্য হতাম। পুরুষ একা চরিত্রহীন হয় না, নারী হয় সঙ্গী। এই তথাকথিত চরিত্রহীনতা সমাজ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম নয়। সে কথা তাকে বুঝিয়ে বলতে পারিনি। আমার কলেজী বিদ্যা শেফালির কাছে

ছিল অবিদ্যার নামান্তর। তাই ধ্বংসের বীজ আপনা থেকেই রোপিত হল, গঠনের স্বপ্ন দেখলাম তাতে।

লতাহু আবার বাধা দিয়ে বলল, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন প্রমাণ নেই যা দিয়ে বলা যায় স্ত্রী কখনও তার স্বামীকে বুদ্ধিমান মনে করেছে। হাইকোর্টের জজের স্ত্রীও স্বামীকে মূর্খই মনে করে। বুদ্ধিমান স্বামী স্ত্রীর কাছে বোকার অভিনয় করে, যারা বিদ্যাবুদ্ধি জাহির করতে চায় তারা পুরস্কার পায় স্ত্রীর বাক্যবাণ নামীয় তিরস্কার। অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে পারিবারিক জীবন।

হয়ত তাই, কিন্তু শেফালি তার চেয়েও বেশি। তবু আশা ছাড়িনি কোনদিন। প্রতি দিনই আশা করেছি, শেফালি আমাকে বুঝতে চেষ্টা করবে, কিন্তু নিরাশ হলাম বাচ্চার মৃত্যুতে। শেফালি কাঁদতে পারেনি। সেদিন সে যদি গলা ছেড়ে কাঁদতে পারত তাহলে দুজনেই বেঁচে যেতাম। কিন্তু সে ভাবসাম্য রক্ষা করতে পারেনি বলেই ছুটে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তার সারা জীবনের অভিযোগই তাকে উন্মাদ করেছে, হৃদয় নামক বস্তুটি অপ্রসারিত চিন্তার সাথে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। অথচ শেফালির জন্যই আইনের পড়া ছেড়ে ঘরে ফিরে এসেছিলাম। ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্খাকে সেদিন বলী দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। শেফালিকে সত্যসত্যই ভালবেসেছি কিনা তা হলফ করে বলতে পারিনা, হৃদয়ের কোন নিভৃত অংশে তার জন্য দুর্বলতা যে পুঞ্জীভূত ছিল তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাই তাকে খুঁজেছি, হৃদয় দিয়ে হারাবার ব্যথা অনুভব করতে চেয়েছি। আজ সম্মুখে পথে পথে ঘুরবার যে পরিণতি তাকে রোধ করতে পারতাম। আজ আমি সত্যই নিঃস্ব। অথচ নিঃস্বতা আমাকে নিরানন্দ করতে পারেনি।

লতাহু বাধা দিয়ে বলল, নিঃস্বতা মানসিক অবস্থা মাত্র। সমগ্র পৃথিবীর দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে সেখানে, আশ্রয়-সম্পদ গড়বার বাধা কোথায়? তোমার মতো আমিও যে নিঃস্ব, আমার এ নিঃস্বতা মনের নয়, পরিবেশের। কিন্তু সে চিন্তা আমাকে কখনও অবশ করতে পারেনি। আমার অহমিকা নিঃস্বতাকে ব্যঙ্গ করতে সদা উদ্গ্রীব।

লতাহু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ক্ষুন্নভাবে বললাম, নতুন জীবনের সন্ধানে বের হয়েছি, যদি কোন দিন নতুন জীবনের সন্ধান পাই সে দিন বুঝব, নিঃস্বতা মিথ্যা। কান্না আর ধ্বংসকে সম্বল করে চলতে হচ্ছে বলেই তার পশ্চাতে যা অনাগত তাকে মনে করছি সব আনন্দের উৎস! আমার হয়ত ভুল হয়েছে। ত্রুটি স্বীকার করে নেব।

যাক ওসব কথা। তারপর?

তারপর কিছু নেই। আগেই যা কিছু ছিল পরে আর কিছু নেই। বিগত দিনের এসব স্মৃতি এত ঝাপসা যে সব কিছু খুঁজে পেতে হলে বহু সময়ের প্রয়োজন। বাবা বলতেন, যারা সৃষ্টির অনুতম দ্রব্যকেও ভালবাসে তারা মানুষকেও ভালবাসে। যারা তা পারেনা তাদের কেন্দ্র স্বয়ং। শেফালির কেন্দ্রও ছিল স্বয়ং, অন্তত আমি তা মনে করতাম। সে কাউকে ভালবাসতে পারেনি। মানুষ দুঃখ পেয়ে, আঘাত পেয়ে উন্মাদ হয়, আত্মহত্যা করে। কিন্তু সেই দুঃখ বা আঘাতের পশ্চাতে থাকে নিষ্ঠুর স্বার্থসর্বস্ব বেপরোয়া চিন্তাধারা। যারা ভালবাসে অপরকে, তারা অপরের সর্বনাশ ডেকে আনে না, নিজেরও নয়। শেফালি ছিল নিষ্ঠুর স্বার্থসর্বস্ব হৃদয়ধর্মহীন বেপরোয়া চিন্তার বাহক। তাই ভালবাসা তার কোষ্ঠিতে লেখা ছিল না। নিজের সর্বনাশ নিজেই সে ডেকে এনেছে। সর্বনাশের নর্দমায় অপরকে টেনে নামিয়েছে।

লতাহ্ ক্ষুন্নভাবে বলল, তোমার এ অভিযোগ অমূলক। পুরুষের মন দিয়ে মেয়েদের বিচার করার সব চেয়ে বড় বিপদ হল, অবিচার করা। পুরুষ কখনও নারী নয়, তেমনি পুরুষের চিন্তাধারাও কখনও নারীকে বিচার করতে পারে না। তুমি যে দৃষ্টিতে শেফালিকে দেখেছ, হয়ত শেফালি তা নয়।

প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, তোমার যুক্তি স্বীকার করেও একথা সন্দেহাতীত ভাবে বলতে পারি, বিচার সূক্ষ্ম না হলেও, মূলত বিচার একপক্ষীয় কখনও হয় না। একজন অপরজনকে জানাবার যেটুকু অবসর পায়, সেটুকুই চলবার পথে যথেষ্ট। তবে ভ্রান্তির সুযোগ যে না থাকে এমন নয়। কিন্তু মোটামুটি একজন অপরজনকে জানতে ভুল করে না এই আমার বিশ্বাস। শেফালিকে বিচার করার মূল প্রশ্ন ছিল হৃদয়ের প্রশ্ন। হৃদয়ের পরশ আমি পাইনি, পেয়েছিলাম একটা মনুষ্যদেহ। পরিতৃপ্তি কখনও

আসেনি। হয়ত ভুল হয়েছে আমারই কিন্তু সকল দিক সামলে চলা সম্ভব কি। তা হয়ত পারিনি।

লতায়ু প্রতিবাদ করল না। গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করতে লাগল। থেমে গেলাম।

একদল শেযাল ডেকে উঠল।

বহুদূর থেকে ফেউ-ফেউ আওয়াজ ভেসে এল।

লতায়ুকে সতর্ক করে বললাম, বাঘের আগমন আশঙ্কা রয়েছে। ফেউ ডাকছে ?

লতায়ু উৎকর্ণ হয়ে বসল। রেলিং-এর ফুটো দিয়ে দূরের বস্তু দেখবার চেষ্টা করতে লাগল।

বললাম, আশঙ্কা থাকলেও আসবে না।

কেন ?

বাঘের চেয়ে সতর্ক প্রাণী আর নেই। আমরা জেগে আছি এটা বাঘ জানতে পারবেই। সে কিছুতেই আমাদের দু একশ গজের মধ্যে আসবে না। তুমি নিশ্চিত মনে থাকতে পার।

তা হলে ঘুমিয়ে পড়।

বুদ্ধিটা মন্দ নয়। যতক্ষণ বাঘ ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে না পড়ছে ততক্ষণ ঘুম ভাঙ্গবার আশা কম। তখন ঘুম ভাঙ্গলেও জেগে থাকবার পথ থাকবে না। আর প্রভু যদি না আসে সকালেই ঘুম ভাঙ্গবে আপনা থেকে।

লতায়ু কোন জবাব না দিয়ে ভাল করে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসল।

তিস্তার বুক বেয়ে শেষ রাতের হিমেল বাতাস বয়ে চলেছে হু-হু করে। আবহাওয়াবিদ্‌রা শীতের অবসান ঘোষণা করেছে কাগজে কলমে কিন্তু তিস্তার চরে এখনও শীতের অবসান ঘটেনি। কম্বল মুড়ি দিয়ে বসতে হল।

রাত কটা হবে।

আন্দাজেই বললাম, দুটো বোধ হয় বেজে গেছে।

অনুরোধের সুরে লতায়ু বলল, তুমি শুয়ে পড়।

আর তুমি।

পাহারা দেব।

হেসে বললাম, সাহস তো কম নয। তার চেয়ে তুমি গড়িয়ে নাও আমি বসে থাকি।

লতাহু এই প্রস্তাবের জন্যই অপেক্ষা করছিল। ক্লান্তিতে তার চোখ জড়িয়ে আসছিল। আমার প্রস্তাব শুনেই বলল, বেশ।

লতাহু কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

বসেই ছিলাম। রেলিং এ হেলান দিয়ে থাকতে থাকতে ঝিমুনি এসে গেছে। হঠাৎ লতাহুর চিৎকারে ঝিমুনি ছুটে গেল।

লতাহুর কণ্ঠে ভীতির কোন লক্ষণ নেই। উৎসাহের প্রাবল্যে সে চিৎকার করে উঠেছে। কখন যে সে উঠে বসেছে টেরও পাই নি।

বাঘ।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায়?

ঐ যে। ঐ দেখ, ঐ যে আস্তে আস্তে চলছে।

চোখ ডলে নিলাম। ভাল করে দেখলাম। পূবের আকাশ সবে ফর্সা হয়েছে। আবছা আলোতে যা দেখলাম তা বাঘ নয়।

বললাম, বাঘ নয়।

জন্তুটি নেমে চলে গেল নদীর দিকে। ভালকরে নজর দিয়ে বললাম হায়েনা।

লতাহু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বাঘ নয়।

সামান্য কথার মাঝে তার নিরাশার আক্ষেপে ফেটে পড়ল। মনে হল, বাঘ দেখাটাই তার জীবনের একমাত্র উচ্চাশা ছিল, এবং বাঘ দেখতে না পাওয়াটা যেন চরম দুর্ভাগ্য। লতাহু অবিশ্বাসের সাথে বলল, তুমি হায়েনা চিনলে কি করে?

দেখলে না সাইজে কত ছোট, লেজটা ছোট, তার ওপর কুকুরের মতো কেমন দৌড়ে পালালো। বাঘ ওরকম করে পালায় না। বাঘের লেজ অতো ছোট নয়।

লেজ কাটাও তো হতে পারে।

তা বটে, লেজকাটা শেয়ালের মতো লেজকাটা বাঘ থাকাও অসম্ভব নয়। এবার সান্ত্বনা রইবে, বাঘ দেখার আশাও তোমার পূরণ হয়েছে।

লতাহু চুপ করে বসে রইল।

ভোরের শীতটা বেশ জোর ধরেছে। এলোমেলো বাতাসে কনকনানি বেশি। কম্বলটা জড়িয়ে রেলিং-এ হেলান দিয়ে বসলাম। পাশেই লতাম্বু কম্বল জড়িয়ে হেলান দিয়ে বসল।

এরপর ?

লতাম্বুর প্রশ্নটা খাপছাড়া মনে হল। জিজ্ঞাসা করলাম, কিসের পর ?

জিজ্ঞাসা করছি, পথে পথেই জীবন কাটাবে না কি।

সেটা তো তুমিই ভাল জানো। প্রথমে ছিল সঙ্গী, এখন হয়েছ অবিভাবিকা। তোমার মতই মত। আমি অনুসারী মাত্র।

লতাম্বু আবার চুপ করে বসল।

রোদ উঠল।

স্টেশনে লোকজন আসতে থাকে।

স্টেশন মাষ্টার এল।

জিজ্ঞাসা করল, রাতে খুব কষ্ট হয়েছিল নিশ্চয়ই ?

জ্ঞানপাপীর ভদ্রতা। হেসে বললাম, হলেই বা করবার কি ছিল।

বিব্রতভাবে ভদ্রলোক বললেন কোথায় যাবেন ?

কোচবিহার।

তা হলে ট্রেনে না গিয়ে বাসে যান। এখান থেকে বাস সোজা যাবে কোচবিহার। গাড়ি ছাড়বে দুপুরে, সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে যাবেন।

সংবাদ শুনে লতাম্বু খুশী হল। রাতের অনাহার শরীর ক্লান্ত করেছিল। এবার সময় পাওয়া যাবে স্নান ও খাবার।

তিস্তায় স্নান করতে গেলাম।

তিস্তায় খরস্রোত রয়েছে, জলের গভীরতা নেই। কাঁচের মতো স্বচ্ছ জলস্রোত। পাথরের গায়ে ধাক্কা দিয়ে জলস্রোত ছুটে চলেছে দুর্দান্ত চপল শিশুর মত। কখন হোঁচট খাচ্ছে কখনও গর্জে উঠছে, কখনও কাঁদছে।

উত্তর দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াতেই দূরে শ্বেতশীর্ষ পর্বতশ্রেণীর অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

লতাম্বু জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছ ?

দেখছি কাঞ্চনজঙ্ঘা।

তিস্তার বুকে দাঁড়িয়ে সকালের আলোতে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্পষ্ট দেখা

যাচ্ছিলো। কালও দেখেছি তাকে, এত সুন্দর মনে হয়নি। আজ আকাশ পরিষ্কার, পর্বতের মাথায় আলোর খেলা খেলছে সকালের সূর্য।

অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম।

হিমানী মণ্ডিত শুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় রোদের ঝিলিক দিচ্ছে। সৌন্দর্যের ঝরণা যেন নেমে আসছে কাঞ্চনজঙ্ঘার শ্বেতাঙ্গ বেয়ে।

স্নানের পর আহার। আহারের পর বিশ্রাম।

ষ্টেশন মাষ্টার সকালের গাড়ি পাশ করে এসে দাঁড়াল।

বসতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার দেশ?

নেই। এই শব্দটির জন্য ভদ্রলোক যেন প্রস্তুত ছিল।

ছিল তো কোথাও?

ছিল রংপুর জেলায়।

কতদিন রেলে কাজ করছেন।

ছ সাত বছর হবে।

কেমন লাগছে এ দেশ।

মন্দ নয়। ম্যালেরিয়া আর ব্লাকওয়াটার ছিল ভয়ের, সে ভয় আজকাল আর বেশি নেই। আগে খাবার সুখ ছিল। আজকাল আর সেটাও নেই। জঙ্গলের দেশে একটু কষ্ট হয় বই কি।

ভদ্রলোক হাসলেন। শুকনো হাসি মনোকষ্টের প্রলেপ মাত্র।

আপনারা?

যশোর—নদীয়া।

হেসে বলল, তাহলে সবারই একদশা।

একটু পার্থক্য রয়েছে। আপনি কাজকর্ম করছেন আমরা কাজ পাচ্ছি না। নইলে সবই এক। নতুন য়ুহিদী জাতের পত্তন হয়েছে ভাবতে।

ভদ্রলোক খুশী হল না। ধীরে ধীরে নিজের কাজে চলে গেল।

বাস এল।

আবার যাত্রা হল শুরু।

বাসে বসে ষ্টেশন মাষ্টারের কথা ভাবছিলাম, এখানে আগে যা ছিল এখন তা নেই অর্থাৎ ম্যালেরিয়া, এখানে আগে যা ছিল না তা রয়েছে অর্থাৎ

মহার্ঘতা। থাকা-না থাকার চমৎকার সমন্বয়। মানুষ একটা ছাড়লে আরেকটা পায়। নদীর এক কুল ভাঙ্গলে আরেক কুল গড়ে। বিশ্বপিতার অমোঘ বিধান।

বুদ্ধিজীবি মানুষের সামনে অনেক সমস্যা, অনেক প্রশ্ন, অনেক বিভ্রান্তি, অনেক বিঘ্ন, তবুও তারা জানে ভাঙ্গন হল গড়বার ইঙ্গিত। কান্না ও ধ্বংসের মাঝেই বুঝি নতুনের স্বপ্ন রয়েছে। মিথ্যা নয়। এই হল চরম বাস্তব সত্য।

গাড়ি ছুটছে। ছুটছে এবার গভীর বনের মাঝ দিয়ে।

থামল ময়নাগুড়ি।

ছোট গ্রাম। গ্রাম ছোট হলেই বা কি হবে, পরিবেশ অতি সুন্দর। দুয়ার থেকে সমগ্র বাংলার এইটেই হল যোগাযোগ পথ। এখান থেকে কোচবিহারের মেকলিগঞ্জ, জলপাইগুড়ির মাল, ধূপগুড়ি, নাগরাকাটা প্রভৃতি যাবার পথ জালের মত ছড়িয়ে আছে, এখান থেকেই জল্পেশ মন্দিরে যাবার সহজ পথ রয়েছে।

ছোট দুটো পাহাড়ী নদী এসে ডাক বাংলোর পাশে এক সাথে মিশেছে। দুইটি খরস্রোতা একটি হয়ে তর্ তর্ করে ছুটে চলেছে। জলের ধারা স্ফটিক স্বচ্ছ। সেই জলধারায় গভীরতা কম হলেও তীব্রতা যথেষ্ট।

লোহার সাঁকো দিয়ে গ্রামের দুই প্রান্ত সংযুক্ত। পথ যানবাহনে সদা ব্যস্ত, জনসাধারণ কর্মমুখর। উন্মুক্ত প্রান্তর, কাঠের তৈরী গৃহের সারি. ছোট ছোট বাগান. সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ।

ময়নাগুড়ি পেরিয়ে এলাম।

আবার গাড়ি ছুটল।

থামল ধূপগুড়ি।

গুড়ির রাজ্য জলপাইগুড়ি। তারই একগুড়ি ধূপগুড়ি। ধূপগুড়ি মুখর হয় হাটের দিনে। পথের মাঝখানে সিন্দুরলিপ্ত যে দেবতাকে বটবৃক্ষের আচ্ছাদনে রাখা হয়েছে তার উৎসব সেদিন যেন বৃদ্ধি পায়। জনসমাগম বৃদ্ধি পায়, দেবতার পূজারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।

ধূপগুড়ি থেকে সোজা রাস্তা বীরপাড়া। গ্রামের সাথেই রেল ষ্টেশন, ষ্টেশনের সন্নিকটে হিমালয় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাংলার প্রান্ত-

সীমা, ভুটানের আরম্ভ। এইপথে আসে অজস্র কমলালেবু, মাখন আর ভুটিয়া কম্বল। ব্যবসা বাণিজ্যের মস্ত বড কেন্দ্র। বীরপাডা পেছনে ফেলে শ্যাম বৃক্ষরাজি আচ্ছাদিত চা বাগানের মাঝ দিযে পথ। বিরাট বিরাট শিশু গাছ, জারুল গাছ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েক শত বৎসর ধরে। সেই পথে চলছি। গাডী ছুটল।

আবাব ছুটল।

থামল ফালাকাটা।

আবার ছুটল।

ছোট ছোট গ্রামগুলো ছবিব মতো পেরিযে গেল, অসংখ্য চায়ের বাগিচা, শাল-শিশু মেহগিনির সাবি, তার মাঝ দিয়ে ছুটে চলেছে মানুষের তৈবী পথ। পেরিয়ে এসেছি জলঢাকা নদীব সুশোভন লোহার সেতু, পেবিযে এসেছি চা এলাকার ছোট ছোট হাট বাজাব। গাড়ি ছুটছে।

আবার থামল তোর্সার ঘাটে।

নৌকায চডে গাড়ি সমেত পেরিযে এলাম নদী।

আবাব ছুটল গাডি। নদীব বালুচরায বুনো ঝাউযেব ঝোপ মাথা উঁচু করে রয়েছে। বর্ষায় ভেসে আসা বড বড শালেব গুডি মনুমেণ্টের মত দাঁডিয়ে রয়েছে কোথাও। তোর্সাব প্রচণ্ড স্রোতে পাথরেব নুডি গডাতে গডাতে এসে নদী কিনারায় ভীড কবেছে। নদী পেরিযে চললাম।

আবার নদী, আবার নৌকা। থামল পলাশবাড়ি।

অতঃপর কোচবিহার।

তখনও ঠিক করতে পাবিনি, কোথায যাব।

লতানু বলল, বাতের আশ্রয হোটেলই ভাল।

কোচবিহার একদিন মনের কোনে স্বপ্নের আবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিল। সেই স্বপ্নচ্যুতি যাতে না ঘটে তার জন্য মনকে প্রস্তুত করে নিলাম।

আশ্রয় নিলাম হোটেলে, বিছানা পেতে শুয়ে পডলাম।

লতানু নিজের বিছানা ছেডে উঠে এসে বসল আমার বিছানায়। জিজ্ঞাসা করল এর পর কোথায় যাবে ?

ঠিক নেই।

কোচবিহারকে ভাল লাগবে কি ?

না লাগার কোন কারণ আছে কি। কোচবিহারকে মনে করতে হলে সবার আগে মনে পড়ে রাজা বিশ্বসিংহকে। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি।

লতাহু বলল, তখন গৌড়েশ্বর হোসেনশাহ।

বললাম, হোসেনশাহের প্রতাপ এবং মহানুভবতা সবজন বিদিত। বিশ্বসিংহ হোসেনশাহকেও টকর দিয়েছিল।

রাজবংশী, কোচ, মেচ, ভুটিয়াদের সঙ্ঘবদ্ধ করে বিশ্বসিংহ গড়ে তোলেন অজেয় সৈন্যবাহিনী। বিশ্বসিংহের বিশ্বজয়ের নেশা পেয়েছে। দুর্জয় এই বাহিনী নিয়ে কামরূপ থেকে করতোয়া অবধি বিরাট রাজ্য গড়ে তুলল বিশ্বসিংহ। উত্তরবঙ্গের নবরূপ দেখা দিল।

রাতের বেলায় বিশ্বসিংহ স্বপ্ন দেখলেন। দেবী কামাখ্যা তাকে ডাকছেন। দেবী বললেন, তুই তো বেশ নিজের ঘর তৈরী করে বাস করছিস, আমার ঘর কোথায়? যদি আমার ঘর না গড়ে দিস তা হলে তোর রাজ্য থাকবে না।

বিশ্বসিংহ করজোরে বলল, তোমার ঘর কোথায় তৈরী করব মা?

ঐ পূর্বদিকে। ঐ যে পাহাড়, ঐ পাহাড়ের মাথায়। ঐ পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে তোর রাজ্যের সীমানা পাহারা দেব আমি। আমার মন্দির পেরিয়ে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না পূর্বদিক থেকে তোর রাজ্যে।

রাজা বললেন, বেশ তাই হবে।

দেবীর আদেশে বিশ্বসিংহ তৈরী করলেন কামাখ্যা মায়ের মন্দির। স্থাপিত করলেন দেবীর বিগ্রহ। পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে পাহাড়ের মাথায় দেবী আশ্রয় নিলেন সন্তানকে পাহারা দেবায় দায়িত্ব নিয়ে।

সে মন্দিরেও ফাটল দেখা দিল।

বিশ্বসিংহের পুত্র রাজসেনাপতি শুক্লধ্বজ স্বপ্নাদেশ পেলেন। মায়ের বাসোপযোগী গৃহ নির্মাণ প্রয়োজন।

শুক্লধ্বজ তৈরী করালেন নতুন মন্দির। যে মন্দির তৈরী করিয়েছিলেন শুক্লধ্বজ সে মন্দির আজও দাঁড়িয়ে আছে কামাখ্যা মন্দিররূপে।

বিশ্বসিংহ ক্লান্তি বোধ করছেন।

সারা জীবনব্যাপী রাজ্যগঠন আর শত্রু বিতাড়ন করতে করতে আয়ু

ক্রমাগত ক্ষীণ হয়ে আসছে। তিরিশ বছর অক্লান্ত চেষ্টায় রাজ্য গড়েছিলেন। একদিন বিদায় নিতে হল ধরাধাম থেকে। রাজ্যের ভার তুলে দিলেন পুত্র নরনারায়নের হাতে। আর রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব দিলেন দুই পুত্রকে। রাজ্য রক্ষায় দায়িত্ব যারা নিল তারাই হল শুক্লধ্বজ আর কমলা। রাজ্য বিস্তৃত হল ত্রিপুরা থেকে ভাগলপুর অবধি।

জন্ম, জরা, মৃত্যু সবারই আছে। এর বাহিরে যাবার সামর্থ্য কারুরই নেই। রাজ্যের জন্ম হল বিশ্বসিংহের অক্লান্ত পরিশ্রমে, এল জরা। গৌড় সুলতান কোচবিহার আক্রমণ করল। করতোয়ার তীরে হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত বাহিনী সুলতানকে বাধা দিল, কিন্তু সে বাধা হয়ে গেল চূর্ণবিচূর্ণ. শুক্লধ্বজ হল বন্দী। বিকল্প ব্যবস্থায় নরনারায়ণ বাদশাহ আকবরের সহায়তায় সুলতানী সেনাকে বিতাড়িত করল। তাও ক্ষণিকের প্রলেপ মাত্র। নর-নারায়ণ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। আরম্ভ হল গৃহ বিবাদ। রাজ্য ভেঙ্গে দু টুকরো হল। জরা পূর্ণতা লাভ করল। দুটো রাজ্য হল কোচবিহার আর কোচহাজো।

গৃহ বিবাদ চরমে উঠল। ভারতের দুর্ভাগ্য চিরকাল এসেছে গৃহবিবাদের ভিত্তিতে এবার দুর্ভাগ্য সেই ভাবেই এল কোচবিহারে।

গৃহ বিবাদের সুযোগ নিয়ে দিল্লির শৃঙ্খল পাশ এগিয়ে এল। কোচ-বিহার দিল্লির বশ্যতা স্বীকার করল, কোচহাজো স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু সাফল্যলাভ করল না। কোচহাজোর রাজা পরীক্ষিত পরাজিত হয়ে পালিযে গেল বনদেশে। পরীক্ষিতের বংশধররা পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করল, পেল এক টুকরো শুকনো রুটির তুল্য জমিদারী। জঙ্গলদেশে বিজনী হল এই জমিদারীর কেন্দ্র। বিজনীর রাজবংশ আজও আছে, আজও তারা সাক্ষ্য দিচ্ছে গৃহ-বিবাদের দুঃস্বপ্নময় কাহিনীর। এরাই শুক্লধ্বজের বংশধর। বিশ্বসিংহ যে স্বপ্ন দেখেছিল সে স্বপ্ন কল্পনাতেই থেকে গেল ভবিষ্যত বংশধরদের দুর্মতিতে।

মোগলের অন্তিম কাল ঘনিয়ে এল। দিল্লির তক্ত নড়ে উঠল। সেই সাথে সাথে কোচবিহারও স্বাধীনতা ঘোষণা করল। নতুন করে উৎপাত আরম্ভ হল ; দ্বন্দ্ব লাগল ভুটিয়াদের সাথে। ভুটিয়াদের সামলাতে না পেরে

কোচবিহারের রাজা সাহায্য চাইল ইংরেজের। ইংরেজের সাহায্য চাওয়ার অর্থ রাজা জানতো না। সন্ধির নামে স্বাধীনতা বিক্রয় করে কোচবিহার পেল সামন্তের মর্যাদা। এই অশুভ ঘটনা ঘটল ১৮৩৩ অব্দে। তারপর থেকে কোচবিহারের অস্তিত্ব রইল ভূগোলের পাতায়, ইতিহাসের পাতা থেকে কোচবিহার মুছে গেল চিরকালের জন্য।

তোর্সা বেয়ে চলেছে কোচবিহারের পাশ দিয়ে। তোর্সার স্রোতে ভেসে গেছে কোচবিহারের স্বাধীনতা কিন্তু কোচবিহারের জন্য সবার অজ্ঞাতে পুঞ্জীভূত হয়ে রইল বিলাস, রইল নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা, রইল প্রজা পেষনের অবাধ অধিকার। রাজারা শহর সাজাল, মানুষকে সাজাতে পারল না। ইঁটের উপর ইঁট দিয়ে প্রসাদ তৈরী হল। তৈরী হল থানা, দপ্তর, ব্যবস্থা হল নানা উৎসবের। রাজা রাজত্ব পেল কিনা সেকথা দেশের লোক জানল না, তারা জানল, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা একটি ব্যক্তি যিনি দাসখত দিয়ে মেকি রাজার অভিনয় করছেন। শাসনের পর্দার তলায় দেশের লোক গুমরে উঠতে লাগল। শাসক তার বিলাস বহুল জীবনকে বিদেশীয় ভঙ্গীতে পরিচালনা করতে লাগল দরিদ্রের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে।

সেই কোচবিহারে এসেছি।

সুন্দর রাস্তা, সুন্দর বাগান, সুন্দর দিঘী, সুন্দর হর্ম্য। বাংলাদেশের সুন্দর শহরগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। দিঘীর জলে রাজপ্রাসাদের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। মদনমোহনের মন্দিরে শত শত কাঙ্গাল ভীড় করে। বৈরেগী দিঘীর জলে মদনমোহনের মন্দিরের ছায়া পড়ে, সন্ধ্যা মুখরিত হয় দেবপূজার বাদ্যে, ভক্তদের উচ্চনাদে।

কিন্তু কার কোচবিহার?

রাজার বিলাস ভার বহন করতে করতে কোচবিহার কুব্জ হয়ে গেল। ছোট্ট সামন্ত রাজ্যের অফিস আদালত, হাইকোর্ট, সেনাবাহিনী প্রতিপালন করে যা কিছু থাকে তা ব্যয় হয় রাজার বিলাস বহুল জীবনকে রক্ষা করতে, প্রতিপালন করতে।

সেই কোচবিহারকে দেশের মানুষ ফিরে পেয়েছে।

কিন্তু সেখানকার মানুষ আজও ঘুমিয়ে আছে। সামন্ততন্ত্রের আফিমের ঘুম যেন জড়িয়ে আছে সাধারণ মানুষের মনে। সত্যকার পথ খুঁজবার চেষ্টা

করে না একজনও, আজও তারা স্বপ্ন দেখছে, দুঃখ ঘোচাবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

লতাদুর হাত ধরে শহর বেড়িয়ে এলাম।

মদনমোহনের মন্দিরে এসে বসলাম। সমগ্র শহরের মধ্যে এইটিই বোধ হয় সর্বাধিক স্নিগ্ধ স্থান। এখানে এসে মন জুড়িয়ে গেল। সামনে বিরাট জলাশয়। সারি সারি পামগাছের ছায়া পড়েছে জলাশয়ের জলে। দুগ্ধশুভ্র মন্দির শীর্ষ অজ্ঞাত দিন থেকে সাক্ষ্য দিচ্ছে মানুষের উদার ভক্তিরসের।

প্রাসাদের প্রাচীর পেরিয়ে যেতে পারিনি। রাজার রাজত্ব না থাকলেও ব্যক্তিগত সম্পদের মর্যাদা দানের কোন ত্রুটি কোথাও নেই। রাজ্য ছিল, মানসিক অশান্তি ছিল, উদ্বেগ ছিল, এখন এসব কিছুই নেই, আছে বিনা মেহনতে গরীবের উপার্জিত অর্থের অংশীদারত্ব, আর রয়েছে ব্যয় করবার অবাধ স্বাধীনতা। তাই কোচবিহার নতুনের পথে পা দিয়েও পুরাতনের আঘাত সহ্য করছে।

রাস মেলার অনেক দেরী।

কোচবিহারের রাস মেলায় বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুসম্ভার আসে। লোকশিল্পের বিরাট প্রদর্শনী হয়। রাজধানী থেকে বহুদূরে যারা বাস করে, যারা শিল্পী হয়েও সমাজে স্থান গড়ে নিতে পারেনি, তাদের সৃষ্ট দ্রব্যসম্ভারে ভরে ওঠে এই প্রদর্শনী। কোচবিহারকে স্মরণ করে তামাক ব্যবসায়ীরা, যাদের অধিকাংশই এদেশে পরদেশী, তারা কোচবিহারের শিল্পকে কোন মূল্যই দেয় না! তারা দোহন করে, অর্থের প্রাচুর্য ঘটায়, শিল্পী ও শিল্পকে ভালবাসে না।

সন্ধ্যা বেলায় ক্ষুণ্ণ মন নিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে।

লতাদু বল্লে, এত সুন্দর শহর দেখে খুশী হতে পারনি বুঝি।

তাইতো দেখছি, খুশী হলে তৃপ্তি হত। কপাল মন্দ।

তোর্সা দেখা হল না।

দেখলাম যে! আধা শুকনো ঐ নদীটাই তোর্সা। বর্ষায় ওটাই হয় ভয়ঙ্কর। একে বাগ মানাতে পারেনি বলেই কোচবিহারের মানুষ তোর্সাকে মনে করে কোচবিহারের হোয়াংহো।

হোটেলওলার সাথে পরামর্শ করে ঠিক করলাম সকালের বাসে যাব গোসানীমারি।

লতাহুকে বললাম যাবে গোসানীমারি ?

কতদুর এখান থেকে।

কতই বা হবে, বিশ পঁচিশ মাইল হবে। গোসানীমারির ঘাট অবধি সরকারী বাস পাওয়া যাবে। বিশেষ কষ্ট হবে না।

কষ্টের কথা বলছিনা, বলছি, সে জায়গার গুরুত্ব কি রয়েছে।

গোসানীমারি দুর্গ এক সময় ছিল কোচবিহাররাজ্য রক্ষার প্রধান সহায়ক। এই দুর্গ ভেঙ্গে গেছে, সেখানে রয়েছে দেবী মহাকালীর মন্দির। আর রয়েছে কতগুলো স্থানীয় প্রবাদ।

বেশ, তাই চল।

সকাল বেলায় প্রথম বাসেই রওনা হলাম। গোসানীমারির ঘাটে এসে দুর্গের হদিস বের করলাম।

তুজনে পাশাপাশি চলছি। দুর্গদ্বার অবধি যাবার কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু ভগ্ন দুর্গের জঙ্গলাকীর্ণ অংশে প্রবেশ করতে সাহস পেলাম না।!

সামনেই মহাকালীর মন্দির। পূজারীর সামনে গিযে বসলাম। জিজ্ঞাসা করলাম দুর্গের ইতিহাস। পূজারী পুলকিতভাবে বলল, এ দুর্গ কি আজকের দুর্গ। সে সময় কোচবিহারের রাজা ছিলেন নীলাম্বর।

নীলাম্বর ছিলেন দিগ্বিজযী বীর। তার প্রধান অমাত্যছিল শচীপাত্র।

শচীপাত্রের পুত্র ছিল পরম অত্যাচারী। পিতার শাসনবিহীন আদরে পুত্র হযে উঠল চরম উচ্ছৃঙ্খল।

রাজদরবারে অভিযোগ আসতে লাগল। রাজা শচীপাত্রকে বাববার অনুরোধ জানাতে লাগল পুত্রকে সংযত করবার কিন্তু ফলোদয হল না।

অবশেষে রাজা আদেশ দিলেন প্রধান অমাত্যপুত্রকে বন্দী করতে এবং হত্যা করতে।

রাজ আদেশ পালিত হল।

প্রধান অমাত্য পুত্রের মৃতদেহ আনা হল রাজ সমীপে। রাজা শচী-পাত্রের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন। আবার আদেশ দিলেন প্রধান অমাত্য পুত্রের মাংস রন্ধন করতে আর নিমন্ত্রণ জানালেন শচীপাত্রকে।

শচীপাত্র রাজগৃহ থেকে আহারকার্য সমাপন করে এল, সে জানতেও পারল না স্বীয় পুত্রের মাংস দিয়ে উদরপূর্ত্তি করতে হয়েছে।

ঘটনা গোপন রইল না। শচীপাত্র জানতে পারল রাজার এই নিষ্ঠুর কার্য কলাপ। বাংলার ইতিহাসের আর একটি কলঙ্কময় অধ্যায়ের অবতারণ করল শচীপাত্র।

দূত পাঠাল গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের কাছে। হোসেনশাহ সসৈন্যে এল কোচবিহারে। শচীপাত্র প্রদর্শিত গোপন পথে হোসেনশাহ প্রবেশ করল কোচবিহারে।

কোচবিহার রাজার জন্য সর্বশ্রেণীর মানুষ হাতিয়ার বন্দী হযে ছুটে এল। হোসেনশাহ প্রমাদ গণলেন?

বসল মন্ত্রণাসভা। শচীপাত্র মন্ত্রণা দিল সন্ধি করুন।

হোসেনশাহ সন্ধিভিক্ষা করে দূত পাঠাল নীলাম্বরের কাছে। অযথা ধন ক্ষয়, নরহত্যার চেযে সন্ধি অনেক শ্রেয। নীলাম্বর সন্ধি স্বীকার করল।

হোসেনশাহ সন্ধিব শুভেচ্ছা আদান প্রদানের জন্য বেগমদের পাঠাতে চাইলেন রাজ অন্তপুরে। নিঃসন্দেহে নীলাম্বর বেগমদের আসতে সম্মতি দিলেন। দূর্গের অভ্যন্তরে কয়েক শত শিবিকা প্রবেশ করল।

কিন্তু কোথায় বেগম? শিবিকা থেকে বেরিযে এল কয়েক শত যোদ্ধা, বাহকরাও অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়ল।

দূর্গের অভ্যন্তরে ঘোরতর যুদ্ধে নীলাম্বর বন্দী হল।

হোসেনশাহের আদেশে লৌহ পিঞ্জরে নীলাম্বরকে আবদ্ধ করা হল। বিজয়ী হোসেনশাহ বন্দী নীলাম্বরকে নিয়ে রওনা হল গৌড়ের পথে। বনপথে কোন ক্রমে নীলাম্বর বন্দীত্ব থেকে পালিযে গেল, কোথায় গেল তা কেউ জানে না। নীলাম্বর আর ফিরে আসেনি এই গোসানীমারিতে।

সেই থেকেই ভগ্নদশায় রয়েছে এই দূর্গ। পরবর্তী রাজারা মেরামত করেছিল কিন্তু বর্তমান যুগে এর কোন মূল্য নেই, তাই রাজারাও এই দূর্গ সংস্কার করায় নি কখনও।

পূজারী কথিত কাহিনী শেষ হতেই দুজনে ফিরে এলাম বাস স্ট্যাণ্ডে। বিকেলে পৌছালাম কোচবিহার শহরে।

এসে আর বিশ্রামের সুযোগ পেলাম না। লতাহ্নু বলল, চল বিমান বন্দর বেড়িয়ে আসি।

বিমানবন্দর যাবার পথে সামন্তরাজ্যের ফৌজী দপ্তর দেখলাম। সে দপ্তর উঠে গেলেও বর্তমান সরকার সেখানে সৈন্যবাহিনী এখনও মোতায়েন রেখেছে। দপ্তরের সামনে কলেজের ছাত্রাবাস।

বললাম, একসময় এই ফৌজী দপ্তর আর ছাত্রাবাস সংবাদপত্রের খোরাক জুগিয়েছে।

লতাহ্নু জিজ্ঞাসু ভাবে বলল, অর্থাৎ?

সৈন্যবাহিনীর সাথে ছাত্রদের কোন কারণে গোলমাল সৃষ্টি হয়েছিল। সেই গোলমালের পরিণতিতে ছাত্ররা সৈন্যদের হাতে বিশেষভাবে নিগৃহীত হয়েছিল। একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী ছাত্রাবাস আক্রমন করল! ছাত্ররা প্রহৃত হল। তাদের বিতাড়িত করল ছাত্রাবাস থেকে। এমন অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল যাতে সন্দেহ জন্মেছিল যে, কোন কোন ছাত্রকে সৈন্যরা নিম্নতলে নিক্ষেপ করে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।

তারপর।

তারপর বিচার হল। যিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন তিনি ছিলেন রাজপরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তি। কোচবিহারের ইতিহাসে রাজপরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তির খোলা আদালতে বিচার ব্যবস্থা এটেই বোধহয় প্রথম। মহারাজার আদেশে কোচবিহার হাইকোর্টের বিচারপতি এ বিচারকার্য পরিচালনা করেছিলেন।

লতাহ্নু গম্ভীরভাবে বলল, এর চেয়ে ভয়ঙ্করকাণ্ড কিন্তু পরবর্তীকালে ঘটেছে তার বিচার হয় নি। সামন্ত রাজারা আর যাই করুক জনসাধারণকে কম মূল্যে আহার্য দিয়ে এসেছে চিরকাল। কোচবিহার সংযুক্ত হল ভারতের সঙ্গে। ভারতীয় আইন কাহ্নুন চালু হল এখানে সেই সাথে এল দুর্নীতির প্লাবন। দেখতে দেখতে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পেল। যারা ষোল টাকা সাড়ে ষোল টাকায় চাল সংগ্রহ করেছে বার মাস তাদের চাল সংগ্রহ করতে হচ্ছিল পঞ্চাশ টাকা দরে। দেশের মাহ্নুষ আশা করেছিল, সরকার মুনাফা-খোরদের শায়েস্তা করবে। কিন্তু ফল হল উল্টো। মুনাফাখোররা যেমন অপরাপর অংশে নিরাপদে বাস করে তেমনি এখানেও বাস করতে লাগল।

দেশের লোক ভুখ মিছিল নিয়ে ছুটে গেল সরকারী দপ্তরখানায়। যে অস্ত্র মুনাফাখোরদের শায়েস্তা করতে অক্ষম, সেই অস্ত্র গর্জে উঠল বুভুক্ষু মানুষের প্রতি। সাগরদীঘির নির্মল জল রক্তাক্ত হল বুভুক্ষু মানুষের রক্তে। সামন্ত ব্যবস্থায় যা সম্ভব হয়েছিল, দেশী সরকারী ব্যবস্থায় তা সম্ভব হয়নি। সেদিন রাজপরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়েও সেনাদলের নেতার বিচার হয়েছিল, বর্তমানে রাজকর্মচারীর বিচার ব্যবস্থা করবার সাহস পায়নি দেশী সরকার। এক ক্ষেত্রে যা অক্ষম অপর ক্ষেত্রে তা হল ভয়ঙ্কর, এই হল বর্তমানের দুর্ভাগ্য।

এটা যুগধর্ম। কোচবিহারের মানুষকে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যায়, রাজার রাজ্যে তারা সুখে ছিল। বর্তমানে তাদের সুখ নেই। কেন, মানুষ শুধু বেঁচে থাকবার মত পরিবেশ চায় জন্মগত বৃত্তিতে, সেটুকু তারা পেয়েছে রাজার রাজ্যে, তারা ব্যক্তি স্বাধীনতা, বলবার স্বাধীনতাকে মূল্যবান মনে করেনি। আজ আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতা পেয়েছি, বলবার স্বাধীনতা পেয়েছি, সেই সাথে পেয়েছি মরবার স্বাধীনতা। সে স্বাধীনতা এনেছে অনাহার, বেকারিত্ব, তাই আজকের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন জেগেছে মানুষের মনে। সেদিনের কোচবিহারের মানুষ তাই আজকের কোচবিহারকে সহ্য করতে পারছে না।

কথা শেষ হতে হতেই আমরা পৌঁছে গেছি বিমান বন্দরে। বিমান বন্দর ঠিক নয়, বিমান ওঠা নামা করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে। ঘাসের রাজ্য, গিয়ে বসলাম ঘাসের উপর।

সামনে খোলা মাঠ। একপাশে একটি দ্বিতল সুরম্য অট্টালিকা, বিমান আসবার সময় নয়, সেজন্য বিমান ক্ষেত্র জনশূন্য। দুজনেই বসেছিলাম নির্জনে। লতাসুর দৃষ্টি তখন দিগন্তে প্রসারিত, সূর্য ডুবছে বনের মাথায়, মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে তার চুল উড়ে এসে মুখের উপর দোল দিচ্ছিল। আমি দেখছিলাম লতাসুকে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতেই দুজনেই উঠলাম। রিক্সা ভাড়া করে ফিরে এলাম হোটেলে।

পরদিন।

লতাহু বলল, এলাম যখন তখন ব্রহ্মপুত্র দেখেই যাই।

সে তো অনেক দূর।

কাছেই রয়েছে ধুবড়ী। ধুপী বুড়ি অর্থাৎ নেতাধোপানীর দেশ, সেখানেই চল। যাত্রাপথের ওখানেই যেন বিরতি ঘটে।

বিশ্রাম নেবে না।

না, এগিয়ে চল।

আবার যাত্রা হল শুরু।

আলিপুরদুয়ারে গাড়ি বদল করেও আবার নামতে হল ফকিরাগ্রামে, সেখান থেকে ধুবড়ীর গাড়ি পেতে পেতে বেলা উৎরে গেল। সন্ধ্যায় নামলাম ধুবড়ী শহরে।

ধুবড়ীতে এর আগেও গিয়েছি। তখন গিয়েছি পার্বতীপুর থেকে সোজা গোলকগঞ্জ; সেখান থেকে গিয়েছি ধুবড়ী।

পথে গৌরীপুর।

গৌরীপুরের জমিদারদের খ্যাতি আছে। খ্যাতির সাথে জড়িয়ে আছে অতীতের ইতিহাস।

মতিয়াবাগ প্রাসাদ রাজাদের বিরাম গৃহ। শেরশাহ তুরস্ক থেকে কামান তৈরী করে আনিয়েছিলেন, সেই কামান আজও রাজপ্রাসাদে রয়েছে, অতীতের ইতিহাসকে আজকের মানুষের সামনে তুলে ধরেছে।

ঘন বনের মাঝ দিয়ে পথ গেছে বিলাসীপাড়া, টিপকাই। সেই পথের ধারে গভীর বনে অতি প্রাচীন কালের প্রায় অভগ্ন মসজিদ রয়েছে একটি। উঁচু টিলার ওপর এই মসজিদটিকে বেষ্ঠন করে আছে গৌরীপুর রাজাদের তহশীল কাছারি।

মসজিদের পুরাতনত্ব সম্বন্ধে অনেক কাহিনী রয়েছে। সেই সব কাহিনীরও প্রাচীনত্ব রয়েছে। মীরজুমলা এসেছিল আসাম জয় করতে, এসে কিছুকাল এই গভীর বনে বাস করতে হয়েছিল। তখনই নির্মিত হয়েছিল এই মসজিদ। এই মসজিদের সাথে রয়েছে একটি গভীর ইন্দারা। বর্ষায় তাতে জল জমে, তার চারপাশের উঁচু বেদী ভেঙ্গে ভূমির সঙ্গে মিশে গেছে। এর ফলে এই মসজিদ সংলগ্ন ইন্দারা সাধারণের চলাচলের পক্ষে মৃত্যুগহ্বর মনে হয়েছে। তবে শোনা গেছে, আজ অবধি এই ইন্দারায় কোন মানুষ পা

হড়কে পড়েনি, যা কিছু পা হড়কানোর ফল পেয়েছে বুনো বাঘ, শূয়োর আর গোবৎস।

এই মসজিদ আর ইন্দারা দেখতে গিয়েছিলাম বহুকাল আগে,' সেই সময়ের সে পথ আর নেই। আজ ঘুরতি পথে আসতে হল ধুবড়ীতে। তবুও এলাম।

রাতের আশ্রয় খুঁজতে হল হোটেলে।

শহরের সবচেয়ে বড় রাস্তার সামনেই হোটেল। ঘরখানাও বেশ পাওয়া গিয়েছিল। খাওয়া দাওয়া শেষ করে আলো নিভিয়ে জানালা খুলে বসলাম। লতাংশু কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে উঠে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে বসল পাশে।

জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছ?

ভাবছি, এবার বিরাট যতিচিহ্ন টেনে দিতে হবে।

কিসের? চলার?

প্রয়োজন হলে উভয়ের এই অসংবদ্ধ সম্পর্কের।

তোমাকে তো কাপুরুষ কোনদিনই মনে করি নি।

আমি তো মানুষ। দেবতা যখন নই, প্রলোভন জয় করবার সামর্থ্যও আমার নেই। যদি কোনদিন ভুলবশেই তোমার অসম্মান করি। তখন মুখ উঁচিয়ে তোমার সামনে দাঁড়াতে পারব না। এর চেয়ে মৃত্যুও বেশী কাম্য।

লতাংশু চুপ করে রইল। তার নীরবতা লক্ষ্য করে আমিও চুপ করে গেলাম।

রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ হয়ে এসেছে।

দুজনেই চুপ করে বসে আছি।

হঠাৎ লতাংশু বলে উঠল, এখানে বেহুলা তার স্বামীকে ফিরে পেতে নেতা ধোপানীর আশ্রয় নিয়েছিল।

প্রবাদ তাই রয়েছে। আজও নদীর কিনারায় পাথরের স্তুপ দেখিয়ে লোকে বলে, ওটা ছিল নেতা ধোপানীর পাট। গদাধর নদী যেখানে এসে ব্রহ্মপুত্রে মিলেছে, সেখানেই রয়েছে এই পাথরের স্তুপ।

লতাংশু প্রশ্ন করল না, আগ্রহ দেখিয়ে কোন আলোচনার উত্থাপন করল না। চুপ করে বসে রইল।

নিজের বিছানায় এসে গা মেলে দিলাম।

লতাম্বু মুখ ঘুরিয়ে বসল।

বলল, তুমি তো জানো, আমি কে ও কি?

মৃদুস্বরে বললাম, জানি।

তাতে ভয় অথবা ঘেন্না তোমার মনে জাগে না?

বললাম, না।

সন্দেহ?

না।

আমি কিন্তু ভয়ে মরি। লতাম্বুর সহস্ররূপের মাঝে তার নরঘাতকের রূপ বোধহয় সবচেয়ে ভয়ঙ্কর।

আত্মরক্ষার তাগিদে নরহত্যা অপরাধ নয়। আইনও তাই বলে।

সন্তান হত্যা।

পরিচয়হীন সন্তানের মাতৃত্ব কারও পক্ষে কাম্য নয়।

হত্যা তো নিশ্চিত।

লতাম্বু চুপ করে গেল।

বললাম, মানুষের বিশ্বাস কত প্রখর হয় তা বুঝি জানো না?

জানি। যতক্ষণ আঘাত না আসে ততক্ষণ যুক্তিহীন বিশ্বাসও কেবল শূন্য নয়, মানুষের সমাজদেহে বিষ ছড়িয়ে দেয়।

অদ্ভুতও ঠেকায় কখনও কখনও। বেহুলার সাথে কেমন সুন্দরভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এই ধুবড়ীর কাহিনীকে। এ বিশ্বাসটুকু সম্বল করে আজও ধুবড়ীর ঘাটের মসৃণ পাথরে সিঁদুর মাখায়, পূজা দেয়। লখীন্দরের মৃতদেহ উজানে এই পথেই এসেছিল। এই ঘাটেই বাধা পেয়ে আটকে গিয়েছিল বেহুলার ভেলা। ঘাটে তখন নেতা ধোপানী কাপড় কাচছিল। নেতার দুষ্টু ছেলেটা বিরক্ত করছিল মাকে। কাজের অসুবিধা দেখে নেতা আছাড় দিয়ে নিজের ছেলেটাকে মেরে ফেলে মৃতদেহটা শুইয়ে রেখেছিল বালির চরায়। কাপড় কাচা শেষ হতেই নেতা মন্ত্র দিয়ে ছেলেকে প্রাণ দান করে তার হাত ধরে বাড়ির দিকে রওনা হল। বেহুলা এই অদ্ভুত ঘটনা দেখতে পেয়ে ছুটে এসে নেতার পায়ের তলায় আছড়ে পড়ল। নেতার সাহায্যে লখীন্দরকে ফিরে পাবার আশা জাগল তার মনে। ভেলা ভেসে এসে এই ঘাটে আটকে গিয়েছিল বলেই এর নাম ভাসানীর চর,

আর এই ঘাটের নাম নেতা ধোপানীর ঘাট। আজও সেই বিশ্বাস মানুষের মন থেকে বিলুপ্ত হয় নি।

গোসানীমারিতে তো শুনে এসেছি আরেকটি অদ্ভুত বিশ্বাসের কথা। গোসানীমারি ছিল এক সময় কোচবিহার রাজাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ। এই দুর্গে রয়েছে মা মহামায়ার মন্দির। বংশ পরম্পরায় এই দেবীর পূজারী মৈথিলী ব্রাহ্মণ। এই মন্দিরের স্থাপতিয়া ছিলেন মহারাজ প্রাণনারায়ণ। মহারাজা সংবাদ পেলেন দেবী পূজারীকে সশরীরে দেখা দেন। তাঁরও ইচ্ছা হল মাকে দেখবার। পূজারীকে অনুরোধ জানালেন, গোপন বন্দোবস্ত করলেন মাকে দেখবার। দেবী রুষ্ট হলেন। মহারাজা তার এই অনৈসর্গিক ইচ্ছা পূরণ করতে প্রাণ হারালেন। সেই থেকে কোচবিহারের মহারাজারা দেবী আদিষ্ট হয়ে অভিশাপগ্রস্ত হলেন। আদেশ পেলেন, রাজবংশের কেউ যেন সেই মন্দিরে না যায়। সেই থেকে মহারাজার বংশের কেউ সেখানে যান নি। ইংরেজ আমলে দুর্গের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। দুর্গ ভেঙ্গে গেল, মন্দিরও জীর্ণ ভগ্নদশা প্রাপ্ত হল। রাজার অর্থে দেবসেবার ব্যবস্থা রয়ে গেলেও রাজারা কখনও সেখানে যান নি। একবার একজন রাজা নদীপথে আসবার সময় মন্দিরের চূড়া দেখেছিলেন। রাজধানীতে ফিরে এসে তিনিও মারা গিয়েছিলেন অত্যল্পকাল পরে। সেই থেকে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ়মূল হয়েছিল। এই রকম বিশ্বাস নিয়েই আজও বহু মানুষ বেঁচে রয়েছে। যুক্তির দিক থেকে মূল্য কতটা সঠিক তা বলা কঠিন।

বললাম, মূল্য দিয়ে যেমন যুক্তিকে পরিমাপ করা যায় না, তেমনি যুক্তি দিয়েও মূল্য বিচার সম্ভব নয়।

লতানু চুপ করে শুয়ে রইল। কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে আমিও নিশ্চল হয়ে শুয়ে রইলাম।

কোথায় যেন ঘূর্ণীপাক সুরু হয়েছে, ঝড় উঠেছে, বাইরের প্রকৃতি নিস্তব্ধ। মনে হল কে যেন পাশে এসে বসেছে। চোখ মেলে দেখলাম, লতানু নয়। কার উষ্ণ হস্তের স্পর্শ অনুভব করলাম। না কেউ নয়। সংবেদনশীল মনটা যেন কিসের প্রতীক্ষা করছিল, প্রতীক্ষিত মানুষের ছায়া এসেছিল। চিনতে পারিনি।

উঠে বসলাম।

ধীরে ধীরে দরজা খুলে নীচের উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। আকাশে চাঁদ নেই, তারকাগোষ্ঠী মিটি মিটি করে চেয়ে রয়েছে। নিশ্চল ভাবে তাকিয়ে রইলাম আকাশের দিকে। ছায়াপথের দিকে চোখ রেখে ভাবছিলাম, পথ নির্দ্দেশ কে করবে। বসে রইলাম ভাঙ্গা একখানা টুলের ওপর।

বসে বসেই ভাবছিলাম বিগত দিনের হাস্যজনক জীবনযাত্রাকে। ফেলে আসা জীবনটা ছিল উদ্বেগবিহীন যাযাবরের। কখন, কেমন করে মনের কোনায় দানা বাঁধল লতান্সর প্রতি আকর্ষণ সে তথ্য নিজেও আবিষ্কার করতে পারি নি। এ আকর্ষণের পরিণতি কত ভয়ঙ্কর তাও ভেবে ঠিক করতে পারি নি। আপনা থেকে মনের কোনায় নেমে এসেছে অবসাদ, মন চাইছে বিশ্রামের আশ্রয়। কিন্তু সে সৌভাগ্য আমার হবে কি। অনিশ্চিত জীবনে সৌভাগ্য অনাগত দেবতার মত অজ্ঞাত এবং অশ্রুত থেকে যায় চিরকাল। আমার কাছেও তেমনি থেকে যাবে। দিনান্তে স্মরণ করব শুধু। মাঝে মাঝেই চিন্তা করব, সারা জীবনে লাভ হল কত।

লতান্স ঘুমোচ্ছে। জীবনে তার অবসাদ হয়ত আসেনি, হয়ত সে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছে, সে হয়ত ভাবছে মানুষের হৃদয় সন্ধানের প্রশ্ন একদিন সমাধা লাভ করবে। সেই আনন্দময় দিনের প্রতীক্ষায় সব কিছু ভুলে সে নির্বিবাদে ঘুমিয়ে পড়েছে। অথচ এই লতান্সকে দেখেছি অনিদ্রায় রাতের পর রাত অতিবাহিত করতে।

আমাদের এই পরিক্রমার প্রথম পাদে লতান্স যেমন আশাবাদী মন নিয়ে এগিয়ে এসেছিল, সে আশাবাদী মন যে আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে বিগত কয়েক মাসে, তা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয়নি। কিন্তু মানসিক পরিবর্তনের দিক থেকে আমি কেমন যেন স্থবির হয়ে গেছি। মনে জেগেছে বুভুক্ষা, দেহে জেগেছে সাহচর্যের প্রবল বাসনা। এ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

রাত বাড়ছে। শীতের হাওয়া বইছে। মাঝে মাঝে পেঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে। পাশের বাড়ির শিশু কেঁদে উঠল। আবার নিস্তব্ধতা।

ধীরে ধীরে উঠে এলাম নিজের ঘরে। লতান্স তখনও ঘুমোচ্ছে। সারা দিন কেটে গেছে যাত্রা পথে। ব্রহ্মপুত্রের বুকে খেয়া নৌকার নাচন দেখা তখনও বাকি, তখনও শিখগুরু বান্দার গুরুদ্বারে যাওয়া হয়নি, তখনও

গদাধরের সাথে ব্রহ্মপুত্রের মিলনক্ষেত্র দেখা হয়নি। আরও দূরের অ
দেখবার ফুরসত আসেনি। ধীরে আলো জ্বাললাম! কাগজ কলম নিয়ে
লিখতে বসলাম। ভাবতে ভাবতে কাগজে আঁচড় কেটে চলেছি:

লতাহু, তুমি ঘুমোচ্ছ। ঝড়ের পর শান্ত প্রকৃতি তোমার উপমা, আমা
মনে ঝড় উঠেছে। ভেবে পাচ্ছিনা তোমার আমার সম্পর্ক সূত্র কত শক্ত
বোধহয় খুবই শিথিল। পথে দেখা, পথেই বিচ্ছেদ। এই বোধহয় ভাল
আমি যাচ্ছি। কোথায় জানি না। কেন? তাও জানি না। ক্ষমা কর।
ক্ষমা পাবার বিশেষ দাবী কিছু নেই। পরিচয়ের বন্ধনটা হৃদয়ের বন্ধন ন
সেজন্য হৃদয়বন্ধনহীন জীবনযাত্রায় ক্ষমার প্রশ্ন অবান্তর। তবুও ক্ষমা কর।

কোন এক মনীষী বলেছিলেন, জীবন হল ল্যাবোরেটরি, এখানে চলে
পরীক্ষা-নিরীক্ষা অন্তহীনভাবে। সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়না কোনদিন।

আমাদের জীবনও তাই। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, চলতে চলতে একদিন
ছেদ আসবে, সেদিন হিসাবের খাতা খুলে দেখা, 'লাভের আশায় দিয়েছি
দাদন, কড়িটি পাইনি ফিরে।' জীবনের মূল সূত্রের খেই হারিয়ে যাবে, সত্য
থেকে যাবে অনুদ্‌ঘাটিত।

লিখতে লিখতে থেমে যেতে হল। মনে হল এ চিঠি লেখবার কোন
উপযোগিতা নেই। লতাহু ঘুমোচ্ছে ঘুমোক। ঘুম ভাঙ্গিয়ে লাভ নেই।
যেদিন ঘুম ভাঙ্গবে, সেদিন স্বপ্নের মত মনে হবে অতীতের দিনগুলো, সেদিন
সে নিজেই স্থির করবে, যা দেবার ছিল তা সে দেয়নি, হয় সে বঞ্চিত হয়েছে,
না হয় আমাকে বঞ্চনা করেছে।

আজ এই নিস্তব্ধ বিনিদ্র রাতে চিন্তার তরঙ্গে কোন গতানুগতিকতা নেই।
ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলো বৃহৎ তরঙ্গের আঘাতে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। ভেবে পেলাম
না, লতাহু আমার কে, ভেবে পেলাম না, এমন সুন্দর শোভন করে তুলবার
প্রচেষ্টা কেনই বা রয়েছে; ভেবে পেলাম না, বিদ্যুল্লতার মত স্পর্শের
অযোগ্য হয়ে রয়েছে কেন; ভেবে পেলাম না, কেনই বা মনের কথা মুখের
ভাষায় প্রকাশ পাচ্ছে না। কেমন যেন ধোঁয়াটে হয়ে রয়েছি আমরা
পরস্পরের কাছে। অতি চেনা মানুষ অতি অচেনা হয়ে রয়েছে।

কালির আঁচড় দিয়ে মনের কথা ফুটিয়ে বলতে পারব না। চিঠির মাধ্যমে
প্রকাশ পাবে আমার লাজুকতা, প্রকাশ পাবে আমার দুর্বলতা, প্রকাশ পাবে

আমার নীতিগত অপদার্থতা। প্রয়োজন আছে কি এমন একটি পরিবেশ তৈরীর।

মনে হল প্রয়োজন নেই। লতাম্বু যখন তার যুক্তির জাল ছড়িয়ে দেবে, সে যুক্তির জাল থেকে নিজেকে টেনে বের করতে পারব না, আবার মাকড়সার জালে পতঙ্গের মত জড়িয়ে পড়ব। তারচেয়ে অতি সন্তর্পণে লতাম্বুর পাশ থেকে দূরে চলে যাওয়াই শ্রেয়। হয়ত মনে হবে তস্করের মত পালিয়ে গিয়েছি, কিন্তু অভিযোগকারী থাকবে দৃষ্টিপথ থেকে অনেক দূরে, জীবনে তার সাহচর্য আর পাব কিনা সন্দেহ। মনে হল, লতাম্বুকে ছেড়ে চলে যাবার এর চেয়ে বড় সুযোগ আর আসবে না।

আলোর ঝিলিক দিচ্ছিল লতাম্বুর মুখে। অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে দেখছিলাম তাকে। মুখের সেই খামচানো কালো দাগগুলো যেন শব্দমুখর হয়েছে। ভাষা ফুটেছে অত্যাচারিতার অবয়বে।

চিঠিখানা ভাঁজ করলাম। অনেকক্ষণ বসে ভাবলাম কি করা উচিত।

কেমন যেন মায়া বোধ করছিলাম। ঘর না করেও যে ঘরণী, দাবী না থেকেও যে দাবীদার, পালন না করেও যে অভিভাবিকা,—এমন একটি নারীর ব্যক্তিত্বকে কখন কোন অজ্ঞাত সময়ে ভালবেসেছি তা নিজেও জানি না। এ ভালবাসা হয়ে থাক চির অজ্ঞাত। লতাম্বুর মন ঘুমোক, লতাম্বু ঘুমোক। আমি সে ঘুম ভাঙ্গাব না।

একবার ভাবলাম, ছিঁড়ে ফেলি এই চিঠি। আবার ভাবলাম, এ চিঠি রেখে যাবার প্রয়োজন আছে। মনের দ্বন্দ্ব মিটল না, মনের ঝড় থামল না।

অবশেষে চিঠিখানা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আলো নিভিয়ে দিলাম। এসে বসলাম লতাম্বুর পাশে। সন্তর্পনে তার বালিশের তলায় কাগজখানা ভাঁজ করে রেখে দিলাম। তাকিয়ে দেখলাম লতাম্বুর দিকে! আঁধারেও তার মুখখানা দেখছিলাম, দেখবার চেয়ে অনুভব করছিলাম বেশি।

লতাম্বু গভীর ঘুমে পাশ ফিরে শুয়ে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ল।

কেমন যেন অবশ হয়ে গেল স্নায়ুতন্ত্রী। লতাম্বু চিরবঞ্চিতাই থেকে গেল। কাপুরুষের মতো বহুদূরে তাকে রেখে পালিয়ে যেতে মন চাইছিল না। উঠে এসে আবার আলো জ্বাললাম। আলোর ক্ষীণশিখা যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল লতাম্বুর মুখে। আত্মবিস্মৃত হয়ে উঠে গেলাম তার পাশে।

নিজের অজান্তে তার কপালের ওপর মুখ রেখে দেখছিলাম তার সৌন্দর্য।

উষ্ণ নিশ্বাসে ঘুম ভেঙ্গে গেল লতাহুর। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে আমাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি? আমার বিছানায়। এত রাতে!

জানিনা।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সহজভাবে লতাহু বলল, তোমার মনে ঝড় উঠেছে! আত্মপ্রত্যয় হারিয়েছ।

না। হারাবার উপক্রম হয়েছে, তাই বিদায় চাইতে এসেছি।

বিদায়? কেন?

আমার তোমার মাঝে ছেদ টানবার সময় এসেছে।

হতে পারে। কিন্তু নিজের মনকে চোখ ঠারা সহজ কি?

জানিনা। কেমন যেন ভীতি অনুভব করছি।

আমি যদি বলি, যেতে দেব না। ভয় তোমার অমূলক।

হয়ত তাই। কিন্তু।

কিন্তু নেই। বলেই লতাহু সাগ্রহে আমার ডান হাত খানা দুহাত দিয়ে চেপে ধরে বলল, বিশ্বের দরবারে আমাদের জবাবদিহী করতে হবেনা, যদি কোন দিন বিশ্বপিতার কাছে জবাবদিহী করতে হয় সেদিন বলব, মানুষ ভালবেসেই বাঁচে, অনুষ্ঠান-অনুশাসন দিয়ে নয়। আমরা ভালবাসা দিয়েই বেঁচে এসেছি অথবা বাঁচতে চেয়েছি। আমরা অপরাধী নই। যারা আমাদের মতো বাঁচতে পারে না তারাই অপরাধী।

আমার হাতধরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে লতাহু বলল, কথা বলছ না কেন, ফিরতি পথের প্রারম্ভে বাংলার শেষ সীমান্তে বসে আজ আমাদের পরিচয় গাঢ় ও নিবিড় হয়ে উঠুক, কেমন।

কোনই উত্তর খুঁজে পেলাম না। আমার বুক ভেঙ্গে দীর্ঘশ্বাস নেমেএল। হঠাৎ ক্ষিপ্তের মত উঠে দাঁড়িয়ে লতাহুর হাত দুটো চেপে ধরলাম। লতাহুও আবেগ কম্পিত মুখখানা তুলে ধরল আমার মুখের দিকে।